পবিত্র মক্কা-মদিনার বিরুদ্ধে কুফফারদের
ষড়যন্ত্রের হৃদয়বিদারক আখ্যান
হারামাইনের
আর্তনাদ
মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর
এনামুল হক মাসউদ
অনূদিত

হারামাইনের আর্তনাদ

মূল
মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ভাষান্তর
এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা
মুফতি আবু মাহমুদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
আলী হাসান উসামা

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙিনা]

হারামাইনের আর্তনাদ

মূল : মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ভাষান্তর : এনামুল হক মাসউদ

প্রকাশক : মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান

প্রকাশনায় : আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
কওমী মার্কেট (২য় তলা) ৬৫-৬৬/১ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপন : ০১৯৭৩-৫৬৩১১৬

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

প্রথম প্রকশ : নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী

অনলাইন পরিবেশক
pothikshop.com
AdDeen Shop
rokomari.com
ruhamashop.com
sijdah.com
wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য : চার কালার : ৫০০/= পাঁচশত টাকা মাত্র।
এক কালার : ৪৪০/= চারশত চল্লিশ টাকা মাত্র।

"হারামাইনের পবিত্র ভূমি থেকে
কাফের সৈন্যদের বিতাড়িত করা
গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরজ।"
[বিজ্ঞ উলামা-মাশায়েখদের ঐকমত্য ফতোয়া]

অর্পণ

হারামাইন শরিফাইনের নামে

যার সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষায়

খলিফাতুর রাসূল ওমর ইবনুল খাত্তাব
রাদিআল্লাহু আনহু

থেকে

ওমরে সালেস বীর মুজাহিদ মোল্লা
মুহাম্মাদ ওমর রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত

এবং

ইসলামের বীর সেনানী সুলতান সালাহ
উদ্দীন আইউবী রাহিমাহুল্লাহ

থেকে

মহান মর্দে মুজাহিদ শায়েখ উসামা
বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত

যাদের

একাগ্রতা ও দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও
বীরত্ব,

ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জীবন্ত ধারা
আজও চলমান।

—লেখক

সম্পাদকের কথা

হারামাইন—মুসলমানের জীবনের স্পন্দন। হৃদয়ের অনুরণন। অস্তিত্বের শিকড়। সেই হারামাইন আজ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের দখলে। আমাদের প্রথম কেবলা এবং বর্তমান কেবলা কোনোটাই তাদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত নয়। প্রতি মুহূর্তে অন্তরে আশঙ্কা বিরাজ করতে থাকে, কখন না আবার কী হয়ে যায়! আমাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, আমরাও আবদুল মুত্তালিবের মতো আল্লাহর ঘর রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহকে সঁপে দিয়ে নিজেরা ব্যস্ত হয়েছি নিজেদের দুনিয়া নিয়ে।

বনি ইসরাইলের মতো বলে চলেছি, 'তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়ে লড়াই করতে থাকো। আমরা এখানে বসে থাকব।' অধিকাংশ মুমিন তো এসব বিষয় পুরোপুরি উপেক্ষা করে। দেহের ক্ষত এবং ব্যথার প্রচণ্ডতা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে। তারা সব জেনেও না জেনে থাকার ভান করে। দুনিয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে সব দুঃখ-বেদনা ঘুচিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু তারা জানে না, তাদের জন্য আগামী দিনগুলোতে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। এ তো নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। গোটা উম্মাহ এখনই যদি সজাগ না হয়, তাহলে ধ্বংসের হিংস্র ছোবল থেকে কেউই নিরাপদ থাকতে পারবে না।

মুসলিম উম্মাহর দরদী মনীষী, জাগরণের সারথি মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর (হাফিজাহুল্লাহ) বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে দরদী ভাষায় তুলে ধরেছেন হারামাইনের আর্তনাদ। শাইখ হুজাইফির হারামাইন-সম্পর্কিত দুটো ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে গ্রন্থের সূচনা করেছেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে শাইখ উসামার একটি ঐতিহাসিক বার্তা, উলামা-মাশায়িখের প্রতি শাইখ উসামার হৃদয়-নিংড়ানো কিছু কথা ও উদাত্ত আহ্বান, শাইখের জীবনের কিছু অপ্রকাশিত তথ্য, আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে *যরবে মুমিন* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং সর্বশেষ উপসাগরীয় সমস্যা সম্পর্কে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, গ্রহণযোগ্য ও প্রথিতযশা মুফতিগণের ফাতওয়া সংকলন করেছেন।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখককে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। *আকসার কান্না/ আকসার অশ্রু* এবং *স্পেন টু আমেরিকা* বইয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকদের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন। উম্মাহর এই ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতিতে তিনি নির্ভয়ে উম্মাহকে দেখিয়ে চলছেন সরল পথের দিশা। তার লেখার অন্যতম বিশেষত্ব হলো,

তত্ত্ব, তথ্য ও দরদের মিশেলে শ্রোতাচিত্তের গভীরতম স্থানটি তিনি খুব সহজেই জয় করে নিতে পারেন। আরও সহজ করে বললে, বর্তমান সময়ে তার দৃষ্টান্ত শুধুই তিনি। তবে একটা বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার রাখা সমীচীন মনে করছি, যারা সহিহ আকিদা ও সঠিক মানহাজ লালন করেন, পাশাপাশি বিগত অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর রাখেন, তাদের অনেকেই হয়তো লেখকের পাকিস্তান-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন না। আর মিল্লাতে ইবরাহিম ও আল-ওয়াল ওয়াল-বারা'র দৃষ্টিকোণ থেকে এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করা সংগতও মনে হয়নি। তবে একমাত্র কুরআনুল কারীম ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থই যেহেতু সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে নয়, তাই এই একটা বিষয়কে সচেতনভাবে এড়িয়ে গ্রন্থের অন্যসব বিষয় থেকে যেকোনো সচেতন তাওহিদবাদী পাঠক খুব ভালোভাবেই উপকৃত হতে পারবেন।

আল্লাহ তা'আলা এ গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমাদের নেতিয়ে পড়া চেতনা পুনর্জাগ্রত করার এবং হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধার করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলী হাসান উসামা
২৩/০৭/২০১৯

অনুবাদকের জবানবন্দি

সকল প্রশংসা সেই মহান প্রতিপালকের জন্য যিনি আমাদের খালিক ও মালিক। সর্ব প্রকার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা সেই পবিত্র সত্তার জন্য যিনি আমাদেরকে ঈমান ও ইসলামের মতো মহান নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। লক্ষ-কোটি দুরুদ ও সালাম সেই নাবীউস সাইফ এবং নাবীউল মালাহিম, রাহমাতুল লিল আলামিনের প্রতি যিনি মৃত্যুসজ্জায় তাঁর উম্মাতকে **"তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও"** বলে অসিয়াত করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল শত্রু ও তাদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শুধুমাত্র অবহিত করেই ক্ষান্ত হননি বরং তাদের সাথে উম্মাহর আচরণ ও তাদের সেই ষড়যন্ত্রসমূহের মূলোৎপাটনের কার্যকরী পথ ও পন্থাও নিজ জীবনে আমল করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

সম্মানিত পাঠক! আজ থেকে পাঁচ বছর আগের কথা। মুহতারাম বন্ধুবর মাওলানা আবু লুবাবা মুহাম্মাদ সালমান ভাইয়ের বাসার ড্রয়িং রুমে সাজানো কিতাবের শোকেসের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। হঠাৎ করেই শোকেসের এক কোণে পুরাতন একটি কিতাবের নামের ওপর দৃষ্টি আটকে যায়। ***"হারামাইন কি পুকার"***। লেখক মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর। পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ***যরবে মুমিনের*** সাহসী সম্পাদক। এক সময়ের ***যরবে মুমিনের*** নিয়মিত পাঠক হিসেবে লেখক ও তার গবেষণাধর্মী সাহসী লেখার সাথে পূর্ব পরিচয়ের কারণে সালমান ভাইয়ের অনুমতিক্রমে কিতাবটি শোকেস থেকে বের করে শুধুমাত্র সূচিপত্র দেখেই তা বাংলা অনুবাদের আগ্রহ প্রকাশ করলে সালমান ভাইও অনুবাদের কথা শুনে এবং কিতাবটির মূল বার্তাটি বর্তমান প্রজন্মের বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট পৌছানোর গুরুত্ব অনুধাবন করে সাথে সাথেই কিতাবটি স্বানন্দ চিত্তে আমাকে দিয়ে দেন। আমিও কিতাবটি অনুবাদের অভিপ্রায়ে গভীর অধ্যয়নে ডুবে যাই। এরই মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে বেশ কয়েকবার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে কাঙ্ক্ষিত কিতাবটি আমার সংগৃহিত কিতাবের ভিড়ে হারিয়ে যায়। যা অনেক তালাশ করেও আর কোনভাবেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এরই মধ্যে কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর এবং জীবনেও এসেছে অনেক চড়াই-উৎরাই। এরই মধ্যে বিভিন্ন ব্যাস্ততায় কিতাবটির কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম । অবশেষে ২০১৮ সালের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে কর্মস্থল থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাড়িতে নিয়ে

আসা কিতাবের বস্তা খুলে রোদে শুকিয়ে শোকেসে সাজানোর প্রাক্কালে স্নেহাস্পদ মারুফ বিল্লাহ তাকীর হাতে ধরা পড়ে কাঙ্ক্ষিত কিতাবটি। বিশ্বাস করুন, প্রিয় পাঠক! তখনকার আনন্দঘন মুহূর্তটির কথা আপনাকে ভাষায় বুঝাতে আমার কলম অক্ষম। অতঃপর আর কোন কালক্ষেপণ নয়। পরের দিনই বসে যাই অনুবাদের টেবিলে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ধীর গতিতে এগিয়ে চলে আমার কাঁচা হাতের আনাড়ি অনুবাদ। অনুবাদ যখন প্রায় শেষের দিকে এবং সম্ভাব্য প্রকাশনা ও দৃষ্টি নন্দন প্রচ্ছদটিও যখন প্রস্তুত। এক কথায় অনুবাদক যখন তার হৃদয়াকাঙ্খিত সৃজনশীল কর্মটি সম্পাদনের সুন্দর একটি সুখ-স্বপ্নে বিভোর তখনই ঘটল জীবনের আরেকটি ছন্দপতন। আরেকটি দুর্ঘটনা। এই ক্ষুদ্র জীবনের সবচেয়ে বড় ঈমানী পরীক্ষা। আর তা হলো ২০১৮ সালের ২২ মে সোমবার তথা চতুর্থ রমজানের মধ্য রজনীতে একেবারে অযাচিত ও অকল্পনীয়ভাবে অনুবাদের টেবিল থেকেই হয়ে গেলাম নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের পাঠশালার এক নগণ্য ছাত্র। অর্থাৎ তাগূতের কারাগারের অন্দকার প্রকোষ্ঠের মজলুম ও অসহায় বাসিন্দা।

সুপ্রিয় পাঠক! বিশ্বাস করুন! কারাগারের নির্মম পরিবেশের অসহনীয় যাতনার মাঝেও যে বিষয়টি আমার হৃদয়কে সবচেয়ে অধিক কষ্ট ও যাতনার তীরবিদ্ধ করেছে এবং বেদনার নোনা অশ্রু ঝরিয়েছে, এমনকি যা ছিল আমার নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেও অধিক কাম্য, তা হল কোনভাবে এই কিতাবটির অবশিষ্ট অনুবাদ সমাপ্ত হয়ে আপনাদের মতো বিজ্ঞ পাঠকদের হাতে পৌঁছা। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, পরিবারের-পরিজনদের অক্লান্ত চেষ্টা এবং কিছু দোস্ত-আহবাবদের ইখলাসপূর্ণ নেক দু'আ ও হুব্বুনফিল্লাহর অনুপম দৃষ্টান্তের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা মাত্র দুই মাস তিন দিনের মাথায় দুনিয়ার ক্ষুদ্র কারাগার থেকে জামিন দিয়ে মুক্ত পৃথিবীর বৃহৎ কারাগারে আগমনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতা ও দাওয়াতী সফরের ব্যস্ততা সর্বপোরি নিজে কম্পিউটার কম্পোজ না জানার ফলে অন্যকে দিয়ে টাইপ করানোর কারণে কম্পোজ বিভ্রাটজনিত প্রুফ সংশোধনের দীর্ঘ বিড়ম্বনার অবসান হয়ে লেখকের ভাষ্যমতে **"কলমের কালি দিয়ে নয় হৃদয়ের তপ্ত খুন দিয়ে লেখা"** হাজারো ঘুমন্ত পাঠকের হৃদয় জাগানিয়া ঈমানদীপ্ত কিতাবটির বাংলা অনুবাদ এখন আপনাদের হাতে।

আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি বিনি'মাতিহি তাতিম্মুস-সালিহাত।

কিতাবটি পাঠকালে বিজ্ঞ পাঠককে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে– কিতাবটি আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে রচিত। সেই তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু আরও অনেক বেশী ভয়াবহ।

কিতাবটি প্রকাশনার এই শুভ মুহূর্তে যে কয়জন মানুষের কথা না বললেই নয়; তাদের প্রথমজন হলেন আমার প্রিয় হোম-মিনিস্টার ও শরিকে হায়াত, এবং আমার প্রায় প্রতিটি দীনী কাজের অনুপ্রেরণা, মুহতারামা উম্মে খাওলা। যার অফুরন্ত সহযোগীতা ও সীমাহীন কুরবানির ফলেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্বিঘ্নে মহান এ কাজটি সম্পাদন করার তাওফিক দিয়েছেন। তারপরেই যাকে স্মরণ না করলেই নয়; তিনি হলেন আমাদের আল-জামিআতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম বরুড়া মাদরাসার সম্মানিত উস্তাদ, বিশ্ব মানচিত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, বন্ধুবর মুহতারাম মুফতি জহির বিন তুরাব। যিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার আটকে যাওয়া জটিল ও কঠিন স্থানগুলোসহ কিতাবের শেষ অধ্যায়টি অর্থাৎ **"আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের ফতোয়া"** অংশটির অনুবাদ করে দিয়েছেন। অপরজন হলেন উম্মাহর জন্য আদর্শ মা গড়ার সুনিপুণ কারিগর, আয়েশা সিদ্দিকা রাদি. মহিলা মাদরাসার সম্মানিত মুহাদ্দিস, আমার দেখা অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের চমৎকার একজন মানুষ, বন্ধুবর মাওলানা আবু লাবীব মুহাম্মাদ ইউনুস ভাই। যিনি কিতাবটির কম্পোজের দায়িত্বসহ এ ব্যাপারে আমার মতো একজন অনবিজ্ঞ মানুষের নানা রকম জ্বালাতন অম্লান বদনে সহ্য করেছেন এবং কিতাবটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। চতুর্থজন হলেন- আমার অনুবাদ কর্মের শ্রদ্ধাভাজন উসতায, বাংলা সাহিত্যকে যিনি দীনের খিদমত মনে করে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে দেখা ফিরিশতা চরিত্রের লোকদের অন্যতম ও অখ্যাত একজন নুরানী মানুষ। যিনি বহু রজনীর আরামের সুখনিদ্রাকে হারাম করে তার নিয়মিত রুটিনেরও বাহিরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার মতো আনাড়ি অনুবাদকের কাঁচা অনুবাদকে পাঠকের পাঠোপযোগী করে তুলেছেন; তিনি হলেন বন্ধুবর মুহতারাম মুফতি আবু মাহমুদ হাফি.। এই তালিকার আরও দুজন পরম সুহৃদ হলেন বর্তমান সময়ে লেখালেখির জগতের অত্যন্ত সুপরিচিত নাম আমার হুব্বুনফিল্লাহর একান্ত সহযাত্রী মুহতারাম কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক ভাই ও মুহতারাম আলী হাসান উসামা। যারা শত ব্যস্ততা সত্বেও শুধুমাত্র দীনের নিসবতেই খুবই অল্প সময়ে পুরো গ্রন্থটিকে সম্পাদনা নিরীক্ষণ করে দিয়ে পাঠোপযোগিতার পূর্ণতা দান করেছেন। বিশেষ করে

মুহতারাম আলী হাসান উসামা। যিনি তার মূল্যবান সম্পাদকের কথা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বাহুডোরে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের গোটা জীবনে বারাকাহ দান করুন এবং তাদের প্রত্যেককেসহ আরও যারা এই গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন সকলকে মহান রব তার শান অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে ভূষিত করুন।

অবশেষে এ বই পাঠ করে একজন পাঠকও যদি উম্মাহর এই চরম দুর্দিনে নিজের যথাযথ করণীয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে স্বীয় কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম হন; তাহলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। সম্মানিত পাঠকের খিদমতে নিবেদন, পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ মহা গ্রন্থ আল-কুরআন ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই নির্ভুল নয়। তাই এ গ্রন্থটিকেও আমরা নির্ভুল দাবি করতে পারছি না। তবে আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি ভুল কমানোর। তথাপিও মানুষ মাত্রই ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং সচেতন পাঠকের সন্ধানী দৃষ্টি কোথাও হোঁচট খেলে সে দোষ মূল লেখকের নয়, বরং আমার নিজের এবং উক্ত ভুল সম্পর্কে অবহিত করলে পরবর্তীতে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল। আল্লাহ তা'আলা লেখকের ন্যায় অনুবাদক সম্পাদক প্রকাশক ও পাঠকসহ সকলকে কবুল করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাশ শুহাদায়ি ওয়াল মুজাহিদীন।

মুহাম্মাদ এনামুল হক মাসউদ
১০ ই অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী

পূর্ব কথা

ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা ছিল মুসলমানদের জন্য চরম দুশ্চিন্তা উদ্রেককারী এবং হৃদয়ের রক্তক্ষরণকারী। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এমন এক ঘটনার অবতারণা হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত-শোকের পর যা সবচে বেশি বেদনার, সর্বাধিক দুশ্চিন্তার। বাগদাদ ধ্বংসের ঘটনাও যার সামনে তুচ্ছ। উসমানী খেলাফতের পতনও যার সামনে অত্যন্ত নগণ্য। তা হলো জাজিরাতুল আরব—আরব উপদ্বীপের পবিত্র জমিনে যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে অপবিত্র ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনুপ্রবেশ। এই জঘন্য ঘটনার সূচনাটা হয়েছে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে; আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে ইহুদিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রথম কিবলার পতন থেকে সূচনা হয়ে বর্তমানে সশস্ত্র কাফের সৈন্যদের স্থায়ী সেনা ছাউনি পৌঁছে গেছে পবিত্র হারামাইন তথা মক্কা-মদিনার অভ্যন্তরে। মুসলিম বিশ্ব যদি এমনভাবে নির্জীব হয়ে জিহাদ-কিতালের কার্যকর ও পবিত্র ব্যবস্থাপনার সাথে এমনই সম্পর্কহীন থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে না জানি কী দুর্দিন দিন দেখতে হয়!

এ সম্পর্কে উপসাগরীয় শাসকদের উদাসীনতা আর নীরবতার রহস্য তো সহজেই বোধগম্য হওয়ার মতো। কারণ, তাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাষের পেছনে তাড়িত করা এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে দূরে রাখার জন্য অনেক আগ থেকেই চলছে দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা ও গভীর ষড়যন্ত্র। অন্যথায় উক্ত ভূমিতে বসবাসকারী চার মিলিয়নেরও অধিক মুসলমান এতটা নীরব কীভাবে থাকে—এ বিষয়টি ভাবলে যে-কেউ বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হতে বাধ্য। বার বার সতর্ক করার পরও পুরো একটি জাতির কাছ থেকে এমন জঘন্য উপেক্ষা কেমন করে প্রকাশ পায়! বিষয়টি নিতান্তই আক্ষেপের ও আফসোসের, চরম দুঃখের ও হতাশার।

মনে হচ্ছে, তারা যেন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটার আঁচ করতে পেরেছে। কিংবা অজানা কোনো মহাশক্তির নিশ্চিত অপেক্ষায় রয়েছে—যা তাদেরকে সমূহ এ মহাবিপদ থেকে রক্ষা করবে। তাইতো তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে উদাসীন আর নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহে এতটা ব্যাকুল। তাদের মধ্যে দুদিন পর

নিঃশেষ হয়ে যাওয়া আয়েশী জীবন সাজাবার এত বেশি উন্মাদ-প্রতিযোগিতা।

অথচ তারা ভাবে না, মুসলমানেরা দীন-শরিয়তের কাজকে নিজেদের প্রয়োজনের ওপর প্রাধান্য না দিলে কখনোই দুনিয়ায় সফলতা লাভ করতে পারে না। তারা বুঝে না, তাদের আশপাশে যত নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ আর দুনিয়ার রূপ-লাবণ্য তারা দেখছে, তা কোনোভাবেই স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি হতে পারে না। আসল স্থায়িত্ব তো হলো মহান রবের রাহে ও সাত আসমানের ওপর থেকে অবতীর্ণ পবিত্র দীনের হেফাজত ও পাহারাদারির পথে এসব কিছু উৎসর্গ করার মধ্যে। তবে এটা নিশ্চিত সত্য, মহান কুদরতের মালিক আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের হেফাজতের জন্য কখনো কখনো প্রকৃতির ব্যতিক্রম কোনো উপায়ও বাস্তবে নিয়ে আসেন। কিন্তু এটা কখনোই বান্দার সেই ফরজ থেকে দায়মুক্তির কারণ নয়, যা তার ওপর অতি আবশ্যক করা হয়েছে। রবের পক্ষ থেকে এমন ঘটনার প্রকাশ, কোনোভাবেই দুনিয়াতে কারও জন্য নিশ্চিন্ত-উদাসীনতা আর অলসতার বৈধতা হতে পারে না। আর তা তাকে রোজ-কিয়ামতে আল্লাহর প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচাতেও পারবে না। সে তখন এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হবে, যখন তার মাঝে ও তার খালিক ও মালিক আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না।

মারাত্মক ভয় হয়, যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ আর ভয়াবহ বিষয়ে মুসলিম বিশ্ব এভাবে নিঃশ্চুপ থাকে, না জানি আগামী প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্ব-সাহসিকতা আর ত্যাগের ইতিহাস ভুলে যায়। আর বলতে শুরু করে, তাদের বাপ-দাদারা না কোনো উন্নতির ধারক ছিল আর না তাদের কোনো সম্মান-মর্যাদা বা গৌরবের কোন বিষয় ছিল। বরং তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আর তারা চেয়ে চেয়ে দেখেছে আর শুধু আফসোস করেছে। আর এখন জীবন চলার জন্য বাজি খেলার চেষ্টা করা বর্তমানে তাদের উত্তরসূরিদের একান্ত কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। কারণ, এ ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ আর তাদের বাকি নেই। আরও উৎকণ্ঠার বিষয়—মুসলমান যেভাবে আন্দালুসকে ভুলতে বসেছে, হারাতে বসেছে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে, কদিন পর তারা নিজেদের অন্যের গোলাম আর সেবাদাস হিসেবেই কল্পনা করবে। মনে করবে, তারা ভূখণ্ডহীন, উদ্বাস্তু এক জাতি। কারণ, এখন তো বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর আফসোসকারী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ইসরাইলের দখলকৃত মুসলিম অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের এতটুকুও ফিকির

নেই। কাশ্মীরের শোক তো তাদের আছে, কিন্তু হিন্দুদের দখলকৃত ওইসব বিশাল অঞ্চল যা মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা হারিয়ে যাওয়ার গ্লানি, ক্ষোভ আর পরাজয়ের লজ্জা একদমই নেই। মনে হয়, এগুলো আদৌ তাদের ছিল না কিংবা তাদের রাখবার যোগ্যতা চিরতরে ম্লান হয়ে গেছে।

ভীষণ আশঙ্কার বিষয়—না জানি আগামীতে তারা যখন জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের অন্যান্য পবিত্র ভূমিগুলোতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবৈধ অনুপ্রবেশের জোয়ার দেখতে পাবে, তারা তা প্রতিরোধ না করে, নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ব্যতিরেকে উল্টো এটাকে সাধারণ ঘটনা কিংবা দুর্যোগের অংশ মনে করা শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত চির গোলামি আর লাঞ্ছনার বেড়ি সাদরে বরণ করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ রক্ষা করুন।

এই অন্যায় নীরবতা আর ধ্বংসাত্মক স্থবিরতাকে ছিন্ন করে, মুসলিম উম্মাহকে গুরুত্বপূর্ণ এই ফরিজা আদায়ে উৎসাহ যোগাতেই এই গ্রন্থের সংকলন। এতে নিম্নে বর্ণিত চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১. বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত উদ্ধৃতি ও টীকা।

২. রেফারেন্সের সাথে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ।

৩.গ্রন্থটির শেষে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বিষয়সংশ্লিষ্ট মানচিত্র ও ছবি।

৪.রয়েছে পবিত্র হারামের ইমাম মুহতারাম আলী আবদুর রহমান আল-হুজাইফীর স্মরণীয় সেই ঐতিহাসিক খুতবা এবং মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশ্যে মুজাহিদে ইসলাম, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.-এর ঐতিহাসিক দু'টি চিঠি ও তার জীবনের বিরল কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

আরও রয়েছে উপসাগরীয় সমস্যা সম্পর্কে ***সাপ্তাহিক যরবে মুমিন***-এ প্রকাশিত মুফতি আবু লুবাবা শাহ-মানসুর হাফিজাহুল্লাহ-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধসমূহ। আছে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপে কাফের সৈন্যদের উপস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের ফতোয়াসমূহ। এই গ্রন্থে পাঠক অবলোকন করবেন নিজেদের সরলতা ও অনুভূতিহীনতার অভিযোগ। অন্যদের ধূর্ততা ও প্রতারণার চিত্র। আছে আমাদের বিস্তারিত রোগের বর্ণনা। সাথে রয়েছে সমাধানের কার্যকরী প্রেসক্রিপশন। এসবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন অনুভব করছি। কারণ, বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে দুই প্রকার চিন্তার লোক পাওয়া যায়।

এক. নিরাপদে হজ ও উমরার সফর করতে পারায় যাদের বিশ্বাসই হয় না, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে এত বড় আক্রমণ ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বর্ণিত বাস্তবতা তাদের চোখ খুলে যাওয়া এবং মাথার ওপর এসে পৌঁছা তুফানের মূলোৎপাটনে কোমরে গামছা বেঁধে প্রস্তুত হবার নিমিত্তে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

দুই. যারা উপরিউক্ত ঘটনাকে তো স্বীকার করে, কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। এ ব্যাপারে যথাযথ করণীয় নির্ধারণে গ্রন্থটি তাদেরকে পথ দেখাবে।

মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী হক-বাতিলের মধ্যে সংগঠিত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, অনেক কিছুই করতে পারে। উলামায়ে কেরাম ও ওয়ায়েজিনে কেরাম তাদের ওয়াজ ও বক্তৃতায় উৎসাহের মাধ্যমে, ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত মুজাহিদদের প্রয়োজনে অর্থ-সম্পদ খরচ করে, যুবক ও তরুণরা তাদের পবিত্র যৌবন ও তারুণ্যকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে কিংবা নিজে কিছু করতে না পারলেও অন্তত অন্যদেরকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি মুজাহিদদের জন্য বিজয় ও সাহায্যের দু'আ করে, মা-বোনেরা তাদের বাপ-ভাই ও স্বামী-সন্তানদেরকে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত করে ও মুজাহিদদের জন্য দু'আ করে এবং সাধারণ মানুষ, কাফির-মুশরিকদের সকল পণ্য-সামগ্রী বর্জনের মাধ্যমে—এই মহান ও পবিত্র প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

অবশেষে এই আবেদন করে লেখা সমাপ্ত করছি, হারামাইনের বিষয়টি এ উম্মাহর এমন একটি বিষয়—যার ওপর গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য হতে পারে। এজন্য ঐক্য ও সংহতির আহ্বায়ক সম্মানীত উলামায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। *যরবে মুমিন* এই বিষয়ে যা কিছু লিখেছে, তা এই বিষয়ে নিছক শুধুমাত্র শোক আর কান্না নয়, না এমন আর্তনাদ আর আত্মচিৎকার, যা অলসতা থেকে জাগ্রত করে হীনম্মন্যতায় নিক্ষেপ করবে; বরং তা একজন মুমিনের শিরা-উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী, তনু-মনে উষ্ণতা সৃষ্টিকারী এমন জীবন্ত লেখা, যা মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদি প্রেরণার প্রাণ সঞ্চার করবে। দীনের বিজয়ের জন্য জীবন উৎসর্গে নিজেকে প্রস্তুত করতে এবং এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর কালিমা উঁচু করতে নিজের সবকিছু উৎসর্গ করার প্রেরণা সৃষ্টি করতেই ছাপা হয়েছে।

বিষয়টি শুধু উপসাগরের বিষয়ই নয়। কিংবা শুধু পবিত্র হারামাইনের বিষয় নয়, বাইতুল মুকাদ্দাস এবং হারামে ইবরাহিমীরও বিষয়। কুরতুবার জামে মসজিদ ও ফয়জাবাদের বাবরী মসজিদেরও বিষয়। প্রতিটি ওই পবিত্র ভূমিরও বিষয়, যেখানে সুদূর কিংবা নিকট অতীতে কখনও তাকবির ও তাহলিলের সুর-মূর্ছনা গুঞ্জরিত হয়েছিল। অথচ আজ সে স্থানগুলো বিরাণভূমি ও নিস্তব্ধতার শহরে পরিণত হয়ে আছে। প্রত্যেক সেই পবিত্র অঞ্চলের, যা কোন তাওহিদবাদীদের সেজদা দ্বারা আবাদ হিয়েছল, আজ মুশরিক এবং অভিশপ্ত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জবর দখলে নিরবে বিলাপরত।

এমন কি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের দখলে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ইবাদতের পাশাপাশি নিজেদের সংরক্ষণকেও ফরজ মনে না করবে। সিজদার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি সিজদার জায়গারও হেফাজত করবে। যেদিন থেকে তারা এই আদবসমূহের প্রতি লক্ষ রাখা শুরু করবে, সেদিন থেকে নিঃসন্দেহে তাদের পুনরায় উত্থানের সফর শুরু হয়ে যাবে। কেননা বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষী, যে যুগেই মুসলমানদের মাঝে এই গুণ তৈরি হয়েছে, কোনো শক্তি-মহাশক্তি তাদেরকে পেরেশান করতে পারেনি। সর্বদা সফলতা তাদের পদচুম্বন করেছে। পুলক ও আনন্দ তাদের গলার মালা হয়েছে। বিজয় হয়েছে তাদের বুকের ব্যাজ। আল্লাহ তা'আলা এই মালা দিয়ে পুনরায় তাদের গলাকে অলঙ্কৃত করুন। আর সেই ব্যাজ দিয়ে তাদের সিনাকে সজ্জিত করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল হারামাইন। আমিন, ইয়া রব্বাশ্ শুহাদা-ই ওয়াল মুজাহিদিন।

—সংকলক

সূচিপত্র

বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মসজিদে নববীর প্রখ্যাত খতিব আবদুর রহমান আল-হুজাইফীর ঐতিহাসিক খুতবা

খুতবার পটভূমি

শাইখ আব্দুর রহমান আল-হুজাইফী। মসজিদে নববীর সম্মানিত খতিব। আকস্মিকভাবে ১৯৯৮ সালে ঈদুল আজহার আগের জুমআয় জাজিরাতুল আরবে অবস্থানকারী বৃটিশ-মার্কিন-ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সৌদি হুকুমতের প্রথাবিরোধী আগুনঝরা বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশেষ করে শিয়াদের বিরুদ্ধে তাঁর অনড় অবস্থান, তাদের দৌরাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর সেই খুতবায়। রাগে-ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে। ভাষণের প্রতিটি শব্দই ছিল বুক ঝাঁঝরা করা বারুদ। প্রশ্ন হলো, ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্টের সরকারি সফর চলাকালীন সময়ে কেন তিনি হঠাৎ এমন কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন শিয়াদের ব্যাপারে? শিয়াদের অভিহিত করলেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চেয়েও আরও জঘন্য বলে?

অথচ সৌদি সরকারের রাজকীয় মেহমান হিসেবে স্বয়ং ইরানী প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী মেহরাবের সামনেই উপস্থিত ছিলেন সে দিনের জুমআতে। নির্ভরযোগ্য সূত্রানুযায়ী এ ব্যাপারে মূল বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও বেদনাদায়ক।

তাঁর দেওয়া ঐতিহাসিক খুতবার পরপরই সৌদি সরকার তাঁকে অন্তরীণ করে রাখে। বিশ্বব্যাপী এ খবর ছড়িয়ে পড়লে চিন্তাশীল মুসলমানদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জন্ম নেয়। কেন তাঁকে বন্দি করা হলো? তাঁকে বন্দি করায় সৌদি জনমনেও মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তিনিই একমাত্র খতিব, যাকে অন্তরীণ করার পর সৌদি হুকুমতের প্রথাবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পর তিনি 'আবহা' গমন করেন। সেখানে একটি বিশেষ বৈঠকে ব্যতিক্রমী এ খুতবার পটভূমি সম্পর্কে জানান।

তিনি বলেন, রাফসানজানি সৌদি আরব সফরে এলে তাঁকে মসজিদে নববী প্রদর্শন করাতে সরকারিভাবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি জনাব রাফসানজানিকে নিয়ে রওজা মোবারকে হাজির হলাম। তিনি রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ পাঠ করে থেমে

গেলেন। আমি তাঁকে আরজ করলাম, সামনে হজরত আবু বকর ও হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুম শায়িত।

রাফসানজানি বলল, 'এরা দুজনেই আল্লাহর অভিশপ্ত'। নাউজুবিল্লাহ! তাঁর এ মন্তব্যে আমি হতবাক হয়ে পড়লাম। মারাত্মক মর্মাহত হলাম তার এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে। পরদিনই ছিল জুমআর দিন। আমি খুতবায় সত্যের বাণী উচ্চারণ করাকে স্বীয় ঈমানী দায়িত্ব মনে করলাম।'

সৌদি আরবে তাঁর এ খুতবার ব্যাপারে লোকমুখে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। খুতবার আগের রাতে হুজাইফী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাইখ হুজাইফীকে অনুযোগ করে বলেন,

আমার রওজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার সাথীদের অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে, আমার রওজা ঘিরে ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যদের সদম্ভ পদচারণা। তোমাদের মুখ আর কতদিন এভাবে তালাবদ্ধ থাকবে?

রাফসানজানির ঘটনাটি সুনিশ্চিত। তার এমন দৌরাত্ম্যের ব্যাপারে সবাই ক্ষুব্ধ। শাইখ হুজাইফীর ভাষণের আগের স্বপ্নটির ব্যাপারে যদিও নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই, তবে বিষয়টি গোটা সৌদি আরবের লোকমুখে খুবই প্রসিদ্ধ। সর্বোপরি এ কথা বলা যায়, হুজাইফীর আকস্মিক ব্যতিক্রমী খুতবার অন্তরালে অবশ্যই কোনো মহান কারণ আছে। শাইখ হুজাইফী একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুত্তাকি আলেম। সারা বিশ্বে তাঁর প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব ও পরহেজগারি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। যদি এমন বিস্ময়কর কিছু না-ও ঘটে থাকে, তবুও পবিত্র মক্কা-মদীনাকে ঘিরে ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্য সমাবেশ, তাদের সৈন্যদের দ্বারা মক্কা-মদীনার পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি জাজিরাতুল আরবের চতুর্দিকে অমুসলিমদের সমর-আয়োজন নিছক কোনো তুচ্ছ ঘটনা নয়। অতএব শাইখ হুজাইফীর সাহসী ও সময়োপযোগী এ খুতবা সময়ের দাবি ছিল। সময়ের সাহসী উচ্চারণ ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবনে শাইখ আব্দুর রহমান আল হুজাইফীর সেই ঐতিহাসিক খুতবাটি দিয়েই এই গ্রন্থ শুরু করা হলো।

১ম খুতবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার , যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, রাজাধিরাজ। যিনি সঠিক পথের দিশা ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসের দ্বারা মুমিনদের

আত্মাকে করেছেন আলোকিত। আর শক্তিশালী করেছেন ওহীর বাণী দিয়ে তাদের অন্তর্চক্ষুকে। নিজ রহমতে যাকে ইচ্ছা তিনি হেদায়েত দান করেন। আর নিজ হিকমতে যাকে ইচ্ছা গোমরাহ-পথভ্রষ্ট করেন। কাফির ও মুনাফিকদের অন্তরাত্মা চির অন্ধ, তাতে হকের আলো একদম নেই। সকল সৃষ্টিতে তার প্রমাণ বিদ্যমান।

আমি আমার রবের প্রশংসা করছি। তাঁরই শোকর আদায় করছি। তিনি সত্তায়, ক্ষমতায় যেমন পরাক্রমশালী, অসীম ও অদ্বিতীয়—শোকর-প্রশংসা করছি তেমন শান-অনুযায়ী। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, লা-শারিক। বিচার দিনের তিনিই মালিক। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের নবী, আমাদের সায়্যিদ হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা। তাঁর রাসুল। তিনি পূর্বাপর সমগ্র বিশ্বের নেতা, যিনি প্রেরিত হয়েছেন আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআন নিয়ে। সমস্ত মুসলমানের জন্য যা হেদায়েত ও সুসংবাদ বহনকারী। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দা, তোমার মাহবুব রাসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর প্রিয় সাথি ও অনুসারীদের প্রতি অসংখ্য সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি।[১]

---

১. খুতবার প্রারম্ভে ইমামুল হারাম শাইখ হোজাইফী আয়াত ও হাদিসের আলোকে দীন ও ইসলাম সত্য হওয়ার এবং তা গ্রহণ ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় না থাকার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের দীন ও ইসলামের ওপর অটল ও অবিচলতায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। শাইখ এসবের মাধ্যমে 'ইত্তেহাদে মাজহাব' (সকল ধর্ম এককরণের হীন চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে অমুসলিমে পরিণত করা) নামে চলমান ষড়যন্ত্রের মূলে আঘাত করেছেন। ষড়যন্ত্রটি ইহুদি-খ্রিষ্টান-রাফেজীদের পক্ষ হতে একযোগে চালানো হচ্ছে, মুসলিমদের অন্তর থেকে তাদেরপ্রতি ঘৃণা মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হারামের আঙিনায় নির্বিঘ্ন যাতায়াত ও রাফেজীদের কৃত বেয়াদবির ব্যাপারে ঘুম পাড়িয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। জাজিরাতুল আরবে কাফের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান থেকে প্রতীয়মান ইহুদি-খ্রিষ্টান-রাফেজীদের চক্রান্ত এই খুতবার মূল প্রতিপাদ্য। শাইখ খুতবার প্রারম্ভে পঠিত হামদ ও সানায় পুরো বিষয়টির প্রতি যে তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত করেছেন, যে পারঙ্গমতার সাথে মূল বিষয়ের অবতারণা করেছেন, ইহুদিবাদ-খ্রিষ্টবাদ-শিয়ামতবাদের যে নিপুণ জ্ঞানগর্ভ ব্যবচ্ছেদ করেছেন, বিশ্বমুসলিমের প্রতি যে আন্তরিক-উষ্ণ-উদাত্ত উপদেশমূলক আহ্বান জানিয়েছেন, ইসলামী বিশ্বকে চলমান সমস্যার ব্যাপারে যে দূরদর্শী নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং কোরআন ও হাদিসের নির্যাস থেকে সবগুলোর সমাধান উল্লেখ করেছেন, সর্বোপরি যে শৃঙ্খলে তিনি আবদ্ধ, যে পরিমাণ বিপদের ঘনঘটা সদা তাঁর ওপর ঘূর্ণায়মান এতদ্‌সত্ত্বেও একজন প্রকৃত আলেমে রব্বানীর (আল্লাহর ভালোবাসায় দুনিয়ার সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞানকারী আলেম) মতো নির্ভয়ে বিশ্ববাসীর সম্মুখে সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন এটা মুহতারামের দৃঢ় মনোবল, ইলমী প্রজ্ঞা, জ্ঞানের গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা ও [illegible] অভিজ্ঞতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

হে মুসলিমরা, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত। ইসলামের রজ্জুকে শক্ত হাতে ধারণ করো। আল্লাহর বান্দারা, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য-অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, সত্য ধর্ম ইসলাম হচ্ছে তন্মধ্যে সবচে বড় ও শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মৃত্যুসম কুফরি থেকে জীবন দান করেন। আর গোমরাহীর আঁধার থেকে হিদায়েতের আলোতে নিয়ে আসেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি মৃত, আর আমি তাকে (ঈমানের মাধ্যমে) জীবন দান করলাম এবং দান করলাম এমন একটি আলোকবর্তিকা, যা নিয়ে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনো বের হতে পারবে না।"[২]

আরও ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার কাছে যা নাজিল হয়েছে তা সত্য। সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধ? বস্তুত উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বোধ-বুদ্ধির অধিকারী।"[৩]

গ্রহণযোগ্য ও মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম

পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একমাত্র ইসলামই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম। শরিয়তের বিধান প্রত্যেক নবীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক নবীকে সেই বিধানই দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর উম্মতের জন্য উপযোগী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেকমত ও ইলমে যে বিধানকে মুনাসিব মনে করেছেন, তা রহিত করেছেন। আর যা ইচ্ছা, বহাল রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা মানবতার সর্বশেষ মুক্তির দূত হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়ে তাঁর আগের সকল শরিয়তকে রহিত করে দিয়েছেন। জিন-ইনসান সবাইকে একমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসরণের জন্য আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "বলুন, হে মানুষসকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি ওই মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত, যার হাতে রয়েছে আসমান-জমিনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। জীবন-মরণ একমাত্র তিনিই দান

২. আনআম : ১২২
৩. রাআদ : ১৯

করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং ওই মহান উম্মী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো; যিনি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর যাবতীয় বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাসী। এতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।"[৪]

ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরও ইসলাম ছাড়া মুক্তি নেই

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "ওই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, পৃথিবীর কোন ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান যে আমার নবুয়ত সম্পর্কে শুনল অথচ আমার প্রতি ঈমান আনল না, সে নিশ্চিত জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং যারা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে না, তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামী।"[৫] ইসলাম ছাড়া অন্য যত ধর্ম, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা ধর্মই নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "ইসলামই হলো আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম।"[৬]

আরও ইরশাদ করেন : "আর যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[৭]

মহান প্রতিপালক রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন ধর্ম দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এ ধর্মে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের কথা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি পূর্ববর্তী সকল নবী ও তাদের ধর্মগ্রন্থের বিশ্বাসের কথাও বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "আল্লাহ তোমাদের জন্য দীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নুহকে এবং (হে রাসুল) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দীন কায়েম করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (তা সত্ত্বেও) তুমি মুশরিকদেরকে যে দিকে ডাকছ, তা তাদের

৪. আ'রাফ : ১০৮
৫. সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩
৬. আলে ইমরান : ১৯
৭. আলে ইমরান : ৮৫

কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান, হেদায়েতের জন্য নির্বাচন করেন। আর যে-কেউ তার অভিমুখী হয়, তাকে নৈকট্য দান করেন।"[৮]

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ভ্রষ্টতার কারণ

ইহুদি পণ্ডিত ও খ্রিষ্টান পাদ্রীরা খুব ভালোভাবেই জানত, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। তিনিই সর্বশেষ নবী। কিন্তু তাঁর অনুসরণে, তাকে সর্বশেষ নবী মানতে প্রতিবন্ধক তাদের হিংসা, অহমিকা, পার্থিব জগতের কুৎসিত মোহ আর মনের কু-প্রবৃত্তি। অথচ তারাও জানে, তাঁকে না-মানা, তাঁর প্রতি এরূপ বিদ্বেষ পোষণ করা তাদের কোনোপ্রকার উপকারে আসবে না। তাদের দৌরাত্ম্য অনেক আগে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের আগেই তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থসমূহ রদবদলের মতো জঘন্য কাজটি তারা করেছে। ধর্মের মারাত্মক বিকৃতি ঘটিয়েছে। তারা নিশ্চিতভাবে কুফরি ও পথভ্রষ্টতায় অবিচল থেকেছে।

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র

হক ও বাতিলের এ সংক্ষিপ্ত স্বরূপ উন্মোচনের পর বলতে হয়, বর্তমান যুগের কিছু নামধারী ইসলামি চিন্তাবিদ, যারা ইসলামি আকিদার প্রাথমিক ও মৌলিক বিবরাদি সম্পর্কেও অবগত নন, তারা একটি নতুন দাওয়াত উত্থাপনের অপচেষ্টায় মেতে উঠেছেন। আমার কাছে এ নামধারী বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে পরিচালিত দাওয়াতও ভীষণ ভয়ঙ্কর ও গর্হিত মনে হয়। এ বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। বরং এমন চিন্তা-চেতনা এ যুগে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তা হলো, একদিকে কীভাবে ইসলাম এবং ইহুদি-খ্রিষ্টবাদকে পরস্পর নিকটবর্তী করা যায়। আর অন্যদিকে কীভাবে আহলে সুন্নাহর আকিদা ও শিয়া মতবাদকে পরস্পর নিকটবর্তী করা যায়।

বিশেষ করে, আজ যখন বিশ্বব্যাপী মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যকার সকল লড়াই ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সংঘটিত হচ্ছে। ধর্মীয় স্বার্থেই আজ যতসব বিবাদ। তবে হক-বাতিলের এমন প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে, বিপরীতধর্মী দুটি ধারার একত্রিকরণ কি আদৌ সম্ভব? নিঃসন্দেহে ইসলাম ইহুদি-

---

[৮]. সুরা শুরা : ১৩

খ্রিষ্টানদেরকে বাতিলের রাস্তা পরিহার করে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার প্রকাশ্য দাওয়াত দিচ্ছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : "হে আহলে কিতাবরা, এসো এমন বাণীর দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমানভাবে স্বীকৃত, আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করব না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকেই শরিক সাব্যস্ত করব না, আল্লাহকে বাদ দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নেব না। অতএব তারা যদি (এ দাওয়াত গ্রহণ থেকে বিমুখ হয়, তাহলে হে মুমিনরা) তোমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো—'নিশ্চয় আমরা মুসলমান'।"[৯]

এমনিভাবে ইসলাম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে যে, তারা নিজ ধর্ম পালন করবে। তবে শর্ত হলো ইসলামের অধীন থেকে তাদের নিজ ধর্ম মতে চলার স্বীকৃতি দান করে; যদি তারা মুসলমানদের জিজিয়া প্রদান করে এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখে। (এ বিধান আরব উপদ্বীপের বাইরের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্য। কেননা হারামাইন শরিফাইনের পবিত্রতা রক্ষার্থে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব উপদ্বীপে বসবাসের কোনো প্রকার অনুমতি নেই।) ইসলাম তাদেরকে কখনোই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে না।

যেমনটি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, "দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে।"[১০]

যেহেতু ইসলাম মানবতার সর্বোচ্চ কল্যাণকামী, এ জন্য ইসলামের সুস্পষ্ট ঘোষণা—ইহুদি-খ্রিষ্টধর্ম অবশ্যই বাতিল, অগ্রাহ্য। তাদের সাথে ঐক্য হতেই পারে না। ইসলাম এ জন্য বিশ্ব-মানবতাকে বলে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে, যেন সকলের ওপর আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যে ঈমান গ্রহণ করতে চায়, গ্রহণ করবে। যে কুফুরিতে অবিচল থাকতে চায়, থাকবে। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্ম যেহেতু বাতিল, এ জন্য তারা তাদের ধর্মে থেকে কখনোই মুসলমানের ভাই হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা ইসলামে প্রবেশ করে, ইসলাম তাদের আপন ভাইয়ের মতো করে বুকে টেনে নেয়। ফলে তারাও মুসলমানদের সত্যিকারের ভাই-ই হয়ে

---

[৯]. আলে ইমরান : ৬৪
[১০]. বাকারা : ২৫৬

যায়। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে জাত-পাত, বর্ণ-গোত্র ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলামের সোনালি ইতিহাস যার জ্বলন্ত সাক্ষী।

মহান আল্লাহ বলেন : "হে মানবসকল, আমি তোমাদের সবাইকে এক পুরুষ ও নারী (আদম-হাওয়া) থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে অধিকতর ভয় করে চলে।"[১১]

বাকি রইল ইহুদি-খ্রিষ্টবাদের সাথে ইসলামের একত্রিকরণ। বর্তমানে বিশ্ব-কুফুরি শক্তি এটা নিয়েই আন্দোলনরত; যা আদৌ সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "সমান হতে পারে না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান। আর না অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ সমান হতে পারে। সমান হতে পারে না জীবিত ও মৃত। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করার তাওফিক দান করেন। আর যারা কবরে আছেন, তুমি তাদের কখনোই হেদায়তের বাণী শোনাতে পারবে না।"[১২]

আরেকটি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিভঙ্গি

একজন মুসলিম ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছাকাছি হওয়ার মাপকাঠি যদি এই হয়, মুসলিম তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে। তাদের সাথে বন্ধুত্বের খাতিরে দীনের কিছু আহকাম ছেড়ে দেবে। কিংবা দীনের পূর্ণ বা কিছু অংশ বাস্তবায়নে শিথিলতা অবলম্বন করবে। এমনটা একজন সত্যিকার মুসলিমের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। কোনো মুসলমান এমন করতেই পারে না। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা বন্ধুত্বের খাতিরে কখনোই মুসলমানের আপন হতে পারে না।[১৩]

---

[১১]. হুজুরাত : ১৩

[১২]. ফাতির : ১৯-২২

[১৩]. উপরের আলোচনায় শাইখ মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক সেকুলারিজম থেকে সাবধান করেছেন। যা ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যার উদ্দেশ্য, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষানুযায়ী আমল করা এবং তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার পরিবর্তে স্বাধীনচেতা হয়ে যাওয়া। শরিয়তের এসকল নীতিমালায় শিথিলতা প্রদর্শন করে আর কাফেরদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে। যাতে কাফেরদের জীবনের আশঙ্কা রয়েছে। যেমন : জিহাদ ও কিতাল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পরিপূর্ণ সুন্নাহ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "এমন লোক, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, তুমি তাদের ওই সকল ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী পাবে না, যারা আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত; যদিও তারা তাদের পিতা-মাতা, সন্তান কিংবা ভাই ও সমগোত্রের লোকই হয় না কেন।"[১৪]

হকের সহযোগিতা, বাতিলের বিরোধিতা ফরজ

চূড়ান্ত কথা হলো, মুসলমান-কাফেরের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও ইসলাম কোনো মুসলমানকেই এ অনুমতি দেয় না, সে কাফেরদের ওপর জুলুম করবে। কারণ, ইসলাম মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথেও ইনসাফের দীক্ষাই দেয়। তবে হ্যাঁ, মুসলমানকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে হকের প্রতিষ্ঠা, দীনের সাহায্য আর বাতিলের সাথে শুধু শত্রুতাই নয়, বরং তাদের আধিপত্যকেও মিটিয়ে দেবে।

ইসলাম আর কুফরের মধ্যে যখন এ পার্থক্য হয়েই গেল, মুসলমান ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরবে। ঈমানের ওপর অবিচল থেকে ইসলামের বিধান পালনে কঠোর হয়েই মুসলমান পৃথিবীতে সফলভাবে নিজেদের মর্যাদা আর অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। একমাত্র দীনী অবিচলতাই হককে হক আর বাতিলকে বাতিল সাব্যস্ত করতে পারে।

এ আন্দোলনের ফলাফল

তার উল্টো **'ইত্তেহাদে মাজহাব'** তথা সকল ধর্ম একত্রিকরণ শিরোনামে যে আন্দোলন চলছে, তা শুধু ইসলাম-বিরোধিতাই নয়; বরং মুসলমানদেরকে মারাত্মক এক ফেতনায় জড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলাফল ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের মারাত্মক ক্ষতি, ঈমানের দুর্বলতা এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের মতো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করবে।

অথচ আল্লাহ মুমিনদের পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপনের নির্দেশ দান করে বলেছেন : "মুমিন নর-নারীরা পরস্পর বন্ধু।"[১৫]

---

[১৪]. মুজাদালা : ২২

[১৫]. তাওবা : ৭১

আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, কাফির-মুশরিকরা পরস্পর যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন, তারা পরস্পর বন্ধু। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "আর যারা অবিশ্বাসী কাফির, তারা পরস্পর বন্ধু। তোমরা মুসলমানরা যদি এমন না করো, (অর্থাৎ মুশরিক পৌত্তলিকদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন না করো) তাহলে পৃথিবীতে মহা ফেতনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করবে।"[১৬]

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা মুসলমানরা যদি কাফির-মুশরিকদের থেকে দূরত্ব বজায় না রাখো এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করো, তাহলে মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে মহা ফিতনা সৃষ্টি হবে। ফলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম মিশ্রিত হয়ে যাবে। মুসলমান-কাফের একাকার হয়ে ইসলাম ও মুসলমান সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং মানুষ মারাত্মক ফেতনার শিকার হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "হে মুমিনগণ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু।"[১৭] ইসলাম ও ইহুদিবাদকে, কীভাবে পরস্পর নিকটবর্তী করা সম্ভব?

অথচ ইসলাম একটি পরিষ্কার দর্শন। ইসলাম হলো আলো-জ্যোতি-আলোকবর্তিতা, ইনসাফ-মহত্ত্ব-ব্যাপকতা এবং উন্নত চরিত্র-সংবলিত জিন-ইনসান সকলের জন্য একটি সুন্দর ও মহৎ ধর্মের নাম। আর ইহুদিবাদ হচ্ছে সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা, মানবতার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, চরিত্রহীনতা, অন্ধকার ও লোভ লালসায় পরিপূর্ণ ও কলুষিত একটি ভ্রান্ত পথের নাম। তাহলে ইসলাম ও ইহুদিবাদের মধ্যে কী করে সমন্বয় হয়? একজন মুসলমানের পক্ষে কী করে সম্ভব হজরত মারিয়াম আ.-এর মতো পুন্যাত্মা মহিলাকে ব্যাভিচারিণী আখ্যা দেওয়া? অথচ ইহুদি-অভিশপ্তরা তাঁকে অবলীলায় ব্যাভিচারিণী আখ্যায়িত করছে! একজন মুসলমানের পক্ষে কী করে সম্ভব, ঈসা ইবনে মারিয়াম আ.-কে ব্যাভিচারের ফসল বলে আখ্যা দেওয়া? নাউজুবিল্লাহ! কী করে সম্ভব আল্লাহপ্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ইহুদি শয়তানদের বিকৃত রচনা 'তালমুদের' মধ্যে সমন্বয় সাধন করা?

---

১৬. আনফাল : ৭৩
১৭. মায়েদা : ৫১

ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নয়

এমনিভাবে ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম হচ্ছে পরিচ্ছন্ন একত্ববাদী ধর্ম। রহমত ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার এক মহা আদর্শের নাম। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টবাদ হচ্ছে ভ্রষ্টতার সমষ্টি। ভ্রষ্ট খ্রিষ্টবাদের বিশ্বাস—যীশু হয় আল্লাহর পুত্র অথবা স্বয়ং আল্লাহ কিংবা তিনি আল্লাহর একটি অংশবিশেষ আল্লাহস্বরূপ। আল্লাহ মাতৃগর্ভে স্থান ধারণ করেন—এ কথা কি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির যুক্তিতে আসতে পারে? কোনো যুক্তি কি এ কথা গ্রহণ করতে পারে? যিনি আল্লাহ, তিনি পানাহার করেন, তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হন, তিনি ঘুমান, তিনি মলমূত্রে অভ্যস্ত হন? যে খ্রিষ্টবাদের এহেন জঘন্য ভ্রান্ত বিশ্বাস, সে খ্রিষ্টবাদের সঙ্গে মহান ইসলামের কিসের তুলনা? যে ইসলাম হজরত ঈসা (যীশু) সম্পর্কে এহেন নোংরা বিশ্বাসের স্থলে তাকে মহাসম্মানে অধিষ্ঠিত করে বলে যে, তিনি আল্লাহর মহান বান্দা এবং বনি ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত রাসুলদের একজন মহান রাসূল।

শিয়াধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই

অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাহ ও শিয়াবাদকে পরস্পর সমন্বয় করাটাও কীভাবে সম্ভব? আহলে সুন্নাহ হচ্ছে, যারা কুরআন-হাদিস অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে তাঁর মহান দীনকে হেফাজত করেছেন। ইসলামের মহান মিনারাকে সুউচ্চ রাখতে সর্বাত্মক জিহাদ করে নিজেদের উজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে রাফেজি ও শিয়া হচ্ছে তারা, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক প্রিয় সাহাবিকে (আবু বকর, উমর, উসমান রাদিআল্লাহু আনহু-সহ) লানত দিয়ে থাকে। ইসলামকে তার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। অথচ সাহাবিরাই আল্লাহর মহান দীনকে অবিকৃতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং যখনই কেউ তাঁদের ব্যাপারে কুৎসা রটায়, সে যেন ইসলামের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানল।

শিয়াদের ইসলাম থেকে দূরত্বের প্রথম কারণ

ঠিক তেমনিভাবে শিয়াদের বিশেষ সম্প্রদায় রাফেজিদের সঙ্গেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কোনো তুলনা হয় না। পক্ষান্তরে এ রাফেজিরা তিন খলিফা অর্থাৎ হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু, হজরত উমর

রাদিআল্লাহু আনহু ও হজরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু-কে গালি দেয়। বিবেকবান হলে তারা বুঝত, এ গালি তিন সাহাবিকে নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই দেওয়া হচ্ছে। কারণ, হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু ও হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত শ্বশুর। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর উজির এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পাশেই সমাহিত রয়েছেন। তাঁদের সে মর্যাদায় আর কে পৌঁছুতে পারে?

শিয়ারা ভ্রান্ত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ

অধিকন্তু তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সমস্ত যুদ্ধে শরিক থেকে জিহাদ করেছেন। রাফেজি শিয়াদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের জন্য এটুকু প্রমাণই যথেষ্ট। আর তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরপর দুই প্রিয় কন্যার স্বামী। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে সাথি ও শ্বশুর-জামাই হিসেবে মনোনয়ন করবেন না—এটাই স্বাভাবিক। তাই এ প্রশ্ন জাগা কি স্বাভাবিক নয় যে, তাঁরা যদি রাফেজি শিয়াদের ভ্রান্ত আকিদামতে ইসলামের এত বড় শত্রু হতেন, তাহলে কেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা স্পষ্ট করে উম্মতকে বলে যাননি? বরং আলি রাদিআল্লাহু আনহু -এর মুহাব্বতের নামে ওই তিনজনকে গালি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে হজরত আলি রাদিআল্লাহু আনহু-কেই গালি দেওয়া। কারণ, তিনি স্বেচ্ছায় হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু -এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে সানন্দ্যে খলিফা মেনে নিয়েছেন। হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু -এর অতি আগ্রহের কারণে তিনি তাঁর প্রিয় কন্যা উম্মে কুলসুমকে হজরত উমরের নিকট বিবাহ দিয়েছেন। নিজ পছন্দমতেই তিনি হজরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু -এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী তিন খলিফার অত্যন্ত বিশ্বস্ত উজির ও তাঁদের সকলের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এটা কি সম্ভব যে, তিনি কোনো কাফিরকে জামাতা বানাবেন বা কোনো কাফিরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন? যেমন শিয়া ও রাফেজি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে থাকে। সুবহানাল্লাহ! এ কত বড় জঘন্য অপবাদ?

অনুরূপভাবে হজরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু -এর মুহাব্বতের নামে শিয়া সম্প্রদায় হজরত মুয়াবিয়াকে যে তিরস্কার করে, তা প্রকারান্তরে হজরত

হাসান রাদিআল্লাহু আনহু -কেই তিরস্কার করার শামিল। কারণ, হজরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু স্বেচ্ছায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজরত মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু-এর পক্ষে খিলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ভবিষ্যদ্‌বাণীতে এর জন্য হজরত হাসানের প্রশংসাও করে গেছেন। প্রিয় নবীর আদরের নাতি কি এক কাফির ব্যক্তির (হজরত মুআবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু) জন্য খেলাফতের দাবি প্রত্যাহার করে নেবেন, যিনি লোকদের ওপর হুকুমত চালাবেন—এ-ও কি সম্ভব? সুবহানাল্লাহ। বরং এটাতো হজরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু-এর ওপর জঘন্য মিথ্যাচার। তারা যদি প্রতিউত্তরে বলে যে, হজরত আলি ও হজরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু প্রচণ্ড চাপের মুখেই তা করেছেন, তাহলে বলতে হয় যে, শিয়া ও রাফেজি সম্প্রদায়ের নিকট জ্ঞানের লেশমাত্র নেই। কারণ, হজরত আলি ও হজরত হাসানের মতো মহান ব্যক্তিদ্বয় চাপের মুখে অন্যায়ের সামনে নত করবেন—এমন বিশ্বাস পোষণ করার অর্থই হলো, তাদের কল্পনাতীত মর্যাদাহানি করা।

শিয়াদের ইসলাম থেকে দূরত্বের দ্বিতীয় কারণ

শুনতেও অবাক লাগে যে, মূর্খ শিয়া সম্প্রদায় কীভাবে হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-কে ভর্ৎসনা করতে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থ কোরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি উম্মুল মুমিনিন—মুমিনদের মা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "প্রিয় নবী মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ থেকেও অধিকতর আপন, আর তাঁর মহান স্ত্রীরা হচ্ছেন তাদের মা।"[১৮]

এই কথায় কোনো সন্দেহ নেই, তারাই উম্মুল মুমিনিনদের ভর্ৎসনা করতে পারে, যারা তাদেরকে মা বলে মানে না। কেননা, যারা মা হিসেবে মানবে, তারা ভর্ৎসনা না করে তাদের ভালোই বাসবে।

শিয়াদের ইসলাম থেকে দূরত্বের তৃতীয় কারণ

আহলে সুন্নাহ ও রাফেজিরা একে অপরের নিকবর্তী কী করে হতে পারে? অথচ তারা গোমরাহির নেতা খোমেনিকে নিষ্পাপ-মাসুম মনে করে। তারা

১৮. সুরা আহযাব : ৬

তাদের বিশ্বাসমতে খোমেনিকে মাসুমের গুহায় লুকায়িত মাহদির প্রতিনিধি হক মনে করে। প্রতিনিধি আসল ব্যক্তির মতো হয়। সুতরাং মাহদি যখন মাসুম, মাহদির নায়েব খোমেনিও মাসুম-নিষ্পাপ; যেহেতু সে মাহদির স্থলাভিষিক্ত। রাফেজিরা এখানেই থেমে থাকেনি; বরং তারা তাদের প্রত্যেক ইমামকে শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ মনে করে। তাদের এ আকিদাগুলো কতটা পরস্পরবিরোধী! বস্তুত যেকোনো বাতিলের এটিই বিশেষ লক্ষণ যে, তা স্ব-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ থাকে এবং একটি কথার বিপক্ষে অন্যত্র আর একটি কথা পাওয়া যায়।

শিয়ারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর

রাফেজি শিয়াদের আকিদা ও মাজহাব বাতিল হওয়ার পক্ষে এত অসংখ্য শরিয়তসম্মত ও যৌক্তিক প্রমাণাদি রয়েছে, তা একত্রে উল্লেখ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এসব ভ্রান্ত আকিদা পরিহার করে ইসলামধর্মে প্রবেশ করাই তাদের জন্য বাঞ্ছনীয়।

আর আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কখনো এক চুল পরিমাণ বরং তার চেয়েও কম পরিমাণ তাদের নিকটবর্তী হব না। তারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চেয়েও ইসলামের জন্য অধিকতর মারাত্মক। কখনো তাদের প্রতি ভরসা করা যায় না। সব সময় তাদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা হচ্ছে শত্রু। তাদেরকে ভয় করে চলো। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কীভাবে বিপথগামী হতে চলেছে![19]

ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এবং অগ্নিপূজক আবু লু'লুর হাতেই শিয়াবাদের গোড়াপত্তন হয়।

হে মুসলিম উম্মাহ, কুফরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও

সুতরাং সমস্ত মুসলমানের উচিত—আকিদার ব্যাপারে যেন সম্পূর্ণভাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে। আল্লাহ যা পছন্দ করেছেন, তা পছন্দ করবে। আল্লাহ যা অপছন্দ করেছেন, তা মন্দ ও ক্ষতিকর মনে করবে। মুসলমানেরা পরস্পর সাহায্যকারী হয়ে এক দেহে পরিণত হওয়া দরকার।

---

১৯. সুরা মুনাফিকুন : ০৪
২০. সুরা বাকারা : ১২০

কারণ, মুসলমানদের সকল শত্রু তাদের ভ্রান্ত ধর্ম এবং কুফরি বিশ্বাস নিয়ে ইসলামের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তা আজ থেকে নয়; বরং সর্বদাই ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কাফেররা মুসলমানদের ওপর খুশি হবে—এর কোনো সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমার প্রতি ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না তুমি তাদের মতাদর্শের অনুসারী হবে।"[20]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত লড়তেই থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীন থেকে ফিরে আসো।"[21]

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড ইসরাইলি ইহুদি রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই অব্যাহত রাখছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলকে সদা অস্থির করে রাখছে। যখনই তারা কোনো ইসলামি রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছে তখনই তারা বর্ণ-গোত্র ও সামাজিক বিভিন্ন কোন্দলসহ নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারসাজি হচ্ছে সেখানকার ইসলামি আদালত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে তার স্থলে মানবরচিত আইন-আদালতের অবকাঠামো দাঁড় করানো; যাতে মুসলিম সমাজ উত্তরোত্তর নানাবিধ সমাধান-বিহীন সমস্যায় জর্জরিত থাকে। বৃটিশ-শাসিত এককালের মুসলিম রাজ্য ভারতবর্ষের দিকে তাকালে এ মহা সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কীভাবে ইসলামি বিচারব্যবস্থা ধ্বংস করে বৃটিশের কুফরি আইন দ্বারা সমাজকে ধ্বংস করেছে!

কিন্তু আল্লাহর শোকর, একমাত্র এই সৌদি আরবেই ইসলামি আদালত বহাল রয়েছে, যাতে শরিয়তসম্মত বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দণ্ডযোগ্য অপরাধে শরিয়তসম্মত বিচারের ব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাওহিদের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এখন শেষ মুহূর্তে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মধ্যপ্রাচ্যে নিজেরাই বিভিন্নমুখী সমস্যা সৃষ্টি করে সেখানে সৈন্য সমাবেশ করার উপায় খুঁজে নিয়েছে। আর এভাবেই

---

২১. সুরা বাকারা : ২১৭

আরবের বিভিন্ন দেশে বাথ পার্টির দর্শন, আরব জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজমের মতো কুফরি মতবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন দল ও মাজহাব তৈরি করা হয়েছে। অথচ এই সব দর্শন ও আদর্শের সাথে ইসলামের এক চুল পরিমাণও সামঞ্জস্য নেই। তারপর এসব ভ্রান্ত দল ও মাজহাবগুলো সাদ্দাম হোসাইন গংদের মতো ব্যক্তি তৈরি করে দীন, ইসলাম এবং ইসলামি উত্থানের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং দেহ তল্লাশির এক বিরাট ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক হয়রানির জাল বিস্তার করেছে। হকের আওয়াজ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বহুমুখী মেধাগুলো স্বদেশ ছেড়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

এভাবে বিভিন্ন বিপ্লবে আক্রান্ত দেশগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে এবং সেসব দেশের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, পরবর্তী শাসক পূর্ববর্তী শাসকদেরকে লা'নত আর ভর্ৎসনা দিয়ে চলেছে। 'নাউজুবিল্লাহ'।

এভাবে সামরিক বিপ্লবে আক্রান্ত দেশগুলো শুধু দুর্বলই হয়েছে। এমনকি সে দেশসমূহের কোনো কোনো আরব দেশে তো দীনী পরিবেশ এতই বিনষ্ট হয়েছে যে, সেখানে জামাতে নামাজ পড়া পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধে গণ্য হয়। 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

এ-ই যদি হয় মুসলিম ও আরব দেশগুলোর দীনী পরিবেশ, তাহলে বলুন, কীভাবে সেসব দেশের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য আসতে পারে? মানুষের দৃষ্টিতে কীভাবে তারা সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী হতে পারে?

তথাকথিত পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো ইসলামি দেশগুলোর দীনী পরিবেশকে নস্যাৎ করার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর তারা সেখানে সামরিক শক্তি নিয়ে উপস্থিতির জন্য ফিলিস্তিনে বিভিন্ন ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়। এর আগে অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখে। বর্তমানে উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশসমূহের স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে সেসব দেশগুলোকে আরও ছোট ছোট রাষ্ট্র-উপরাষ্ট্রে বিভক্ত করে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের দামামা বাজিয়ে দেওয়াই যে পরাশক্তি রাষ্টগুলোর একমাত্র নিয়ত, তা এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এ সবকিছুর মূলে একমাত্র কারণ হচ্ছে ধর্মীয় শত্রুতা। সুতরাং ক্ষমতাধর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর শত্রুতা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে

সব মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি। বরং এর চেয়েও জঘন্যতম শত্রুতা তারা পোষণ করে পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের দেশের প্রতি।

কারণ, মক্কা-মদীনার এই রাষ্ট্র ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্গ। সুতরাং আমেরিকা ও ব্রিটেন এবং তাদের অনুসারী অন্যান্য খ্রিষ্ট ও ইহুদি রাষ্ট্রগুলোর দূরভিসন্ধি এখন সুস্পষ্ট। ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর ক্ষতিসাধন করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। বরং এ কথাই স্পষ্ট করে বলতে হয়, সমস্ত কাফির রাষ্ট্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর শত্রু—তাদের কারও প্রতি কোনো প্রকার আস্থা রাখা সম্ভব নয়। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় মক্কা-মদীনার ক্ষতিসাধন এবং গুরুতর মন্দাবস্থায় নিক্ষিপ্ত করাই যে তাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাই তারা এই পবিত্র রাষ্ট্রের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ধারার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজেদের ভয়ঙ্কর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে ছিন্নভিন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আমেরিকার প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে শাইখ হুজাইফী বলেন, হে আমেরিকা, তুমি কান পেতে শুনে নাও, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর মুসলমানরা দুই পবিত্র হারাম মক্কা ও মদীনা শরিফের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানে জীবনবাজি রাখতে সংকল্পবদ্ধ। হে আল্লাহ, আপনি এ রাষ্ট্রের সম্মান আরও বৃদ্ধি করুন। কারণ, এই রাষ্ট্রটি হচ্ছে ইসলামের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল।

তথাকথিত পরাশক্তি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্নিহিত দূরভিসন্ধির ছয়টি মূল লক্ষ্য

১. ইসলামের চরম শত্রু ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ।

২. পবিত্র মসজিদুল আকসা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে তদস্থলে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর কল্পিত ভাস্কর্য তৈরি করা।

৩. উপসাগরীয় সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা।

৪. উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর তেল ও গ্যাসসহ যাবতীয় খনিজ সম্পদের ওপর লুটতরাজের হীন উদ্দেশ্যে প্রাধান্য লাভ করা; যাতে উপসাগরীয়দের জন্য তাদের রেখে যাওয়া উচ্ছিষ্ট ছাড়া অবশিষ্ট আর কিছুই না থাকে।

৪. দাওয়াতি তৎপরতাসমূহের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা।

৫. মুসলিম সমাজের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে ইসলামের সুন্দর চরিত্র ধ্বংস করার লক্ষ্যে ইসলামি কালচারবিরোধী ভিন্ন কালচারের দিকে আহ্বানের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা। এভাবে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে চরিত্রহীন করে সর্বদা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখা যায়।

শাইখ হুজাইফী মুসলিম শাসকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সম্মানিত মুসলিম শাসকগণ, তুরস্ক থেকে আপনাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। ইহুদি-খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে গিয়ে তারা কী পেয়েছে! মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মতো ধিকৃত মালাউন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। ক্ষমতায় এসেই তাদের হুকুমে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করল। জবরদস্তিমূলক জনসাধারণের ওপর কুফুরি শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তুরস্কের শাসকবর্গ দিব্যি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। শেষ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মহাশত্রু ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সাথে সামরিক চুক্তিও সম্পাদন করল। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, ইহুদি-খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো তুরস্ককে একটি অনুগত চাকরের চেয়ে কখনোই বেশি দাম দেয়নি। বরং আন্তঃরাষ্ট্রীয়-আন্তর্জাতিক কোনো স্তরে তাদেরকে প্রবেশের সুযোগটি পর্যন্ত দেয়নি। তাহলে তাদের অপরাধটা কী ছিল? অপরাধ একটাই, তুরস্ক একদিন ইসলামি খেলাফতের কেন্দ্রীয় শাসনের পতাকাবাহী রাষ্ট্র ছিল; যেখানে ইসলামি আইনে রাষ্ট্র চালিত হতো।

হে মুসলিম শাসকগণ!

নিশ্চিত জেনে রাখবেন, তাদের সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের মহান আদর্শবলির ব্যাপারে যতই ছাড় দিতে থাকবেন, তাদের আনুগত্যে নিজেদেরকে যতটাই অপদস্থ করবেন, তারা কখনো আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। আপনাদের আস্থাবানও মনে করবে না।

তাই হে মুসলিম শাসকগণ!

ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার ধর্মীয় শত্রুতার সীমানা-প্রাচীরটা মেনে নিন। এখনই নিজেদের জাতীয় ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ইরাকের নিরপরাধ শিশু, মহিলা আর নিরপরাধ জনসাধারণের কী এমন অপরাধ! যাদেরকে আজ দীর্ঘ ছয়টি বছরেরও অধিক সময় জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। সেখানকার দুর্বল অসহায় লোকদেরই বা অপরাধটা কী? সত্যি কথা হলো, তাদের অপরাধ একটাই—তারা মুসলমান। ফিলিস্তি কায়দায় তাদেরই

কূটচালে সংঘটিত বিনাশী ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ। এর দ্বারা ব্যক্তি সাদ্দাম আর তার দলের লোকদের কী এমন ক্ষতি হয়েছে? বলতে গেলে তেমন ক্ষতি সাধন হয়নি, যেমন ক্ষতি হয়েছে ইরাকবাসীর। সাদ্দামকে শাস্তি দানের অজুহাত দেখিয়ে ইরাকবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কেয়ামতসম ভয়াবহতা। চালানো হয়েছে বর্ণনাতীত নির্যাতন। আর ইরাকের অপরাধ চিহ্নিত করা হয়েছে এই বলে যে, ইরাক জাতিসংঘের প্রস্তাব রক্ষা করেনি। আচ্ছা তাওতো একটি মাত্র প্রস্তাব! অথচ মানবতার শত্রু ইসরাইল, জাতিসংঘের এক-দুটি নয়, বরং এ পর্যন্ত ৬০টিরও অধিক প্রস্তাব অমান্য করেছে।

আমেরিকা বিশ্বকে আণবিক অস্ত্রমুক্ত করার শ্লোগানের ধোঁয়া তুলছে। ইসরাইল আজ পর্যন্ত তাদের কথার প্রতি কোন প্রকার কর্ণপাত না করে আণবিক অস্ত্র-মুক্তির সনদে সাক্ষর পর্যন্ত করেনি। অথচ ইসরাইলি হুমকির মুখে গোটা উপসাগরীয় অঞ্চল বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে এ ধরনের আণবিক মারণাস্ত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। কারণ, সাদ্দাম ও তার দলীয় ব্যক্তিবর্গ শত্রুদের হাতের পুতুল হয়ে ইসলামের শত্রুরা যা চায়, তা-ই জ্ঞাত-অজ্ঞাতভাবে কার্যকর করে।

আমেরিকা!

তোমার প্রতি আমার উপদেশ, তুমি উপসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোনো প্রকার দখলদারিত্ব করো না। এসকল দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সৌদি আরব যথেষ্ট সচেতন এবং সক্ষম। এতে তোমার নাক গলানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

আমেরিকা!

তোমাকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে বলছি। তুমি সমর শক্তির অহংকার করো না। দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা থেকে একদম বিরত থাকো। নইলে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাকে বলছি! দেখবে, তোমার চিহ্নটিও পৃথিবীর বুকে থাকবে না। কারণ, মহান আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম হলো, কোনো মজলুম জাতি যখন জালিম আর নিপীড়নকারী কোনো শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। প্রতিপক্ষের দাম্ভিকতাপূর্ণ শক্তিকে এমনভাবে মোমের মতো গলিয়ে দেন, এমনতর নিঃশেষ করে দেন যে, দাম্ভিক শক্তির সত্তাটাও ধ্বংস হয়ে

যায়। বিচূর্ণ হয়ে যায় সকল জৌলুস আর অপশক্তির দাপট। আর এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতের পক্ষ থেকেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

আমেরিকা ও অন্যান্য ক্ষমতাধর সকল রাষ্ট্রের উচিত, আফগান মুজাহিদদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। যখন রাশিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্বেত ভল্লুকেরা আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করেছিল। আর তখন সহায়-সম্বলহীন আফগান বীর জাতি কেবল লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের পবিত্র ইসলামি জিহাদ শুরু করেছিল। তারা সেই ক্ষমতাধর পরাশক্তি কুফরি রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। তোমাদের পরিণামের হিসাব করার এখনো সময় আছে।

অপশক্তির অহমে অন্ধ আমেরিকা!

জেনে রেখো! টেকনোলজি ও সামরিক প্রযুক্তিই সব কিছু নয়। নিশ্চয়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান। ঈমানী শক্তির সামনে যেকোনো ক্ষমতাধর কুফরি পরাশক্তি মাথা নত করে পরাজিত হতে বাধ্য।

উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার প্রশ্নে বলতে হয়, সেটা তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার। কিন্তু সেখানে সমূহ সমস্যা ও অস্থিরতা কারা সৃষ্টি করে? একমাত্র নামধারী ক্ষমতাধর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোই। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা নিজেরাই সমস্যা সৃষ্টি করে, আবার তারাই বলে, আমরা সমস্যার সমাধান করব। আমরাই সংকট নিরসন করে সুন্দর ব্যবস্থাপনা-শঙ্কামুক্ত নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে দেবো। অথচ এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংকট। কারণ, বাঘ কি কোনোদিন ছাগলের রক্ষক হতে পারে? না, হতেই পারে না।

হে আল্লাহর বান্দারা!

মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে ধর্মীয় শত্রুতাই মূল বিষয়। যা ভুলে গেলে আমাদের চরম মূল্য দিতে হবে। আমেরিকা আকারে হাতির মতো বড় হলেও তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। একমাত্র ইহুদি মাহুতরাই তাকে যেদিকে ইচ্ছা, অনুগত হাতির মতো সেদিকে টেনে নিয়ে যায়। স্পষ্ট ভাষায় বলছি—মুসলিম উম্মাহ কখনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে, বিশেষত উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোতে, আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো কুফরি রাষ্ট্রের সৈন্য সমাবেশ কোনো অবস্থাতেই মেনে নেবে না। কারণ, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আরব উপদ্বীপে দুই ধর্ম ইসলাম ও কুফরের সহাবস্থান হতে পারে না"।[২২]

মৃত্যুশয্যায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসিয়ত ছিল এটাই যে, "তোমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও"।[২৩]

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অসিয়ত পালন করা ফরজ।

হে মুসলিম উম্মাহ!

সর্বপ্রকার ভীতির মেঘ আজ তোমাদের মাথার ওপর তাঁবুর মতো ছেয়ে গেছে। সুতরাং এ মুহূর্তে তোমাদের সবার জন্য মুসিবত থেকে নাজাত পেতে আল্লাহর কাছে তওবা করা অতি আবশ্যক। কারণ, একমাত্র পাপের কারণেই বালা-মুসিবত নাজিল হয়। আবার তাওবা ছাড়া বালা-মুসিবত কখনোই দূর হয় না।

হে আল্লাহর অবাধ্য মদ্যপায়ী ব্যক্তি, আল্লাহর কাছে তাওবা করো। তোমার তাওবা তোমার সমাজ শুদ্ধির কাজে একটি বড় সহায়ক। হে ব্যভিচারী, আল্লাহর নাফরমান, হে সমকামী, আল্লাহর নাফরমান, আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আল্লাহর মাগফেরাত-রহমত সন্ধানে ব্রত হও। হে বেনামাজি, আল্লাহর নাফরান, আল্লাহর তা'আলার দিকে ফিরে এসো। হে জালিম, মুসলমানের অর্থসম্পদ ও মান-সম্মান লুণ্ঠনকারী, রবের রহমত পানে প্রত্যাবর্তন করো। হে মুসলিম জাতি, নিজেদের অর্থসম্পদকে সুদের নাপাকি থেকে পবিত্র করো। কারণ, একমাত্র সুদি লেনদেনই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফ্যাসাদসহ আল্লাহর যাবতীয় ক্রোধের কারণ। তোমাদের পারস্পরিক লেনদেন ও যাবতীয় মুয়ামালা-মুয়াশারাকে ইসলাম ও শরিয়তের বিধানের সাথে সংঘাতপূর্ণ আচরণ থেকে পবিত্র করো; যাতে ব্যাংকিংসহ অন্যান্য লেনদেন শরয়ী বিধানের অনুগত হয়ে চলতে পারে।

আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকো। যাবতীয় ইসলামি দাওয়াতি তৎপরতার শক্তি যোগাতে থাকো।

---

[২২]. মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ২৬০৭

[২৩]. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

মুসলমানদেরকে ইসলামি আহকামের তা'লিম দিতে থাকো। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার গুরুত্ব অনুধাবন করো। মহান আল্লাহর দিকে অমুসলিমদেরকেও দাওয়াত দিতে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য। এসব বিষয়ে ওই সকল উলামায়ে কেরামেরই মনোনিবেশ করা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা ফরজ; যাদের আকিদা, ইলম ও শরিয়তের প্রতি দৃঢ়তার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা রাখা যায়। বিশেষভাবে তা ওইসব মুফতিদেরই কর্তব্য, মুসলিম সমাজ স্বীয় সমস্যাবলির কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান লাভের উদ্দেশ্যে যাদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে।

হে মুসলমানগণ!

বিশেষভাবে ওই দলীয় দ্বন্দ্ব থেকে—যেগুলো মুসলিম সমাজকে পরস্পর দ্বিধা-বিভক্ত করে দেয়—এবং স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লোভ পরিহার করো, যা মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করে।

হে মুসলিম সমাজ!

আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করো। আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সচেতন হও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। কখনো শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেক গুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য নির্দেশনা বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো; যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখো! তোমরাই তাদের ভালোবাসো। কিন্তু তারা তোমাদের সাথে মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস করো। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর ক্ষোভবশত আঙুল কামড়াতে থাকে। আপনি বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। আল্লাহ মনের কথা ভালোই জানেন। তোমাদের যদি মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের

কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, তা সব আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।"[২৪]

মহান আল্লাহ তাঁর মহান আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআন দিয়ে আমাকে ও আপনাদেরকে বরকতময় করুন এবং কুরআনে কারিমের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও হেকমতপূর্ণ নসিহত দিয়ে আমাকে ও আপনাদেরকে উপকৃত করুন। সাইয়িদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জীবনাদর্শ ও তাঁর মহান বাণী দিয়ে আমাদের সবাইকে উপকৃত করুন, আমিন।

এ বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। মহান আল্লাহর নিকট আমার জন্য এবং আপনাদের জন্য ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বপ্রকার পাপ থেকে মাগফেরাত কামনা করছি। আপনারাও তাঁর নিকট মাগফেরাত কামনা করুন। নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহই সমস্ত পাপের মার্জনাকারী ও অত্যন্ত দয়াশীল।

দ্বিতীয় খুতবা

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার, যিনি নেককারদের বন্ধু। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। যিনি মুসলিমদের সম্মানিত করেছেন আর কাফিরদের লাঞ্ছিত করেছেন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের নবী ও সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসুল। যিনি অঙ্গিকার রক্ষাকারী ও আমানতদার। হে আল্লাহ, আপনার বান্দা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবির ওপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি

হে মুসলিমরা, আল্লাহ তা'আলা কে ভয় করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন সে তোমাদেরকে আহ্বান করে সেই জিনিসের প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায়

২৪. আলে ইমরান : ১১৮-১২০

হন। আর নিশ্চয় তার নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। আর তোমরা ভয় করো ফিতনাকে, যা তোমাদের মধ্য থেকে শুধু জালিমদের ওপরই আপতিত হবে না; [বরং এই ফিতনায় ওইসব নেক লোকও আপতিত হবে, যারা গোনাহগারদেরকে গোনাহ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে না] আর জেনে রেখো, আল্লাহ আজাব প্রদানে বড় কঠোর।"[২৫]

হে মুসলিমরা, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ওপর একত্রিত হয়ে যাও। কিতাবুল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ওপর আমল করো। প্রতিটি মুসলিমকে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। সকল মুসলিম দেশের উচিত, তারা পরস্পর সম্প্রীতি লালনকারী ও একে অপরের সহযোগী হওয়া। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের এই ভয়াবহ আশঙ্কার সময়ে, যা মুসলিম দেশগুলোর ওপর ধেয়ে আসছে। কাফেরদের লক্ষ্য হলো, তারা তাদের বিষয়গুলোতে দখলদারিত্ব ও ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদেরকে নিরাশ করে দিতে চায় এবং একেকে অপর থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে ধ্বংস করে দিতে চায়।

মুসলিম দেশগুলোর দায়িত্ব

এই অবস্থায় মুসলিম দেশগুলোর, বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশসমূহের ওপর কর্তব্য হলো, তারা একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পথ অবলম্বন করা। উপসাগরীয় দেশসমূহের ওপর কর্তব্য হলো, তারা সম্মিলিত কাজসমূহে কোনো একক মতামত ও বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। উপসাগরীয় দেশসমূহের কোনো দেশই সৌদি আরবের পরামর্শ ব্যতীত কোনো চুক্তি স্বাক্ষর না করা। কেননা, এ দেশ এসকল দেশ টিকে থাকার মাধ্যম। এসকল দেশ আল্লাহ তা'আলা থেকে শক্তি অর্জনের পর এই দেশ থেকে শক্তি অর্জন করে থাকে। এই দেশ এসকল উপসাগরীয় দেশসমূহের জন্য সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ।

এই দেশসমূহের ওপর এটাও কর্তব্য, ইরাকের ওপর আক্রমণের জন্য আল্লাহর দুশমনদেরকে কোনো সেনাছাউনি ব্যবহার করতে না দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিনকে এক দেহের মতো বানিয়েছেন আর ইসলামের শত্রুদের ছাউনি প্রদানের দ্বারা ইরাকি মুসলিমদেরই ক্ষতি হবে।

[২৫]. আনফাল : ২৪-২৫

যদিও এই কঠিন সমস্যা দৃশ্যত সমাধান হওয়ার মতোই, কিন্তু এতে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না যে, বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আরও কঠিন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে না।

সুতরাং জরুরি হলো, কাফেররা যেন এসকল দেশে তাদের এমন কোনো বিশ্বস্ত মিত্র তালাশ করতে না পারে, যে তাদের গোপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। তাদের ওপর এটাও কর্তব্য যে, আমেরিকা কিংবা যেকোনো কাফের রাষ্ট্রকে কোনো মুসলিম দেশে আক্রমণের জন্য, সামরিক নৌযান নোঙ্গরের জন্য নিজেদের বন্দরে জায়গা দেওয়ার মতো ঘৃণ্য উদারতা না দেখানো আর না নিজেদের অঞ্চলে তাদের সামরিক স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া।

হে মুসলিমরা, আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করো। মুসলিম দেশসমূহ ও আরব দেশগুলোর ওপর কর্তব্য হলো, এই যুদ্ধ জাহাজ ও ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে সৌদি আরবের পরিপূর্ণ সঙ্গ দেওয়া। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **"আরব উপদ্বীপে দুটি দীন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।"**[২৬]

এই অঞ্চলের শাসকরা তাদের দায়িত্ব ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পথ ও পন্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। যদি এই ভূমি বৃহৎ শক্তির অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হয়ে যায় তাহলে তার নিরাপত্তার জন্য কোনো আশঙ্কা নেই।

মুসলিমদের সাথে কাফেরদের শত্রুতা ও হিংসা

হে মুসলিমরা! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। একে অপরের বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যাও। এ কথা বুঝে নাও, এই কাফেররা তোমাদেরকে হিংসা করে। এমনকি এই অঞ্চলের মনোরম পরিবেশের প্রতিও হিংসা রাখে। কেননা, তাদের শহর কল-কারখানার ধোঁয়া এবং তাদের উপাসনালয়গুলো তাদের পাপ ও আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় কর্মের পঙ্কিলতা ও নাপাকিতে ভরপুর। এ জন্য ওরা তোমাদের সবকিছুতে হিংসা করে। আর সবচেয়ে মহান বস্তু যাকে তারা হিংসা করে তা হলো দীন, ইসলাম ও আখলাক।

হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ভয় করো এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী শোনো—

[২৬]. মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ২৬০৭

"অচিরেই তোমাদের ওপর এমন একটা সময় আসবে, যখন বিশ্ব কুফরি শক্তিগুলো একে অপরকে আহ্বান করে তোমাদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমনটা খাবারের পাত্রে একে অপরকে আহ্বান করে করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তখন কি আমাদের সংখ্যা খুব কম হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। বরং তোমাদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি হবে। তবে তোমরা হবে সাগরের ফেনার মতো। তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' ঢেলে দেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াহান কী? নবীজী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে অনিহা। অপর এক বর্ণনায় আছে, দুনিয়ার ভালোবাসা ও কিতালের ব্যাপারে অনিহা।"[২৭]

দু'আ

হে আল্লাহর বান্দারা! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। তোমরাও তাঁর ওপর বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করো। নবীজী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "যে ব্যক্তি একবার দুরুদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশটি রহমত নাজিল করেন।" সুতরাং তোমরা সাইয়িদুল আওয়ালিন ওয়াল আখেরিনের ওপর দুরুদ ও সালাম পাঠ করো।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ...

হে আল্লাহ! হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন, যেমনটি রহমত অবতীর্ণ করেছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার উপযুক্ত ও মহান। হে আল্লাহ! হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বরকত অবতীর্ণ করুন, যেমনটি অবতীর্ণ করেছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসার উপযুক্ত এবং মহান। হে আল্লাহ! খুলাফায়ে রাশেদিন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী ও সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে রাব্বুল আলামিন! তাদের ওপরও সন্তুষ্ট হয়ে যান যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের সর্বোত্তম পথের অনুসারী হবে।

[২৭]. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৩৯৭

হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ দয়ালু! আমাদের প্রতিও আপনার দয়ায় সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মান ও বিজয় দান করুন এবং কুফর এবং কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুন।

হে আল্লাহ! কুফরের সর্দারদেরকে আপনার আজাবে নিপতিত করুন। হে আল্লাহ! তাদের সকল কর্মকাণ্ড ও পরস্পর সম্পর্কের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিন। হে আল্লাহ! যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। হে আল্লাহ! হে রাব্বুল আলামিন! কুফরি শক্তিগুলোকে তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত করে দিন এবং তাদেরকে মুসলিমদের থেকে দূরে সরিয়ে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত করে দিন। হে আল্লাহ! ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টাকে বেকার করে দিন। হে আল্লাহ! যে-কেউ আমাদের সাথে এবং আমাদের ভূখণ্ডের সাথে অনিষ্ট ও ক্ষতির ইচ্ছা পোষণ করে, আপনি মেহেরবানি করে তাদের অনিষ্ট ও ক্ষতিকে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করুন। তাদের এবং তারা যে অনিষ্টতার ইচ্ছা পোষণ করে—এ দুয়ের মাঝে আপনি প্রতিবন্ধক হয়ে যান।

ইয়া রাব্বাল আলামিন! নিশ্চয় আপনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আমরা প্রত্যেক কাফিরের মোকাবিলায় আপনাকেই সামনে রাখি অর্থাৎ আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমরা মুশরিকদের মোকাবিলায় আপনার মাধ্যমেই প্রতিরোধ করি। হে আল্লাহ! ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর আপনার আজাব আপতিত করুন। হে আল্লাহ! হিন্দু ও মুশরিকদেরকে আপনার আজাব ও ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিন। হে আল্লাহ! তাদের ওপর আপনার এমন আজাব অবতীর্ণ করুন, যা অপরাধী জাতিগুলো থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয় না। হে আল্লাহ! তারা গোটা দুনিয়াকে ফিতনা-ফাসাদ ও জুলুম-নির্যাতন এবং পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে দিয়েছে। হে আল্লাহ! আমরা তাদের মোকাবিলায় আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকটই আশ্রয় চাচ্ছি। আমরা রাফেজিদের অনিষ্ট থেকে আপনারই আশ্রয় চাই। নিশ্চয় আপনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান।

হে আল্লাহ, মুসলিমদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে সংশোধন করে দিন। শান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করুন। তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানের সমূহ কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ!

আমাদের শাসকদেরকে হেফাজত করুন এবং তাদেরকে এমন কাজ করার তাওফিক দান করুন যা আপনার পছন্দ ও যার ওপর আপনি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ! তাদেরকে হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করুন এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! দীনী ও দুনিয়াবী কাজে তাদেরকে সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! যখন হক ও বাতিলের মাঝে অস্পষ্টতা আসবে, তখন তাদেরকে হকের দিকে পরিচালিত করুন। হে আল্লাহ! তাদের অন্তরের সংশোধন করে দিন। হে আল্লাহ! হে রাব্বুল আলামিন! মুসলিমদেরকে আপনার সন্তুষ্টি এবং পছন্দের কাজ করার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহর বান্দারা, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি যাবতীয় মন্দ কাজ ও জুলুম-নির্যাতন করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ জন্য উপদেশ প্রদান করেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদাকে পূর্ণ করো। যখন তোমরা এটাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করবে এবং কসম করে তা ভঙ্গ না করবে, তখন তোমরা আল্লাহ তা'আলা কে তার ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিলে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে, যা তোমরা করছ।"

তোমরা সেই আল্লাহকে স্মরণ করো, যিনি মহান ও মহৎ, আল্লাহও তোমাদের স্মরণ করবেন। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলার জিকির অনেক বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু করছ, আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছুর ব্যাপারেই অবগত।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রদত্ত চিত্র নং ১,২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে লেখা শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ-এর ঐতিহাসিক চিঠি

মুসলিম উম্মাহর সমীপে ইসলামের এক অবিসংবাদিত বীর সেনানী, সোনালি যুগের মহান সিপাহসালারদের এ যুগের প্রতিচ্ছবি, মুজাহিদে ইসলাম শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্মস্পর্শী চিঠি—যার লাইনে লাইনে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি হৃদয়স্পর্শী ব্যথা এবং শব্দে শব্দে তাদের বিজয় ও সাহায্যের আর্তনাদ ঝরছে। অগ্নিভস্ম হৃদয়ে কলজে পোড়া ছাইসদৃশ রক্তবিন্দু থেকে লিখিত দুটি পত্র। যা মুসলিম উম্মাহর আগামী দিনের ভয়ঙ্কর বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী। সমাধানকল্পে করণীয় কার্যাবলির বিশদ বিবরণ।

পূর্বসূরিদের স্মরণ পুনরুজ্জীবিতকারী ইসলামের এই মহান ব্যক্তিত্ব এই চিঠি দুটিতে মুসলিম যুবকদেরকে ও জাতির কর্ণধার ওলামায়ে কেরামকে বিশ্বকুফরি শক্তির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করেছেন। মুসলিম বিশ্বে এই দৃঢ়পদ মহান মুজাহিদের প্রতি বিশ্বাস-ভালোবাসা পোষণকারীর সংখ্যা অপ্রতুল; কিন্তু এ মুহূর্তে আবশ্যক হৃদয় দিয়ে তার পয়গাম অনুধাবন করা ও তার ডাকে সাড়া দেওয়া।

সকল প্রশংসা ওই আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি ইরশাদ করেছেন : "হে ঈমানদাররা, নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।"[২৮]

দুরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নুরানী সত্তার ওপর, যিনি মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ ওসিয়ত করেছিলেন এই বলে :

"তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও"।[২৯]

হামদ ও সালাতের পর!

আহ ইসলাম!

আহ মুসলমানদের কেবলা!

হে আমার জাতি!

---

২৮. তাওবা : ২৮

২৯. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

আমার দিকে মনযোগী হও। তোমাদের এমন কঠিনতম বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছি, যা আমার চোখের সামনে। এমন ভয়াবহ বিপদ, যা মাথার ওপর সমবেত। আর তা হলো, আমেরিকার পক্ষ থেকে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের পবিত্রতাকে পদদলিত করা। আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত শহরের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা; সেই শহর— যেখানে মুসলমানদের পবিত্র কেবলা অবস্থিত, যেখানে ওহী নাজিল হয়েছে, যেখানে দুঃসাহসী যোদ্ধা, নিপুণ যুদ্ধ-কমান্ডার প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্ম ও বাসস্থান। বাইতুল মুকাদ্দাস ও আশেপাশের পবিত্র ভূমির ওপর পুরোপুরি দখলদারিত্বের পর এটা এক নতুন; বরং পূর্বের চেয়েও আরও অনেক বড় মুসিবত, যা আমেরিকা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

হে আমার জাতি! তোমরা কোথায় ঘুমিয়ে আছ? হে বিশ্বের মুসলমান! তোমরা কোন খেয়ালে আছ? এই ভয়াবহ ফেতনা, মহা-পরীক্ষা আর এমন কঠিন বিপদ দেখেও কীভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে বসে আছ? হে আমার জাতি! হে আমার মুসলিমগণ! পবিত্র হারামাইনের ভূমিতে গাদ্দার ইহুদিদের উপস্থিতি এবং ক্রুশের নাপাকি কি তোমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না? এর চেয়ে অধিক মর্মান্তিক মুসিবত ও কষ্টদায়ক ঘটনা আর কী হতে পারে, যার অপেক্ষা তোমরা করছ?

জাজিরাতুল আরবের ওপর এমন বিপদ এসে পড়েছে, কারও এতে এতটুকু অনুভূতিও নেই। এর ওপর আমেরিকান সৈন্যরা এমন আক্রমণ করে রেখেছে, যা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এর পূর্বে আর কেউ করেনি। পবিত্র ভূমিতে ওরা হনহনিয়ে ফিরছে। মুসলিম সমুদ্রসমূহকে নিজেদের সামুদ্রিক জাহাজ দ্বারা আলাদা করে চলেছে। পবিত্র ভূমির পবিত্র পরিবেশে পুরো স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুশোকের পরে এর চেয়ে বড় আর কোন মুসিবত নেই—যা উম্মাহর সামনে সংগঠিত হয়েছে। এই ইহুদি ও খ্রিষ্টান, যাদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে এখান থেকে চিরতরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আজ এখানে ওই দুশ্চরেরা রাষ্ট্রীয় দখলদারের একেবারেই কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তারা এখানে পূর্ণ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে ঝেঁকে বসবে। বিষয়টি এখন সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। কিন্তু অন্যের চিকিৎসা প্রদানকারী স্বয়ং নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। স্বয়ং ডাক্তারের গলায়-ই হাড্ডি আটকেছে।

উপসাগরীয় শাসকদের অজুহাত

প্রথমদিকে আমেরিকান সৈন্যদের আগমনের বৈধতা সম্পর্কে উপসাগরীয় শাসকদের পক্ষ থেকে এই দলিল পেশ করা হয়েছে—আমাদের কাছে ইরাকি হামলা প্রতিহত করার যথাযথ শক্তি নেই। আরব দেশগুলো কিংবা অন্যান্য মুসলিম দেশ নিজেদের সৈন্য প্রেরণের যে ইচ্ছা করেছে, তা সাথে সাথেই ব্যবস্থা হবে না। মানুষ এই হাস্যকর ও অসহায় দলিল শুনে শুধু এ জন্য চুপ হয়ে গেছে, তারা মনে করেছিল এই সৈন্যরা কয়েক মাসের জন্যই এসেছে। কিন্তু এই দলিলের কোনো সত্যতা ছিল না। মানুষের এই মনে করাটা সঠিক ছিল না। উপসাগরীয় শাসকদের এই দলিল ভীষণ শঙ্কার ও অন্তঃসারশূন্য ছিল।

চলুন, আমরা মেনে নিলাম, ইসরাইলের নিরাপত্তাকে আশঙ্কা থেকে বাঁচাতে এই শাসকরা এমন সৈন্যদল পর্যন্ত তৈরি করেনি, যারা নিজ দেশের আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু এমন যুদ্ধমুখী পরিস্থিতিতেও অমুসলিমদের থেকে সাহায্য নেওয়ার পূর্বে জাযিরাতুল আরবের মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার জন্য ভরপুর আওয়াজ কেন ওঠানো হলো না? মানুষকে এই বিপদের ভয়াবহতা বুঝিয়ে, কেন সৈন্য ভর্তি করা হলো না? মুসলিম জানবাজদেরকে আত্মরক্ষার ফরজ আদায়ের সুযোগ কেন দেওয়া হলো না? এসব কিছু করা ব্যতীত ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে মুসলিম দেশের হেফাজতের জন্য ডেকে আনা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কতটা বেঈমানী? জাযিরাতুল আরবে কি পুরুষের জন্ম বন্ধ হয়ে গেছে যে, আমেরিকার লেডিসফোর্স তথা নারী সৈনিকদেরকে এই সুরক্ষার ফরিজা আদায়ের জন্য এখানে এনে সমবেত করা হয়েছে? মানুষ আমেরিকান সৈনিকদের আগমনকে অস্থায়ী মনে করাটাও ভুল ছিল। কেননা, তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর আরও এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বছর গেল, বর্তমানে সাত বছর হতে চলছে। কিন্তু কাফির সৈন্য মুসলিম দেশ থেকে প্রত্যাহারের নামও নিচ্ছে না। বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসাধারণ, রাজনীতিকবৃন্দ, শাসকদের সুরে সুর মেলানো দরবারি মোল্লাদের এই ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে গেছে। পুনরায় আমেরিকা ইরাকের ওপর জবাবি আক্রমণের যে ঢোল পেটাচ্ছে এবং যত জোরেশোরে এর প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, তার রহস্য তখনই উন্মোচিত হয়ে গেছে, যখন যুদ্ধের পরে লোকেরা ইরাককে দেখেছে। এমনই ঠিকঠাক ছিল, যেন এর ওপর কোন হামলাই হয়নি। সকল মুসলিম এবং কাফির এর ওপর একমত, আমেরিকার

ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুধুই লোক দেখানো। বরং একটি অজুহাত ছিল, ইহুদি সৈন্য জাজিরাতুল আরবে অবতরণ করবে।

আরব ভূমিতে আমেরিকান সৈন্য কেন? আমরা দ্বিতীয়বার এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছি। আমেরিকান সৈনিক আমাদের ভূখণ্ডে কেন ছাউনি গেড়ে আছে? আমরা এর সন্তোষজনক কোনো উত্তর এখন পর্যন্ত পাইনি। কোনো কোনো লোক তাদের মুনাফেকি ও ধোঁকাবাজি ঢাকার জন্য এদিক-সেদিক হাঁকে। কিন্তু আমরা তো এই প্রশ্নের উত্তরে আরব ভূখণ্ড-সংক্রান্ত আমেরিকার লালসাই দেখছি। এটা কেবল আমাদের ধারণাই নয়, স্বয়ং তাদের ঘরের বেদী-ই এর সাক্ষী, এসব কিছু এই পবিত্র ভূমির পবিত্রতা পদদলিত করতে এবং আরবদের গলায় ফাঁস দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ এই অন্তরঙ্গের উন্মোচন এই লোকদের মুখে প্রচণ্ড থাপ্পর, যারা মূলত আমেরিকার সংকল্পের ওপর পর্দা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিংবা এই দাবি করে, আরবরা কারও ওপর নির্ভরশীল নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

জাজিরাতুল আরবে আমেরিকার আগ্রহের কারণ

একটু ভাবুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 'ফ্রাঙ্কলিন রোজপেল্ট' আজ থেকে ৬০ বছর আগে জাজিরাতুল আরবের ওপর আমেরিকার লোলুপ দৃষ্টি দেওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এবং তার এই ভূখণ্ডের প্রতি আগ্রহ এবং লালসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ৩টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ পেট্রোলের ওপর আমেরিকার দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

২. বিশ্বযোগাযোগ ব্যবস্থার মূল সমুদ্রসমূহকে নিজেদের আয়ত্তে নেওয়া।

৩. ইসরাইলের স্থায়ী নিরাপত্তা এবং (পশ্চিমা গোষ্ঠীদের) স্বাধীন যাতায়াত।

আমেরিকান নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত বিষয়ের বিস্তারিত কিছুটা এমন মনে হয়!

আরব ভূখণ্ডে পশ্চিমা শিল্পোন্নত জীবনের আবে-হায়াত। অর্থাৎ গোটা বিশ্বের পেট্রোলের ৮০% এরও বেশি এখানে বিদ্যমান। পেট্রোলের এই পরিমাণ আগামী ১০০ বছরে আরও বৃদ্ধি পাবে। যেখানে সাতটি শিল্পোন্নত দেশ এবং তার সাথে পশ্চিম ইউরোপ মিলে ৫৫% পেট্রোলেরও মালিক না। এবং তাদের ভাণ্ডারে আগামী ১০০ বছরে ২%ও বৃদ্ধি হবে না।

উপসাগর দিয়েই পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর জীবনের স্পন্দন তথা তেলের পাইপলাইন গিয়েছে। সবাই জানে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলো বেঁচে থাকার জন্য পেট্রোল এমন জরুরি, মানব দেহের জন্য রক্ত যেমন জরুরি।

এই ভূখণ্ডে অনেক বড় বিশ্ববাজার রয়েছে। বিশেষ করে এই উপসাগরীয় দেশসমূহে, যারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এবং প্রতিটি উন্নত বস্তু পশ্চিমা এবং তার মিত্রদের থেকে আমদানি করে থাকে।

এই ভূখণ্ডে ইহুদি লবি নিজেদের জন্য স্থান অর্জনের চেষ্টায় ছিল। এখন তাদের মাথা গোজার ঠাঁই হয়ে গেছে। তারা এটাকে তাদের কেন্দ্র বানিয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী, নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আমেরিকায় তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে।

এই ভূখণ্ডে কাফেরদের দুশমন নতুন ইসলামি সৈন্যদল তৈরি হচ্ছে। তাদের ভয়ে ভীতু পশ্চিমারা চাচ্ছে তাদের প্রতিহত করতে তাদেরই ভূখণ্ডে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং মূলত জাজিরাতুল আরবের বিরুদ্ধে আমেরিকার শত্রুতা এবং হিংসা-বিদ্বেষের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করতে। আর রমজান ১৩৯৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৩ সালে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে এই ভূখণ্ডের প্রতি তাদের লোভ-লালসা আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ওই যুদ্ধে তাদের এই ভূখণ্ড-সম্পর্কিত আগ্রহ ও লোলুপ দৃষ্টি এবং এখানে উপস্থিত তাদের মিত্র ইহুদিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের চেষ্টা সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে উপসাগরীয় রাজত্ব তাদেরই তত্ত্বাবধানে বণ্টন করা হয়েছে। তাদের এখানে তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল—তাদের আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমান এখানে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পৌঁছে যাবে এবং মুসলমান পৌঁছেও গিয়েছিল; কিন্তু পৌঁছুতে তাদের একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমা শক্তি তাদের কাজ দেখে ফেলেছিল।

আমেরিকার ইচ্ছা রিগনের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, যা সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্রিফিং দিতে গিয়ে দিয়েছে। সে তাতে জোড় দিতে গিয়ে বলে, বর্তমান বিশ্বযোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তাকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব। বিশেষভাবে স্থল ও সামুদ্রিক পরিবহনের ওপর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেট্রোল উৎপাদিত এলাকাসমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই এই আবে-হায়াতের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা যেতে পারে। কেউ এটা মনে করবেন না, তাদের এই লোভ-লালসা শেষ হয়ে

গেছে। এই যুদ্ধে অংশরত ক্রুসেডার সৈন্যদের প্রধান পরিচালক জেনারেল শোয়াজ রুকুফের ওই কথা এই সুধারণার পুরোপুরি নাকচ করে দেয়, যা সে পূর্বে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের শুরুতে ১৪১১ হিজরিতে বলেছিল। পুনরায় হুবহু একই কথার পুনরাবৃত্তি ১৪১৬ হিজরিতে এই ভাষায় করেছে-'আমেরিকান সৈন্যরা সৌদিতে বহাল থাকা অনেক বেশি জরুরি। তারা আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র এবং আরব ভূখণ্ডে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র, যারা ব্যক্তিগত শক্তি, রাজনৈতিক ভিত্তি ও অর্থনৈতিক উপকরণের মালিক। এই উপকরণের দ্বারা আমাদের সৈন্যদের সাহায্য মেলে। ওইসব বস্তু যা আমাদের নিজেদের উন্নতির সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন, এখান থেকেই ব্যবস্থা হয়।'

এ সম্পর্কে আরও জানতে তার এই বক্তব্যটিও ভাবুন—যা আমেরিকার ভবিষ্যৎ ইচ্ছাকে প্রকাশ করে! 'আমাদের সৈন্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও উন্নয়নের সংরক্ষণ করছে এবং আমাদের ওপর কর্তব্য, যতক্ষণ এই ভূখণ্ডের সাথে আমাদের উন্নয়ন ও স্বার্থ জড়িত, ততক্ষণ তাদের প্রতিরক্ষা করা।'

হেজাজের ভূমি মুসলমানদের নির্জীবতার ওপর বিলাপরত

মোটকথা, জাজিরাতুল আরবের পবিত্রতা, সম্মান এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পরিবেশ, জল-স্থল সর্বদিক থেকে পদদলিত করা হচ্ছে। এখনো যদি কারও এই সুস্পষ্ট বাস্তবতার মধ্যে কোনপ্রকার সন্দেহ থাকে, যা প্রত্যেকের সম্মুখে দৃশ্যমান তবে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, এই যুদ্ধজাহাজ, দানবসম যুদ্ধবিমান ও বহু সংখ্যক সৈন্য এই ভূখণ্ডে কেন এসেছে? এর কোনো উপযুক্ত কারণ আমাকে বলুন তো? এটা কি শুধু এ জন্য যেমনটি নির্বোধ সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন,'এরা আমাদেরকে ইরাকি ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপত্তা প্রদান করতে এসেছে'। এই দলিল স্বয়ং আরব ভূখণ্ডের নেতাদের ওই বক্তব্যের দ্বারাই নাকচ হয়ে যায়, যাতে তারা বলেছেন, ইরাক এমন পদক্ষেপ নেয়নি, যা ভয়াবহতার সীমানায় পৌছায় এবং যার প্রতিরক্ষার জন্য মার্কিন সৈন্যের প্রয়োজন। তারপর সকল উপসাগরীয় দেশ যখন নিজেদের এত করে যুদ্ধের অজুহাতের সমাপ্তি ও ইরাকের সাথে মতভেদের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছে তাহলে তার অপেক্ষা করা ব্যতীত আমেরিকাকে ডেকে আনার মধ্যে তাড়াহুড়া কেন করা হলো? বরং সে দেশগুলো আমেরিকাকে ইরাকের ওপর আক্রমণের জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে

এবং আমেরিকাকে ইরাকের ওপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। এই সকল কর্মকাণ্ড এই দলিলের অসারতাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে।

আমেরিকার গোপন ইচ্ছা ও দুষ্ট নিয়ত এর দ্বারাই অনুমান করা যায়—আমেরিকা উপসাগরীয় সকল নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তকে বিবেচনার অযোগ্য মনে করছে এবং সে কথার ওপরই বলবৎ রয়েছে যে, শক্তিতে ওরা উপসাগরে বিদ্যমান শিকার গলধঃকরণ করতে পারে। এমনকি তারা কারও অনুমোদন ব্যতীতই একের পর এক নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের সামরিক শক্তি নির্লজ্জভাবে বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এখনও কি কারও জাজিরাতুল আরবে অমুসলিম দখলদারিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ আছে? কাফিরদের এর চেয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ আর কী হতে পারে যে, উপসাগরীয় দেশসমূহের সরকাররা নিজ দেশেই স্বাধীন নয়? এর চেয়েও অধিক কোনো জঘন্য কথা কি হতে পারে যে, জাজিরাতুল আরবের পবিত্র ভূমির সম্মান ও পবিত্রতাকে পদদলিত করা এবং এর সকল উপায়-উপকরণের ওপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী আমেরিকাকে আরও সুযোগ দেওয়া হবে? আমেরিকার নির্লজ্জতা এ পর্যন্ত পৌছে গেছে যে, এখন তারা ওই শাসকদেরকেও গুরুত্ব দেয় না, যারা তাদেরকে এখানে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে স্বয়ং সে শাসকরাই বর্তমানে এখানে আমেরিকার উপস্থিতি পছন্দ করছে না; কিন্তু আমেরিকা থেকে মুক্তির পথ এবং এই লাঞ্ছনা থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনো উপায় তাদের বুঝে আসছে না। মিথ্যা বিশ্লেষণের জাদু এখন মুমূর্ষুপ্রায়। আমেরিকানদের ধোঁকাবাজি এখন সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং সবার সামনে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, 'আরব রাষ্ট্রসমূহ আমেরিকার দখলে চলে গেছে।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।'

উলামায়ে ছু'দের দুঃখজনক ব্যাখ্যা

এই অবস্থায়ও সে দেশগুলোর সরকারি খতিবগণ, যারা অর্থ-সম্পদের পূজারী তারা শাসকদের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক বিতর্ক করেই যাচ্ছে এবং মানুষকে শাসকদের আনুগত্য ওয়াজিব সাব্যস্তকারী হাদীস শুনিয়ে শুনিয়ে ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করছে। অথচ চিন্তাও করছে না, শাসকরা তাদেরকে ফেতনার গভীর গর্তে এবং কুফরের অগ্নিতে নিক্ষেপ করছে। তারপরও তাদের আনুগত্য কীভাবে জরুরি হতে পারে?

কোমরের ছুরি পেট কাটে

এই উলামায়ে ছু'দের সব ভেলকিবাজি ফাঁস হয়ে গেছে। সকল ব্যাখ্যা চোরাবালিতে ডেবে গেছে, যখন স্বয়ং রাজ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সৌদি বাদশাহর ভাই আমির তালাল ইবনে আবদুল আজিজ স্পষ্ট ভাষায় মার্কিন দখলদারিত্বের স্বীকারোক্তি এবং আমেরিকার হাতে জাজিরাতুল আরবের পবিত্রতা পদদলিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। ৭/১১/১৪১৮ হিজরি বিবিসি লন্ডনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমেরিকা ও ব্রিটেনকে যদি আজ বলা হয়, তোমরা জাজিরাতুল আরব থেকে চলে যাও তাহলেও ওরা যাবে না'। তারপরও তারা আরব দেশসমূহের শাসকদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ প্রবাদ বর্ণনা করে থাকে। "তোমার আপনজন বিপদে পতিত; সাহায্য করার মতো কেউ নেই"।[৩০] অর্থাৎ উপসাগরীয় শাসকরা এই অমুসলিম সৈন্যদের সমঝোতার ভিত্তিতে নয়, বরং অপারগতার কারণেই সহ্য করে যাচ্ছেন। তারা মার্কিন শাসকদের সেই প্রচেষ্টারও উল্লেখ করেছেন, যা তারা মার্কিন জনগণকে আরব ভূখণ্ডে মার্কিন সৈন্যদের একাধারে অবস্থানের বৈধতার ব্যাপারে পেশ করে চলেছেন। আমির তালাল ইবনে আবদুল আজিজের সাহসিকতার সাথে মার্কিনীদের হাতে আরব ভূখণ্ডের পদদলনের স্বীকারোক্তি উপসাগরীয় শাসক ও রাজনীতিবিদদের সেই ব্যর্থ এবং হতাশ চেষ্টা থেকে অনেক উত্তম; যার মাধ্যমে তারা এই জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর পর্দা ফেলতে চায় এবং এই লাঞ্ছনাকর অসহায়ত্বের কদর্যতাকে দাফন করতে চায়। রাজনীতিবিদদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট ভূমিকা ওইসব দরবারি মোল্লাদের, যারা অন্যদের দুনিয়া গড়ার জন্যে নিজেদের আখিরাত ধ্বংস করছে। যারা শাসকদের পক্ষ থেকে দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থ ও পদের লোভে তাদের পদলেহী হয়ে গেছে। তারা এমন ফতোয়া রচনা করেছে, যাতে হারামকে হালাল করে দিয়েছে। মুশরিকদের জন্য জাজিরাতুল আরবে তাদের ঘাঁটি করা সহজ করে দিয়েছে। এরা বাতিলের সাহায্যকারী ও হকের বিরোধিতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের ওপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণী পরিপূর্ণরূপে প্রযোজ্য, যা ইমাম বুখারী রহ. হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন "ধ্বংস

৩০. বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির নিজের সামর্থ্য বা আপনজনদের মধ্যে যখন কোন সাহায্যকারী না থাকে তখন অন্য গোত্রের নিকট সাহায্য চাইতে বাধ্য হলে আরবরা এ প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকে।

হয়ে যাবে ধন-সম্পদ ও কারুকার্যখচিত চাদরের গোলাম, তাকে যদি সামান্য দুনিয়া দেওয়া হয় তাহলে সে সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি না দেওয়া হয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।"[৩১]

এমন ফতোয়া দেওয়ার সময় এই উলামারা আল্লাহ তা'আলার ওই আয়াতকে ভুলে গেছে—"তারপর তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এমন বংশধর, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এ নগণ্য (দুনিয়ার) সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, শীঘ্রই আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। বস্তুত যদি তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তাদের নিকট আসে তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গিকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবে না? আর তারা এতে যা আছে, তা পাঠ করেছে এবং আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা কি বোঝো না? আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি (এসব) সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।"[৩২]

সরকারি উলামাদের এই শ্রেণি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প এবং চেনা-পরিচিত। তারা ব্যতীত আরবের সকল উলামায়ে কেরাম হকের আঁচলই আঁকড়ে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। মুসলিম উম্মাহকে সঠিক কথাই বলেন এবং হক বলতে কারও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পরওয়া করেন না। জালেম শাসকদের জুলুমেরও হিসাব করেন না।

অলীক সুধারণায় আর কতকাল?

কোথায় আজ সেই লোকেরা, যারা শুরুতেই আমাদের সাথে এই বিষয়ে মতানৈক্য করেছিলেন যে, জাজিরাতুল আরবে মার্কিন সৈন্যদের দীর্ঘ অবস্থান এই ভূখণ্ডের পবিত্রতার পদদলনের সমতুল্য; কিন্তু তারা মনে করতেন, মার্কিনীদের অবস্থান এখানে সাময়িক, মাত্র অল্প কিছু দিনের জন্য? এখন যখন তাদের ধারণা পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হলো তাহলে তারা এটা স্বীকার করে নতুন প্রজন্মকে এ ঘটনা সম্পর্কে কেন অবহিত করে না যে, আরবের পবিত্র ভূখণ্ড আজ আট বছর যাবৎ অত্যন্ত লাঞ্ছনার শিকার। তাদের উচিত,

৩১. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৮৭
৩২. আ'রাফ : ১৬৯-১৭১

নতুন প্রজন্মের যারা লাঞ্ছনাকর এই অবস্থা চলাকালে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পরাজিত এলাকায় লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের সামনে এই তিক্ত বাস্তবতা প্রকাশ করে দেওয়া।

হে মুসলিম শাসকবর্গ!

কোথায় আজ সেই শাসক এবং আমিরগণ? যারা মানুষের সাথে ফিলিস্তিন স্বাধীন করার অঙ্গীকার করেছে, অতঃপর ফিলিস্তিন দখলকারীদেরকে নিজ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিজের নাক কেটে তাদের সাহায্য করেছে। কোথায় সেই শাসকরা? সামনে এসে নিজের বেঈমানীর নিরসন কেন করে না? নিজে করতে না পারলে তার নেতৃত্বের দায়িত্ব তার উপযুক্ত পাত্রকে কেন সোপর্দ করে না? যে এই জিম্মাদারিকে সামলাতে পারবে এবং উম্মাহর ইজ্জত ও সম্মানের সুরক্ষা করবে।

ওহে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম!

কোথায় আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা? যারা আমাদেরকে বলতেন—জাজিরাতুল আরবের মুসলিমদের ওপর ফরজ, তারা এর প্রতিরক্ষা করা। কিন্তু মুশকিল হলো আমাদের সংখ্যা অনেক কম। কী হলো ওইসব লোকদের, যারা জাজিরাতুল আরবের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে জেগে উঠবে? অথচ অমুসলিমরা এই পবিত্র ভূমি জবরদখলের নবম বছর শুরু হতে চলেছে।[৩৩]

সংখ্যাধিক্যের জবাবে কি তারা আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম পড়েনি? "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেওয়া হবে আর তোমাদেরকে জুলুম করা হবে না?"[৩৪]

---

৩৩. শাইখ রাহিমাহুল্লাহ এই চিঠি যখন লেখেন তখনকার সময় হিসাবে তিনি ৯ বছর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই চিঠি লেখার পর বর্তমান এই অনুবাদের মাঝে পেরিয়ে গেছে আরও দীর্ঘ ২০ বছর।—অনুবাদক

৩৪. আনফাল : ৬০

এমন বাহানা তালাশকারী লোক আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ সম্পর্কে কী পরিমাণ গাফেল?

"আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা অবশ্যই তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হলো, তোমরা বসে পড়া লোকদের (নারী ও শিশু) সাথে বসে থাকো।"[৩৫]

এখানো কি সে সময় আসেনি—এসব হজরতদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর অবতীর্ণ ওহি শুনে বিগলিত হওয়ার এবং এই উম্মাহর মধ্যে 'নাফিরে আম'-এর ঘোষণা করার? শাসকদের থেকে যখন এই সম্ভাবনা নাই, তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে গিয়েছে। আভিজাত্যের চেহারায় দাগ লেগে গেছে এবং পবিত্র হারামাইনের ভূমিতে ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যরা ঘাটি গেড়ে বসে গেছে। অবশেষে মুহাজির ও আনসারদের সন্তানরা কোথায়?

হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, মুসান্না বিন হারেসা, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও কা'কা বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহুমদের উত্তরসূরিরা কোথায়? হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহু-এর নাম নেওয়া লোকদের কী হলো? সামনে কেন অগ্রসর হয় না? তাহলে কে আল্লাহর দীনের সাহায্য করবে? কে মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহকে মুক্ত করবে এবং জাজিরাতুল আরবকে মুশরিকদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করবে?

মুতাকাদ্দিমিন ও মুতাআখখিরিন তথা পূর্বাপর সকল আলেম এ কথার ওপর ইজমা তথা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, 'যখন কাফের আক্রমণ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। এ অবস্থায় প্রয়োজনে পুত্র তার পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীতই যেতে হবে। মুসলিমদের ওপর কঠিন পরিস্থিতি আসলে কিতালের এই ফরিজা অন্যান্য ফরজের বিপরীতে অগ্রগণ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজে আইন। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এই ইজমাকে বর্ণনা করে বলেন, 'দীন ও ইজ্জতের ওপর আক্রমণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র জিহাদ করা হয়, তা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং দুশমন যখন আক্রমণাত্মক হয়ে দীন ও দুনিয়া

---

৩৫. তাওবা : ৪৬

ধ্বংসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের প্রতিরোধ করা ঈমানের পরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ'।[৩৬]

হে বীরের জাতি!

হে বীর যোদ্ধাগণ! দলবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও। এখন কঠোরতার যুগ, তোমরা নিজের মধ্যে কঠোরতা সৃষ্টি করো। তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে, তোমরা নিজেদের কোমর বেঁধে নাও। এ কথা যখন সন্দেহাতীত প্রমাণ হয়ে গেছে—আল্লাহর পবিত্র শহরগুলোর সম্মান পদদলিত হয়ে গেছে এবং শত্রুদের শাসক ও কমান্ডারদের বিজয় সংঘটিত হয়ে গেছে। তাই এখন জরুরি হয়ে পড়েছে, যে সকল মুসলিম দেশ থেকে উলামায়ে কেরাম, ব্যবসায়ী, বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হয়ে যাও এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের পবিত্রতা বিনষ্টকারী ক্রুসেডার সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য মুসলিমদেরকে সংগঠিত কর। জাজিরাতুল আরবের সাহসী মুসলিম যুবকদের এই ইসলামি সৈন্য বাহিনীর প্রতিটি সারির সম্মুখভাগে শামিল হয়ে যাওয়া উচিত। কখনো যেন তারা ওই লোকদের মতো না হয়ে যায়, যাদের অবস্থা আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন : "নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা, যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তবে যে দুর্বল পুরুষ (অসুস্থতা কিংবা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে) এবং নারী ও শিশুরা কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।"[৩৭]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শত্রুর সামনে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে থাকা লোকদের, খ্রিষ্টানদের অধীনে থেকে তাদের সাহায্য-সহায়তা করে জীবনযাপনকারী এবং আল্লাহ তা'আলার পথে যারা হিজরত করেনি তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তর, ধমক এবং কেয়ামতের দিন

৩৬. ইখতিয়ারাতুল আমানিয়া : ৩০৯-৩১০
৩৭. নিসা : ৯৭-৯৯

জাহান্নামের নিকৃষ্ট ঠিকানার শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। আজ অধিকাংশ লোক তা থেকে গাফেল এবং হিজরত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের আনুগত্য করার পরিবর্তে নারীদের মতো ঘরে বসে আছে। অথচ যদি তারা নিজ এলাকায় জিহাদের প্রস্তুতি নিতে না পারে তাহলে তাদের ওপর হিজরত করে এমন কোনো স্বাধীন এলাকায় (যেমন, আফগানিস্তান) চলে যাওয়া ফরজ, যেখানে জিহাদি প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম বিদ্যমান আছে। জিহাদ এবং হিজরত একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন, যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে অভিভাবক ও সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।"[৩৮]

আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি

হারামাইনের পবিত্র শহরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি এটাই চলে আসছে— তিনি এখানে খারাপ নিয়তে আগমনকারী ধোঁকাবাজদেরকে ধ্বংস করে দেন এবং এখানের যে বাসিন্দা কাফিরদের সাথে মিলিত হয় তাদেরকেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। আসহাবে ফিল তথা হস্তীবাহিনীর ঘটনা বোঝানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাদের মহা ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ তা'আলা কেমন আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং তার ক্ষুদ্র এক প্রাণীর মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন! এখনো রয়েছে অভিশপ্ত আবু রিগালের কবর! সে এখানের স্থানীয় বাসিন্দা হয়েও আসহাবে ফিলের পথ প্রদর্শন করেছিল, তার কবরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ আজও উপদেশ ও লাঞ্ছনার ইতিহাস হয়ে আছে।

সুতরাং হে আমার জাতি! বাহির থেকে আগমনকারী সৈন্যরা তো লাঞ্ছিত হবেই; কিন্তু তোমরা এই মুসিবত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও এবং তাদের সঙ্গ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের সাথে জিহাদের প্রস্তুতি নাও। যে বুদ্ধিমত্তাকে ছেড়ে দেয়, সে লাঞ্ছিত হয়। সুতরাং সকলের ভালো করে জেনে রাখা উচিত, যদি আরবরা জিহাদ না করে তাহলে আরও বড় বিপদ থেকে জীবন বাঁচানো

৩৮. নিসা : ৭৫

যাবে না। এমন বিপদ যাতে দীন ও ইজ্জত উভয়টা ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমনটি বর্তমানে তারা তাদের শান-শওকত ও অভিজাত্য-নেতৃত্ব হারাতে বসেছে। এমনিভাবে যদি জিহাদ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে তাহলে আশঙ্কা হয়, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গোলামে পরিণত হবে। আরবদের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, 'সৌভাগ্যবান সে, যে অন্যের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে'। সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিবেশী আমাদের ভাইদেরকে দেখুন, তারা কীভাবে দুনিয়ার জন্য উপদেশ ও কল্পকাহিনি হয়ে গেছে। পশ্চিমা নেকড়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। তাদেরকে জবাই করছে। তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করছে। তারপর তাদেরকে তাদের বাসভূমি থেকে বের করে দিয়েছে। তাদের নিজ শহর ও নিজ ঘরে তাদের জায়গা হয়নি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। যে নেকড়েকে লালন-পালন করে, নেকড়ে তাকেই একদিন ছিঁড়ে-ফেড়ে খায় এবং যে শয়তানের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়।

মার্কিনরা ভীরু ও কাপুরুষ

আরবদের মার্কিন সৈন্যদের ভীরুতা ও কাপুরুষতায় বিশ্বাসী হওয়া উচিত। এরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত সাহস হারানো এবং যুদ্ধের পরীক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে কম দৃঢ়পদ থাকার বাহিনী। মুজাহিদ ভাইদের পবিত্র গুলিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ধারালো অস্ত্রকেও ভোতা করে দিয়েছেন, তাদের ধোঁকা ও চালবাজিকে মূল থেকে উপড়ে দিয়েছেন এবং তাদের সৈন্যদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে দিয়েছেন। ক্রুসেডার বাহিনী পরাজিত হয়ে এমনভাবে পিছু হটেছে, যেমন, ভয়ে পালানো উট—মালিক তাকে ঘাটের দিকে টানছে আর সে নিজের আস্তাবলে ফিরে যাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। ওরা যখন যুদ্ধের সামান্য উত্তাপ দেখেছে তখন ভয়ে পা মাথার ওপর তুলে ভেগেছে। আল খুবার ও রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণের পরে তাদের পিছু হটা এতটাই হাস্যকর ছিল যে, আমরা তা ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারছি না। ওই সময় তারা ভয় ও নৈরাশ্যের কারণে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিল।

তারা তাদের পাহারা বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ এই পাহারাদার ওই লোকদের মধ্য থেকেই ছিল, যাদের নিরাপত্তার দাবি নিয়ে এই মার্কিনীরা এসেছিল।[৩৯]

কতটা লজ্জা ও লাঞ্ছনার কথা—যারা মার্কিনদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এবং বাইরের অবৈধ আগ্রাসনের আশঙ্কা নিরসনের জন্য ডেকে এনেছে, তারাই ভীতু ও বুযদিল মার্কিনদের নিরাপত্তায় পাহাড়া দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল।

বৈরুতের মাটিও মার্কিনদের বীরত্ব অবলোকন করেছে; যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের মূলোৎপাটন করে ছেড়েছেন এবং তাদেরকে উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই জাতি সম্পর্কে কুরআন কারিমের স্পষ্ট ঘোষণা, "তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; তবে সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অবস্থান করে বা দেয়ালের পেছন হতে, তারা নিজেরা নিজেদের প্রবল শক্তিধর মনে করে। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ; অথচ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এ জন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।"[৪০]

এই মার্কিনদের ওপর যখন হামলা হয়েছে তখন তাদের বাস্তবতা ও সামর্থ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। এমন লোক আভিজাত্যের ধারক কিংবা প্রশংসার উপযুক্ত হয়ই বা কী করে, যাদের এমন কোন দর্শন নেই, যার জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে! এমন কোনো ঐতিহ্য নেই, যার সুরক্ষা করতে পারে! আল্লাহ তা'আলা রিয়াদের যুবক আবদুল আজিজ, খালিদ সাঈদ, হুমুদ হাজেরী এবং মুসলেহ শিমরানীকে ভালো রাখুন—যারা মার্কিনীদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বীরত্ব কাকে বলে এবং বীরত্ব কেমন হয়। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত মুসলিমদেরকে বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার দাগ ওঠানোর সকল চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাদেরকে আমাদের সেই ভাগ্যবান পূর্বসূরিদের মর্যাদা নসিব করুন, যারা

৩৯. শায়েখ বলতে চাচ্ছেন মার্কিন সৈন্যরা সৌদি আরবের নিরাপত্তার দাবি নিয়ে এসেছিল; কিন্তু যখন তাদের দুরভিসন্ধি সকলের সামনে উন্মোচিত হওয়ার পর তাদের ওপর আক্রমণ শুরু হলো তখন উল্টো সৌদির সৈন্যরাই তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হয়েছে। –লেখক

৪০. হাশর : ১৪

কুফরের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালিমার বিজয়ের জন্য জাজিরাতুল আরবের ভূমিকে নিজেদের রক্তে রঞ্জিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ওইসব গাদ্দার মুনাফিক শাসকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুন, যারা তাদের ভীরু নেতাদের, মার্কিনীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তাদের নৈকট্য অর্জনের জন্য এই সত্যনিষ্ঠ যুবকদের রক্ত ঝরিয়েছে।

হারামাইনের বন্দি!

আল্লাহ তা'আলা কারাগারের প্রকোষ্ঠে বন্দি উলামা মাশায়েখ—শাইখ উমর আবদুর রহমান, শাইখ সালমান বিন ফাহাদ আওদাহ, শাইখ সফর বিন আবদুর রহমান আল-হাওয়ালী, শাইখ সাঈদ ইবনে যাঈর, শাইখ বাশার আল বাশীর ও তার সাথিদের দৃঢ়পদ রাখুন ও মজবুত মনোবল নসিব করুন এবং তাদেরকে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এই লোকেরা স্পষ্ট ভাষায় কালিমায়ে হক তথা সত্য প্রকাশ করেছেন এবং নিজেদের দাওয়াতি জিম্মাদারী এমন সময়ে আদায় করেছেন, যখন সর্বত্র নেফাক এবং কুফরের রাজত্ব। তাদের ওপর যে পরীক্ষা এসেছে, তাতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও নুসরত তাদের সাথে আছে। আল্লাহ তা'আলাই তাদের জান-মালের হিফাজত করবেন। তিনি এর ওপর ভালোভাবেই সামর্থ্য রাখেন।

মুজাহিদদের সংকল্প

মুজাহিদীনের জামাত আল্লাহ তা'আলার এই বিধান পালন করতেই থাকবে—"আপনি আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করতে থাকুন, আপনি শুধু আপনার নিজ সত্তার জিম্মাদার।"[৪১]

তারা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করতেই থাকবে—"তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন।"[৪২]

হে পরওয়ারদিগার!

আমরা মহা শক্তিধর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন উপসাগরে উপস্থিত কাফির মার্কিন সৈন্যদের এবং ফিলিস্তিনে নিযুক্ত তাদের

৪১. নিসা: ৮৪
৪২. তাওবা: ১৪

মিত্র ইহুদিদের ওপর তাঁর আজাব ও গজব নাজিল করেন। তাদের ওপর নিজ পক্ষ থেকে আসমানি আজাব নাজিল করেন। যা এক এক করে প্রত্যেককে নিজের পাকড়াওয়ে নিয়ে নেবে এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে; কেউই যেন আর বাকি না থাকে। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে জিহাদের রুহ দান করেন। মুসলিম উম্মাহ যেন দুর্বলতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং মালহামা তথা মহাযুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়ে যায়।

আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহকে পুরস্কারস্বরূপ এমন রাজত্ব ও বাদশাহি দান করেন, যেখানে তাকে মান্যকারীরা ইজ্জতের সাথে থাকে এবং তাঁর অবাধ্যতাকারীরা লাঞ্ছিত হয়। যেখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফরিজা চালু থাকে। এমন রাজ্য ও দেশ, যা দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমের দুর্বলদের এবং মজলুমদের সাহায্য করবে এবং জমিনের অন্যায় অহংকারকারীদের থেকে তাদেরকে মুক্তি দেবে। মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা কোনো কঠিন কিছু নয়।

ইতি

উসামা বিন মুহাম্মদ বিন লাদেন

মুসলিম বিশ্বের ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ-এর উদাত্ত আহ্বান

হে সম্মানিত ওলামা-মাশায়েখগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

ওই মহান আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপরদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিষ্টানদের) নির্জন গীর্জা-এবাদতখানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর।"[৪৩] এবং দুরুদ ও সালাম প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি- যিনি মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "আমি আগামীতে বেঁচে থাকলে ইহুদি-নাসারাদেরকে অবশ্যই জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দেবো।"[৪৪]

হে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! এ বিষয়টি নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়, যখন থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন তখন থেকে অদ্যাবধি পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান গোষ্ঠীগুলো মুসলিম উম্মাহর প্রতি কীরূপ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে আসছে। এ শত্রুতা শেষ হবার নয়। কারণ, তা মুসলমানদের প্রতি তাদের হিংসা ও নির্যাতনের মনোভাব থেকেই প্রসূত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায়, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়), যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[৪৫]

---

৪৩. সুরা হজ : ৪০

৪৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৬০৬

৪৫. সুরা [illegible] : [illegible]

এ কথাটি আল্লাহ অন্যত্র আরও জোর দিয়ে বলেছেন, "ইহুদি এবং নাসারারা কখনো আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন। আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহপ্রদত্ত হেদায়েতই একমাত্র সঠিক হেদায়েত। আর আপনি যদি ওহির আসমানি জ্ঞান প্রাপ্ত হবার পর তাদের ইচ্ছা ও মনোবাঞ্ছার অনুসারী হন, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে আপনার জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী হবে না।"[৪৬]

এ বিষয়টি সবার জানা, ইসলাম যখন জাজিরাতুল আরবে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তখন থেকে তারা (ইহুদি-নাসারা) আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধি এবং তাঁর মহান সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করেছে। পরিণতিতে আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই তিক্ত শত্রুতার জের ধরে ঐতিহাসিক ক্রুসেড শুরু করেছিল, যা সিরিয়া ও মিশরকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর পর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর মুজাহিদিনদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও পরাভূত করেছিলেন। অনুরূপ তারা পাশ্চাত্যে ইসলামি সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল স্পেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যাতে মুসলমানদের হাত থেকে উন্দুলুসের পতন হয়। পরবর্তীতে তারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে গ্রাস করেছিল, আবার আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একেকটি দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন। সর্বশেষ, কুয়েত উদ্ধার নাটকের নামে ইহুদি-নাসারা, মুনাফেক আর মুশরিকেরা সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনী গঠন করে সমগ্র জাজিরাতুল আরবকে গ্রাস করার ও ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনাকে দখল করার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধ করেছে। প্রায় মুসলিম দেশ ও বিশেষভাবে দুই পবিত্র হারাম মক্কা-মদীনার দেশে তারা স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করেছে। ইসলামি দেশগুলোর সাগরে বিপুল পরিমাণ নৌ-সেনা ও যুদ্ধজাহাজ উপস্থিত করেছে। পবিত্র খানায়ে কা'বা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে গাদ্দার আমেরিকার লক্ষাধিক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তারা মক্কা-মদীনার পবিত্র মাটিতে খোদাদ্রোহিতা ও যাবতীয় কুফরি অপতৎপরতাসহ সর্বরকম পাপ-পঙ্কিলতা ও নাফরমানী চালিয়ে যাচ্ছে। আজ

---

৪৬. সুরা বাকারা : ১২০

তারা সেই পবিত্র মাটির বুকের ওপর তাদের অপবিত্র পতাকা উত্তোলন করে রেখেছে।

হে বিশ্বের ওলামা সমাজ!

নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, কাফির-মুশরিক ও ইহুদি-নাসারাসহ যে কোনো বেদীনকে আরবের পবিত্র মাটিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও অবস্থান করার অনুমতি দান করা ইসলামি শরিয়তমতে কখনো বৈধ নয়। কারণ, সে অনুমতি আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুশয্যায় অসিয়তের পরিপন্থী। ওই অসিয়তটি বুখারী শরিফে হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণিত আছে, তিনি একদা বেদনার স্বরে বলে উঠলেন, বৃহস্পতিবার, হায়! বৃহস্পতিবারের সে মর্মান্তিক দিনটি! তারপর তিনি মাথা নুইয়ে কতক্ষণ কাঁদলেন। ফলে তার চোখের অশ্রুতে ফরশের পাথর পর্যন্ত ভিজে গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে ইবনে আব্বাস! একটু বলুন তো, মর্মান্তিক বৃহস্পতিবার বলতে আপনার উদ্দেশ্য কী? তিনি উত্তরে বললেন, ঐ দিনটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুরোগ-সংক্রান্ত বেদনা বেড়ে গেলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অসিয়ত করেছিলেন; যার অন্যতম একটি হচ্ছে, **"তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দিয়ো।"**[৪৭]

অথচ আজ সে কাফির-মুশরিকরাই নিজেদের লক্ষাধিক সেনা এবং জল-স্থল-আকাশে সর্বময় সামরিক শক্তি নিয়ে সে পবিত্র আরব উপদ্বীপে বসবাস করছে।

হে মুসলিম উম্মাহর বিবেকগণ!

বলুন, আল্লাহর পবিত্র ঘর ও তাঁর প্রিয় নবীর পবিত্র হারাম, হারামাইন শরিফাইনকে বুকে ধারণকারী আরবের এই পবিত্র মাটির ওপর আজ কী করে নাপাক কাফির-মুশরিকেরা বীরদর্পে বিচরণ করছে? বলুন, আল্লাহর প্রিয় নবীর পবিত্র দেহ মোবারক ধারণকারী এই পবিত্র মাটির ওপর নাপাক-অপবিত্র ইহুদ-নাসারা ও কাফির-মুশরিকরা বিচরণ করার ধৃষ্টতা কীভাবে পেল? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা কখনো মেনে নেবেন না। যেমন মেনে নিতে পারেন না ওইসব মুমিনেরা, যারা আল্লাহ ও রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর দীনের ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। বলুন, কী করে একজন মুসলমান মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম এবং মদীনার পবিত্র

---

৪৭. সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬৩৭

মসজিদে নববী ধিকৃত মার্কিন খ্রিষ্টান গোষ্ঠীর হাতে অবরুদ্ধ থাকাকে বরদাশত করতে পারে?

বলুন! কীভাবে মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো তাদের পদচারণায় কলুষিত হওয়াকে সহ্য করা যায়? বলুন! কী করে সম্ভব সকাল-সন্ধ্যা দুষ্ট-কুলাঙ্গার মার্কিনীদের বদমাশি আর শরাব দ্বারা পবিত্র এ মাটির কলুষিত হওয়াকে সহ্য করা? তাদের সেনাবাহিনী আরবের পবিত্র মাটির ওপর শুকরের মাংস ভক্ষণ করবে, সর্বপ্রকার নিলজ্জর্তা-নগ্নতা ও বেহায়পনা চালিয়ে যাবে আর তাদের সেনা ছাউনীতে গীর্জা স্থাপন করবে এবং খ্রিষ্টীয়, কুফরি আকিদার নিদর্শন ক্রুশ প্রতীককে উঁচু করে রাখবে—এসব আমরা কী করে বরদাশত করতে পারি?

হে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম!

আজ মুসলিম উম্মাহ ভয়াবহ কুফরি আগ্রাসনের শিকার হয়ে তাদের পবিত্র স্থানগুলো পর্যন্ত যেভাবে পদদলিত হচ্ছে, তাতে যদি কোন মুসলমানের অন্তর ব্যথিত না হয়, তাহলে কি তার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকতে পারে?

হে সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম!

আজ উপসাগরীয় অঞ্চলের আরব দেশগুলোর জনসাধারণ এ বর্বর মার্কিনী আগ্রাসন রুখতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং শাসক গোষ্ঠীগুলো মার্কিনীদের পদলেহন করে তাদের প্রতি দুর্ভাগ্যজনক আনুগত্য বরণ করে নিয়েছে। এই দুর্বিষহ অবস্থায় আরব শাসকরা এ লজ্জাষ্কর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে—যে সকল ওলামায়ে কেরামগণ আরব দেশে মার্কিন সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশকে হারাম বলে ফতোয়া দেন এবং আরব দেশ থেকে তাদেরকে বের করার জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান; তাদেরকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ করা হয়।

হে ওলামা সম্প্রদায়!

যদিও দুই পবিত্র হারামকে নাপাক-কুফরি অপশক্তির পদচারণা থেকে মুক্ত করা জাজিরাতুল আরবের সাধারণ মুসলমানদের ওপর ফরজ, তথাপি তার দায়িত্ব পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের ওপরও বর্তায়।

এক্ষেত্রে আমি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত মুমিন জনসাধারণের যে সম্মানজনক অতীত ইতিহাস এবং দীনের আমলচর্চা ও জিহাদি প্রেরণায় যে উৎকর্ষতা তাদের মাঝে লক্ষ করেছি, তারাই এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমি একান্ত আশা ও [illegible]

করি। কারণ, এ উপমহাদেশের মুমিন জনসাধারণ তাদের ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের আগ্রাসন এবং পৌত্তলিক হিন্দুদের যেকোনো প্রকার বর্বরতাকে যুগে-যুগে প্রতিহত করে আসছে। তারা কাশ্মীর, ফিলিপাইন, বার্মা, আফগানিস্তান এবং ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের জন্য সর্বপ্রকার আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বরং এ দেশগুলোর মুক্তি-সংগ্রাম বা ইসলামি জিহাদে তাদের লক্ষ-লক্ষ ভাইকে শহীদ হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করেছে। যেভাবে তারা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী যেকোনো কুফরি মতবাদকে প্রতিহত করেছে এবং ভণ্ড নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সফল লড়াই করেছে। এই মোবারক সংগ্রামের ফলে যাবতীয় ধর্ম বিবর্জিত মতাদর্শ ও কাদিয়ানী মতবাদের কবর রচিত হয়েছে।

হে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ!

মক্কা-মদীনার পবিত্র মাটি থেকে ধিকৃত ইহুদ-নাসারাদেরকে বিতাড়িত করার এ ঈমানী দায়িত্ব আপনাদের ওপর বর্তায়। কারণ, আপনারাই 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া' এবং পবিত্র কোরআনে যে 'উলুল আমরের' আনুগত্যকে ফরজ করা হয়েছে, সর্বাগ্রে আপনারাই হলেন সে সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করো এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার হুকুমদাতাগণের অনুগত হও।[৪৮]

আমি অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলছি, মুসলিম সমাজ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য-মদদ ছাড়া তাদেরকে নিরাশ করেন না। এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সেই মহান আল্লাহর নয় কি, যিনি তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন, "মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"[৪৯] এবং আল্লাহর কুদরতের এটাই চিরন্তন রীতি, তিনি সর্বদা কাফির ও মুনাফিকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "নগরীতে কাফিরদের পরিভ্রমণ যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে।"[৫০]

হে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ!

---

৪৮. সূরা নিসা : ৫৯
৪৯. সূরা রূম : ৪৭
৫০. সূরা আলে ইমরান : ১৯৬

আজ আমার মনে চায়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সফরে বের হয়ে উম্মতের এই কেয়ামতসম সংকট সম্পর্কে আপনাদের সাথে পরামর্শ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, আল্লাহর দুশমনদের কারণে আমি কীভাবে অবরুদ্ধ হয়ে আছি। তাই সাক্ষাতের স্থলে এ গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম আপনাদের খেদমতে পৌঁছাতে চাই যে, আপনাদের যাবতীয় দীনি কর্তব্যসমূহের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের দুই পবিত্র হারামকে ইহুদি-নাসারাদের কবল থেকে মুক্ত করার এই সর্বাত্মক সংগ্রাম ও জিহাদে সহযোগিতা করুন। আল্লাহর দীনের কাজে সহযোগিতা করার মহান দায়িত্ব আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না। উম্মতকে রক্ষা করার যে মহান আমানত আপনাদের ওপর অর্পিত, তা আপনারা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলোকে ইহুদি-নাসারাদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার পবিত্র জিহাদে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা আপনাদের ঈমানী কর্তব্য। যতদিন না আল্লাহর এই পবিত্র স্থানগুলো আল্লাহর দুশমনদের কবল থেকে মুক্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই পবিত্র জিহাদ আমাদেরকে চালিয়ে যেতেই হবে।

হে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামগণ!

আপনাদের ফতোয়া, আপনাদের ওয়াজ ও বক্তৃতা এবং সময়ে সময়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন—যদিও এ মহান খেদমতগুলো আপনারা ছোট বলে মনে করেন, কিন্তু আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে তার যে কত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া, তা হয়তো আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনাদের এসব সংগ্রামী তৎপরতাগুলো আরব ও মুসলিম দেশের মৃত সমতুল্য ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ-উদ্দিপনার এক নতুন জীবন দান করে এবং ঘুমন্ত জনসাধারণকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত মুজাহিদদেরকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলোকে কাফিরদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার এ সংগ্রাম ও জিহাদে আপনাদের ফতোয়া, ওয়াজ-নসিহত ও বিক্ষোভের বলিষ্ঠ কণ্ঠকে নগণ্য মনে করবেন না। সবসময় আপনাদেরকে স্মরণ করি এবং আপনাদের শুকরিয়া আদায় করি। মহান আল্লাহই মানুষের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত এবং একমাত্র তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শনকারী এবং আমাদের শেষ দোয়া হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।

ইতি

আপনাদের ভাই

উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনের অপ্রকাশিত তথ্য

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনের তিনটি বিরল অর্জন

মানবজীবনে তিনটি জিনিসের অর্জনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সৌভাগ্যবশত সে তিনটি বিরল সম্পদই উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনে অর্জিত হয়েছে।

এক. ঈমান। দুই. হিজরত। তিন. জিহাদ।

পবিত্র তিন জায়গার সম্প্রসারণ

ব্যক্তিজীবনে উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজে জড়িত ছিলেন। উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার বাবা ছিলেন সৌদি আরবের সবচেয়ে আধুনিক কন্স্ট্রাকশন ফার্মের মালিক। সেই সুবাদে তাঁর অধিক স্নেহের পাত্র হিসেবে আমার ওপর তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিন পবিত্র মসজিদের উন্নয়নকর্ম তদারকির।

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ জানান, আমার বাবার সে সময়েই প্রাইভেট বিমান ছিল, যখন সৌদি বাদশাহরও প্রাইভেট বিমান ছিল না। প্রায়ই এমন হতো যে, বাবাকে ফজরের নামাজ বাইতুল্লাহ শরিফে আদায় করলে জোহর মসজিদে নববী এবং মাগরিব কিংবা এশার নামাজ মসজিদে আকসা তথা বাইতুল মোকাদ্দাসে আদায় করতে হতো। মসজিদে নববীর বর্তমান আধুনিক সম্প্রসারণের কাজ আমার তদারকিতেই সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য আমি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

তিন শত্রুর সাথে যুদ্ধ

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে প্রধান তিন শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ১. আমেরিকা, ২. ইসরাইল ৩. রাশিয়া

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলহামদুলিল্লাহ এ তিনও শত্রুর বিরুদ্ধেই আল্লাহ আমাকে জিহাদ করার তাওফিক দিয়েছেন। এরা আমাকে প্রকৃতই নিজেদের মৃত্যুদূত বলে জ্ঞান করে।

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর জনক ও জিহাদ

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর পিতা বিশিষ্ট আরব স্থপতি শেখ মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ-এর ধারণা ছিল, হজরত মাহদীর আগমনের হয়তো বেশি দিন বাকি নেই। তাই তিনি হজরত মাহদীর জিহাদি তৎপরতায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ১২ মিলিয়ন রিয়ালের একটি ফান্ড জমা করে রেখেছিলেন। উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্বার ইন্তেকালের পর যখন আফগান জিহাদ শুরু হলো, তখন আমি সকল ভাই-বোনদেরকে ডেকে বললাম, মাহদীর জিহাদ কবে শুরু হবে, তা তো আর আমাদের জানা নেই, কিন্তু আব্বাজান তো জিহাদের উদ্দেশ্যেই এই ফান্ডটি রেখে গেছেন। আফগানিস্তানে ইসলাম ও কুফরের জিহাদ শুরু হয়েছে। আমরা সেখানে আব্বার রেখে যাওয়া ফান্ড খরচ করলে জিহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। সকল ভাই-বোনেরা তাতে সম্মতি দিলেন। তখন আমি পুরো ফান্ডটি আফগানিস্তানের জিহাদে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিলাম।

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর বোন দিলেন ৩ কোটি রিয়াল

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার সব ভাই-বোনেরাই জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত। তবে আমার সবচেয়ে ছোট বোন যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। সে অকুণ্ঠচিত্তে জিহাদের জন্য টাকা খরচ করে। সে একবার একসাথে ৩ কোটি রিয়াল আফগান জিহাদের ফান্ডে দান করেছিল।

আফগান জিহাদে উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ-এর অর্থ ব্যয়

উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবন ও সম্পদ আফগান জিহাদে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। রব্বানি, আহমদ শাহ মাসউদ, সাইয়াফকে প্রতি মাসে কোটি কোটি ডলার সাহায্য করতেন। কিন্তু ওই সব গাদ্দারেরা জিহাদের আদর্শিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আজ যারা জিহাদের আদর্শ বাস্তবায়নে উৎসর্গিত প্রাণ, তারা সেই তালেবান মুজাহিদ ও আমিরুল মুমিনিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তালেবানরা তাদের সহযোদ্ধা মুজাহিদ

উসামা বিন লাদিনের জীবন ও মর্যাদা রক্ষায় তাদের সকল শক্তিকে ব্যয় করতে সদা প্রস্তুত রয়েছে।

জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ সম্পর্কে যরবে মুমিনে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ

আমরা এখানে হারামাইন শরিফাইন রক্ষা প্রসঙ্গে *যরবে মুমিনে* প্রকাশিত ওইসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ সংকলন করেছি, যেগুলো স্বীয় প্রামাণিক পরিসংখ্যান ও গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অধিকাংশ পাঠকের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে। ফলে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের বিরাট এক অংশের মাঝে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মেছে। যেদিকে মুসলিম গবেষক ও মনীষীরা মনোযোগ দিয়ে আসছেন; যা নিঃসন্দেহে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ আরব উপদ্বীপে কাফির সৈন্যদের সশস্ত্র আনাগোনা ও অবৈধভাবে মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের ঘেরাও। এসকল নিবন্ধে হারামাইনের পবিত্র ভূমি সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অধিকৃত স্থানসমূহের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে জিহাদ ও কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে এ বিষয়ে গবেষণা ও জিহাদি তামান্নার ব্যাপারে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে সাথে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সোনালি অতীতকে পুনরুদ্ধারের দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

উপসাগরের বিষয়টি কী?

উপসাগরীয় ব্যাপারটি মূলত কী? ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যরা কী উদ্দেশ্যে এই পবিত্র ভূখণ্ডের চারদিকে ছাউনি গেড়ে বসেছে? কাল পর্যন্ত উসামাকে হিরো জ্ঞানকারী আমেরিকা আজ কেন হঠাৎ করে তার রক্ত পিয়াসী হয়ে গেল? মুসলিম মনীষীরা কেন হারামাইনের ভূমিতে ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যদের উপস্থিতিকে বুঝে-শুনে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র আখ্যা দিচ্ছেন? যে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের জঘন্য দুশমন, সে আমেরিকা কেন মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়? বসনিয়া ও কাশ্মীরে মানবতাবিরোধী ভয়াবহ জুলুম ও নির্যাতনের আগুনকে প্রতিহত করতে যে দেশ বিশ্বশান্তি রক্ষা বাহিনীর সদস্য হয়েও আজ পর্যন্ত কিছুই করেনি, সেই তারাই সৌদি শাসকদের সামান্য আবেদনে সাড়া দিয়ে তাদের বিশাল বাহিনী, ভারী ও আধুনিক সব অস্ত্র-শস্ত্র ও অসংখ্য বিমান-নৌযানসহ

রাতারাতি সেখানে কীভাবে পৌঁছে যায়? প্রচণ্ড গরম এলাকা ও বিরূপ আবহাওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সেখানে কেন ছাউনি গেড়ে আছে? এত বিশাল সামরিক শক্তিসহ পবিত্র হারামাইনের পাশে তাদের উপস্থিতি কোন ভয়ানক আশঙ্কার প্রতিরক্ষা করতে অথবা কোন ভয়াবহ জুলুম বন্ধের জন্যে? এসকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় পবিত্রতা, ভৌগলিক গুরুত্ব, বিশ্বসামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলাফলের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি। নিম্নের লেখাগুলোতে এই বিষয়গুলো সামনে রেখেই বিশ্বইহুদি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিমদের সতর্ক করার চেষ্টা করা হয়েছে। যা মুসলমানদের চিরশত্রু ইহুদিরা তাদের বিরুদ্ধে তৈরি করেছে এবং যার জাল দিন দিন তাদের পাশে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। এখন সময় এসে গেছে—হয়তো তারা সতর্ক হবে; নয়তো চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রস্তুতি নেবে। হয়তো অলসনিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে এসব অশুভ ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন করে তাদেরকে এ ধরা থেকে মিটিয়ে দেবে, নয়তো নিজেদের অনুভূতি-শূন্যতা ও কাপুরুষতার জন্য আল্লাহ তা'আলার গজবের নিশানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। মুসলমানদের উচিত সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করা, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হটিয়ে আত্মমর্যাদাশীল মুসলিমদের সামনে নিয়ে আসবেন, যারা নিজেদের ভোগবিলাসে মত্ত হবে না; বরং আল্লাহ তা'আলার দীন এবং তার পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত এবং প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে মরতে উদগ্রীব থাকবে।

জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের গুরুত্বের কারণ

আরব উপদ্বীপ সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেকগুলো কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেয়ামত পর্যন্তই অক্ষত থাকবে তার এই গুরুত্ব এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এই ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব। এর অনেক কারণ রয়েছে। যথা :

প্রথম কারণ : ধর্মীয় মর্যাদা

ধর্মীয় বিশ্বাস। পৃথিবীর বড় বড় ধর্মসমূহ যথা- ইসলামধর্ম, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ এবং সাবায়িয়াত ইত্যাদি এই ভূমিতেই পূর্ণতা পেয়েছে এবং এখান থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। বড় বড় নবীগণ এই ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছেন। চারও আসমানি কিতাব ও অধিকাংশ আসমানি

সহিফা এখানেই অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় জাতি এই ভূখণ্ডেই বসবাস করেছে, যাদের প্রাচীন অনেক স্মৃতি আজও এখানকার জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এসব কারণে এই ভূখণ্ড মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান—সকলের কাছে পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সকল পবিত্র স্থান তো এখানেই অবস্থিত। অধিকন্তু ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা নিজ ইচ্ছায় যে স্থানসমূহকে পবিত্র মনে করে, সেগুলোও এই আরব ভূখণ্ডেই বিদ্যমান। ইহুদিরা শুরু থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছে, যেকোনোভাবে এখানের বিশেষ কিছু অঞ্চল দখল করে ক্রুসেডীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। ইসরাঈলের পতাকায় দুটো নীল পটেট দেখা যায়। এর দ্বারা দুটো সাগর উদ্দেশ্য—দজলা ও নীল। ইহুদিরা এই দুই সাগরকে তাদের ইসরাঈল রাজত্বের সীমান্ত মনে করে এবং উভয়ের মধ্যাংশে খাঁটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বহু বছর যাবত চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরোধী এই বিতাড়িত জাতির এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বহু বছর যাবত কোনো সফলতা ভাগ্যে জুটছে না; কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের কৃতকর্মের শাস্তি, ভীরুতা ও জিহাদি মনোভাব পরিত্যাগের দুর্ভাগ্যের কারণে অবশেষে এই নোংরা জাতি ফিলিস্তিনে তাদের নাপাক ঘাঁটি গাড়তে সক্ষম হয়েছে।

উপসাগরে পশ্চিমা সৈন্যদের আক্রমণ কেনো?

সীমিত ভূখণ্ডের মধ্যে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ছিল একটি বিশ্ব ক্রুসেডীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। এখন সামনের পদক্ষেপ হলো গ্রান্ড ইসরাইল তথা বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠা। যার জন্য উপসাগরে পশ্চিমা সৈন্যদের আক্রমণের ফলাফলস্বরূপ সিদ্ধান্তমূলক ও সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের যে সৈন্যরা সৌদি ও তার আশেপাশের দেশগুলোতে বিভিন্ন তালবাহানা করে অবস্থান করছে, তাদের পৃষ্ঠপোষক সর্বদা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাই হয়ে থাকে। তাদের সৈন্যদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান ও নাস্তিক। তাদের নির্লজ্জতার আলামত হলো, তাদের সেনা ক্যাম্প এবং বিশ্রামকক্ষে স্থানীয় উচ্চপদস্থ কোনো অফিসারও প্রবেশ করতে পারে না। বিশ্ব মিডিয়ায় সংবাদ এসেছে যে, আত্মমর্যাদাশীল এক সৌদি অফিসারকে মার্কিনীরা সৌদি সরকারকে বলে শুধু এ জন্য চাকরিচ্যুত করে দিয়েছে যে, তাকে এক সেনা ক্যাম্পে প্রবেশ করতে বাধা দিলে সেখানে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মীর সাথে বিতর্কে জড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই সেনাক্যাম্পগুলো সরাসরি মার্কিন কমান্ডেই চলে। নিজেদের চলাফেরায়

সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কারও নিকট কোন প্রকার জবাবদিহিতা নেই। চৌকিদারির জন্য ডেকে আনা সৈন্যদের কি এই দৃষ্টিভঙ্গি হয়? তাদের দৈনিক রুটিন এবং অস্ত্রসম্ভার, বিশাল নৌবহর ও এয়ারফোর্স দেখে সুস্পষ্টই বোঝা যায়, তাদের ওখানের উপস্থিতি শুধুই সাদ্দামের মোকাবিলার জন্য নয়; বরং চূড়ান্ত কোনো গভীর ষড়যন্ত্রের জন্যই হয়েছে। যদি ইরাকের পক্ষ থেকে আসা কল্পিত আক্রমণ প্রতিহত করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে মার্কিন সৈন্যদেরকে ইরাকের সীমান্তে জড়ো হওয়া উচিত ছিল। ইরাক সীমান্ত থেকে হাজার মাইল দূরে সৌদির হৃদপিণ্ডে, পবিত্র কা'বা থেকে মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধানে জেদ্দা ও তায়েফে তাদের উপস্থিতির অর্থ কী? যদি মেনে নেওয়া হয়, সৌদির পবিত্র স্থানসমূহে সাদ্দামের আক্রমণের আশঙ্কা আছে তাহলে ইরাক থেকে অজস্র মাইল দূরে বাহরাইন, ওমান এবং মিশরে কিসের ভয়? কাতার এবং মাসকাটে মার্কিন সেনা ছাউনি কেন বানানো হয়েছে? এক আক্রমণের মোকাবিলার জন্য কি তার চেয়ে আরও বড় আক্রমণকে নিজের ঘরে এনে অবতরণ করানো হলো না? নির্লজ্জ ও নোংরা ইহুদি গোষ্ঠী ও খ্রিষ্টানরা কি সাদ্দামের চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর নয়? সৌদি আরব যদি কুফা ও বাগদাদের দরজা গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য খোলা রাখে তাহলে কি বাইতুল্লাহর হজ ও নবীজীর রওজা জিয়ারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে? মূলত ভয় কিন্তু সৌদি আরবের না, ভয় সৌদি শাসকগোষ্ঠী ও তার সরকারের এবং এই ভয়ও ধোঁকাবাজ ইহুদিদেরই তৈরি—সাদ্দাম কিছু দিনের মধ্যেই সৌদির ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এই কল্পকাহিনি বানিয়ে সৌদির শাসকদেরকে না কোনো কিছু ভাবতে সুযোগ দিয়েছে, না কোনো মুসলিম দেশের সাথে পরামর্শ করা ও সাহায্য প্রার্থনার অবকাশ রেখেছে। তাদেরকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগও না দিয়ে রাতারাতি স্বীয় সৈন্য ও আধুনিক সব অস্ত্রসম্ভার নিয়ে এসে ছাউনি গেড়ে ফেলেছে এবং তারপর থেকে ধোঁকাবাজি ও নির্লজ্জতার শেষ সীমানা—নিজেদের নোংরা উদ্দেশ্য পূরণ করতে আসা সৈন্যরা নিজেদের সকল ব্যয় মুসলিমদের কোষাগার থেকে নিচ্ছে। আকাশ কি এর চেয়ে অধিক দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক কোনো দৃশ্য কখনো দেখেছে?

কবির ভাষায়:

"মুসলিমদের সরলতা দেখো,
অন্যদের নির্লজ্জতাও দেখো।"

আমেরিকার ইহুদিদের খায়বারে আনন্দ উদযাপন

আমেরিকার ইহুদিদের খায়বারে আনন্দ উৎসবের সংবাদ গোপন থাকেনি। ইহুদি সৈন্যরা সৌদিতে অবতরণ করে খায়বারে একত্রিত হয়ে আনন্দ-উৎসব পালন করেছে। এই সময়ের জন্য বিশেষভাবে তাদের বড় বড় আমন্ত্রিত পাদ্রীরা বাণী দিয়েছেন। সেখানে শুকরের কাবাবের সাথে মদের পেগ প্রবাহিত করা হয়েছে। সারা পৃথিবীর ইহুদিরা উৎসব পালন করেছে— আমরা আমাদের হাজার বছরের পুরোনো অপমানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম।

এটা কি ভালোবাসা ও আনুগত্য নাকি বোকামি ও কাপুরুষতা?

হে খায়বার বিজেতা জীবনোৎসর্গকারী মুসলমানগণ! তোমাদের আত্মমর্যাদা কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে? খায়বারের কেল্লাকে পায়ের নিচে পদদলনকারী সাহাবায়ে কেরামের আত্মার ওপর এমন সময় কেন অতিবাহিত হবে? তোমাদের ঘুণেধরা অন্তরে কি এর অনুভূতি আছে? তোমরা কি সেদিনের জন্য নামাজ পড়ো এবং রোজা রাখো, যেদিন যেসকল অঞ্চল তোমাদের পূর্বসূরিরা তাদের পবিত্র জীবন কুরবানি করে বিজয় করে রেখে গিয়েছে সেখানে নোংরা ইহুদিদের কদম পৌঁছে যাবে আর তোমরা ঘরে বসে তামাশা দেখবে? ওঠো এবং গ্লোবাল জিহাদের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হয়ে বিশ্ব কুফরের মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্যথায় এই নামাজ-রোজা ও তাসবিহ-তাহলিল তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না। এই ইবাদত উল্টো তোমাদের চেহারায় নিক্ষেপ করা হবে। যেই পবিত্র কা'বার দিকে ফিরে নামাজ পড়ছ, সেই কা'বাই যদি বিপদে আক্রান্ত থাকে তাহলে তোমাদের এই সেজদার আল্লাহর নিকট কী মূল্য আছে বলো? যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরুদ পাঠাও, কাফেররা সেই নবীর পবিত্র রওজা থেকে মাত্র কয়েক মাইলের দূরত্বে পৌঁছে গেছে, অথচ তোমরা নিজেদের বানানো সালাত ও সালামে ব্যস্ত রয়েছ। এটা কি ভালোবাসা এবং আনুগত্য নাকি বোকামি এবং কাপুরুষতা?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ ওসিয়ত

তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ ওসিয়ত করেছিলেন, "তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।"[৫১]

এ আদেশ তো ওই কাফিরদের জন্য ছিল, যারা বংশীয়ভাবে আরব ছিল। এখানের মূল বাসিন্দা ছিল। বংশানুক্রমে এখানে বসবাস করে আসছিল। যখন ইসলাম ব্যতীত তাদের উপস্থিতিই সহ্য করা হয়নি, তাহলে এমনটা কীভাবে হতে পারে যে, আমেরিকা ও ব্রিটেনের কুফরি ও শিরকি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অপবিত্র ও নোংরা এবং নিকৃষ্ট মুশরিকদের আমন্ত্রণ করে এখানে আনা হবে! যেখানে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের দূর-দূরান্তের গুরুত্বহীন কোনো এলাকা ও অঞ্চলেও তাদের থাকার অনুমতি নেই, সেখানে পবিত্র হারামাইনের একদম সন্নিকটে তাদেরকে কীভাবে স্বাধীন সেনা ছাউনির অনুমতি দেওয়া হয়? রাখালের বেশে কর দিয়ে যদি থাকতে না পারে তাহলে লম্পটের মতো মুসলমানদের খরচে বুক ফুলিয়ে চলবে, তা-ও কি সহ্য করা যায়?

মুসলিমদের মধ্যে কি পুরুষের জন্ম হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে?

এ কথা কি কোনো বিবেকবান ব্যক্তি সমর্থন করবেন, আল্লাহর দুশমন তার ঘরের হেফাজতের জন্য আসবে? কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কি এ কথা মানতে পারে- যেই দুশ্চরিত্রের দলেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহিদ করার সমূহ ষড়যন্ত্র করেছে, অবশেষে তা না পেরে ধোঁকা দিয়ে খাবারের সাথে বিষ প্রয়োগ করেছে, সেই দুঃচরিত্র লোকেরা কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরে নিজেদের ভুল থেকে তাওবাকারী হয়ে গেছে, তাঁর পবিত্র রওজার সুরক্ষার জন্য দূর-দূরান্ত হতে সফর করে এত বিপদ ভোগ করছে? সারা পৃথিবীর মুসলিমদের মাঝে কি এমন কেউ নেই, যিনি নিজের দীনের পবিত্র স্থানসমূহের সুরক্ষা করতে পারে? মুসলিমদের মধ্যে কি পুরুষ এবং মুজাহিদ জন্ম হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে? মুসলিম নারীরা কি পুরুষ সন্তান জন্ম দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে যে, এখন তারা তাদের পবিত্র স্থানসমূহ রক্ষার জন্য তাদের চির শত্রুদের থেকে মহিলা সৈন্যের জন্য আবেদনের সুযোগ এসে গেছে?

---

৫১. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

ইহুদি-খ্রিষ্টান মুসলমানদের চিরশত্রু

হে মুসলমানেরা! তোমাদের সত্য কিতাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, "এরা তোমাদের নিকৃষ্টতম চিরশত্রু। এদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। এরা কখনোই তোমাদের কল্যাণকামী হতে পারে না।" তা সত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে বন্ধুর চেয়েও আপন করে নিজেদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী বানানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছ? তোমরা কি মনে করো যে, তাদের স্বভাব ও চরিত্র পরিবর্তন হয়ে গেছে? মনে রেখো, কোনো জিনিসের প্রকৃতি কখনো পরিবর্তন হয় না। সাপ দংশন করা, বিচ্ছু ছোবলমারা কখনো ছাড়তে পারে না। তাই এখন তাদের বিষের থলি আর ছোবলমারার নখ বের করে দিতে হবে। এমনিভাবে এই ইহুদি ও খ্রিষ্টানেরা মুসলমানদের শত্রুতা ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বে না, যতক্ষণ তাদের গর্দানে জিজিয়ার ফাঁস না লাগানো হবে। আর জিজিয়া একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই আদায় করা সম্ভব। যে জাতি তাদের দীন ও ধর্মের নিদর্শনাবলির সংরক্ষণের দায়িত্ব অমুসলিমদেরকে মাসিক বেতনের বিনিময়ে সঁপে দেয়, তারা তাদের সাথে জিহাদ কীভাবে করবে? জিজিয়া কীভাবে আদায় করবে?

একান্ত ভাবনা

মেনে নিলাম, সৌদি আরবের কাছে ইরাকি হামলার সময় সৈন্য মওজুদ ছিল না; কিন্তু সাদ্দাম যদি এক বছরে ১০ লাখ যুবককে অন্যায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করতে পারে তাহলে সৌদি আরব কি আট বছরে নিজের বৈধ প্রতিরক্ষার জন্য প্রশিক্ষিত কোন সৈন্যবাহিনী তৈরি করতে পারে না? যে আরব মুজাহিদরা রাশিয়াকে নাকানিচুবানি খাইয়েছে, আফগান কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে স্বীয় বীরত্ব এবং সাহসিকতার লৌহ প্রাচীর তৈরি করেছে, তারা কি সাদ্দামের বাহিনীকে নাকে রশি লাগাতে পারবে না? সৌদি আরব তাদের সেবা নেওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাদেরকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কেন বন্দি করে? রুশীয় কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের মুজাহিদ এবং হিরো উপাধি দানকারী, মার্কিন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয় কেন? মার্কিনরা কি রুশদের চেয়ে কম নাপাক কাফের? এটা কেমন দ্বিমুখী ভাবনা যে, রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো ফরজ; কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে টু-শব্দ করাও হারাম? আফগানিস্তান কি হারামাইন শরিফাইন থেকেও অধিক পবিত্র ছিল যে, সেখানে গমনকারী মুজাহিদদের রঙিন ছবি সৌদির পত্রিকায় ছাপা হয়, তাদেরকে বিমান ভাড়ায়

৬০% ছাড় দেওয়া হয়; কিন্তু হারামাইন শরিফাইনের সংরক্ষণের জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিদেরকে জেল-জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়? তাদের জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়?

হারামাইন সংরক্ষণের দায়িত্ব মুসলিম দেশের সৈন্যদেরকে কেন দেওয়া হয় না?

মেনে নিলাম, আরব মুজাহিদদের প্রতি রাজতন্ত্র ও লাগামহীন বাদশাহদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র, যাদের সৈন্যরা অত্যন্ত পরীক্ষিত সামরিক শক্তির অধিকারী—যেমন, পাকিস্তান—তাদের মধ্যে কি এতটুকু ঈমানী চেতনা নেই যে, তারা নিজ দেশের সুরক্ষার জন্য তো জীবনবাজি রাখতে পারে, অথচ আল্লাহর ঘরের দেখাশোনা করতে অপারগ হবে? পৃথিবীতে এমনও মুসলিম দেশ রয়েছে, যে দেশের সৈন্যদের অতীত ঐতিহাসিক বর্ণনামতে গোটা পৃথিবীর জন্য স্মরণীয়। পৃথিবী বার বার তাদের থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে বিশ্বের প্রথম সারির সামরিক অভিজ্ঞতার পরিচয় অবলোকন করেছে। মুসলমানদের এমন সব জামাআতকে হারামাইন সুরক্ষার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে নোংরা এবং দুর্গন্ধময় কাফিরদেরকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা—যাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাদেরও বিরক্তি আসে—কেমন ইনসাফ? কী কারণে অমুসলিম সৈন্যদেরকে অত্যাধিক মাসিক যুদ্ধ ব্যয় ছাড়াও শুকর, মদ এবং নারী সরবরাহ করেও রাখা হচ্ছে এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের—যারা শুধুমাত্র প্রয়োজনমাফিক বেতনে, বরং নিজেদের সৌভাগ্য মনে করে বিনা বেতনেও ফি সাবিলিল্লাহ এই দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত—তাদের কেন এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না? মুসলিমদের সম্পদ লুট করে শত্রু নিজের কোষাগার পূর্ণ করছে আর নিজের দীনী ভাই সেই লুটকৃত সম্পদ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। বাৎসরিক ৫০ বিলিয়ন ডলার মার্কিন সৈন্যদের মাসিক মদের খরচ উসুল করে। যদি এর দশভাগের এক ভাগও সৌদি আরব পাকিস্তানকে আদায় করে তাহলে তা শুধু যে পাকিস্তানের অধিকাংশ প্রতিরক্ষা খরচ নির্বাহ হতো, তা-ই নয়; বরং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরে নজিরবিহিন ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হতো।

সাদ্দামের ভয় কি বাস্তব না কাল্পনিক

বাস্তবতা হলো, পশ্চিমা অমুসলিম সৈন্যরা না হারামাইনের সুরক্ষার জন্য এসেছে, না ওরা সাদ্দামের ভয় দূর হওয়ার পর ফিরে যাবে। যদি বাস্তবেই

সাদ্দামের কোন ভয় হতো তাহলে যে আমেরিকা বাদশাহ ফয়সালকে শহিদ করতে পারে, জেনারেল জিয়াউল হক ও অন্যান্য সামরিক নেতাদের বিমান গুঁড়িয়ে দিতে পারে, শাইখ ড. আবদুল্লাহ আয্‌যাম রাহিমাহুল্লাহ-এর গাড়ীতে এবং রাস্তায় বোমা ফিট করতে পারে, ইউসুফ রামুজী ও আমেল কানসীকে গ্রেপ্তারের জন্য মার্কিন কমান্ডোরা কুকুরের মতো সারা পৃথিবীতে ঘ্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে, মহান আরব মুজাহিদ শাইখ উসামা বিন লাদেনকে গ্রেপ্তারের জন্য সি.আই. বিশেষ ব্রাঞ্চ গঠন করতে পারে, সে আমেরিকার জন্য সাদ্দামকে ধ্বংস করাও কোনো কঠিন কাজ নয়। কী কারণ থাকতে পারে— যে আমেরিকা সারা পৃথিবীব্যাপী তার বিরোধীদেরকে ক্রয় অথবা ধ্বংস করতে ওঁৎ পেতে থাকে, সেই আমেরিকা এক সাদ্দাম-সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারছে না? তাদের গোয়েন্দা সংস্থা, কমান্ডো বাহিনী এতটাই অকর্মণ্য ও অসহায় যে, এমন এক ব্যক্তির কিচ্ছা খতম করতে পারে না, যার কারণে তাদের সৈন্যদের এত বড় বাহিনী নিজ আবাসস্থল থেকে দূরে উত্তপ্ত পরিবেশে ডিউটি করতে হচ্ছে? আবার এমন তো নয় যে, 'সাদ্দামের কল্পিত দানব সত্তা' স্বয়ং আমেরিকারই বানানো কল্পকাহিনী? আমেরিকার যদি কখনো অতিরিক্ত সৈন্য আহ্বান, অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করা, কিংবা সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় তখন তারাই রোবটে চাবি ঘুরায়। তাদের হুমকি-ধমকি শুনে এবং রক্তচক্ষু ও রক্তপিয়াসী দাঁত দেখে সৌদির তাবেদার শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিটি দাবি মানতে বাধ্য হয়, যা পেন্টাগন থেকে জারি করা নির্দেশনা অনুযায়ী বিন্যাস দেওয়া হয়। যখন এই দাবি পূরণ হয়ে যায় তখন আমেরিকা এই সাদ্দামের গল্পকে পরবর্তী কোনো ভূখণ্ডের গোপন স্থানের বোতলে পুরে সামনের কোনো বিপদে কাজে আসবে বলে সংরক্ষণ করে রাখে। আমেরিকাকে পরিচ্ছন্ন ইচ্ছার মনে করা ব্যক্তিদের এই সংবাদের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা উচিত—যা অতীতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যখন তার বীর সৈন্যদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সৌদি আরব ভ্রমণে গেলেন তখন ওআইসির বিশেষ সংবাদানুযায়ী সৌদি আরবের বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের পরিবর্তে সোজা 'হাফরুল বাতিন'-এ আমেরিকান সেনা ছাউনিতে গিয়ে উঠেছিলেন এবং রিয়াদের গভর্নরের আতিথেয়তা গ্রহণের পরিবর্তে নিজ অবস্থানস্থলে সাক্ষাতের সময় দিয়েছিলেন। এটা হুবহু বাহাদুর শাহ জাফার ও ইংরেজ ভাইসরয়দের গল্প নয়তো? যা স্থান ও নামের সামান্য পরিবর্তন করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে?

ঘরের বেদীর ব্যাখ্যা

যদি মার্কিন সৈন্যদের আগমনের পর ফিরে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা থাকত তাহলে বাদশাহ ফাহাদের ভাই তালাল ইবনে আব্দুল আজিজ ১৪১৮ হিজরি জিলকদ মাসে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলতেন না যে, মার্কিন সৈন্যরা আমাদের বলার দ্বারা ফেরত যাবে না। একজন দায়িত্বশীল সৌদি আমিরের এই বক্তব্য পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের দৃষ্টি খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। তাদের বুঝে নেওয়া উচিত, যে আমেরিকার বিরুদ্ধে তারা মুর্দাবাদের স্লোগান দেয়, যে আমেরিকাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, সেই আমেরিকা তার নোংরা ও ঘৃণিত চরিত্রের চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শন করে তোমাদের পবিত্র ভূমিতে অনুপ্রবেশ করেছে। যে শত্রুর সাথে মুখোমুখী হওয়ার ইচ্ছা অন্তরে পুষতে সে শত্রু নিজেই তোমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

কেউ কি কাউকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন?

এখন পৃথিবী দেখতে চায়, মুসলমান তাদের সম্মানিত পূর্বসূরিদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে এই কাফিরদের উদ্ধত শির ও দাম্ভিকতার আস্তানাকে পায়ের নিচে পিষে টুকরো টুকরো করে ফেলবে নাকি প্রথা অনুযায়ী নিজেদের ভোগ-বিলাস ও কু-কর্মে লিপ্ত থেকে ভয়াবহ এবং শিক্ষণীয় পরিণামের শিকার হবে।

কবির ভাষায় :

> "অগ্নি আছে। ইবরাহিমের সন্তানেরাও
> আছে। নমরুদও আছে।
> তবে কি কেউ কাউকে পরীক্ষা করতে
> চাচ্ছেন?"

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রদত্ত চিত্র নং ৪, ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় কারণ : ভৌগোলিক অবস্থান

জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের গুরুত্বের দ্বিতীয় কারণ তার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। এটা তার অবস্থানগত দিক থেকেই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের হৃদপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল সামুদ্রিক পথ এর

আশপাশে অবস্থিত। এর ওপর যারা ক্ষমতাশীল হবে, তাদেরকে সারা পৃথিবীর সামুদ্রিক পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ পথের ওপর ক্ষমতাশীল মনে করা হয়। কারণ, এর একদিকে আরব উপসাগর অথবা পারস্য উপসাগর, যার মধ্যে গোটা পৃথিবীর পেট্রোলের ৬২ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশ ভাণ্ডার বিদ্যমান—যা বর্তমান পৃথিবীর চলমান উন্নতি, পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য প্রাণস্বরূপ। আরব উপসাগর থেকে একটু সামনে পুরো উপদ্বীপসদৃশ আরব সংলগ্ন আরব মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের পূর্বে ওমান উপসাগর এবং পশ্চিমে ইডেন উপসাগর অবস্থিত। এই পুরো এলাকাটি পূর্ব ও পশ্চিমের যাতায়াত ও বিশ্ববাণিজ্য এবং সর্বপ্রকার পরিবহনের জন্য বিশ্ব রাজপথ। উপদ্বীপসদৃশ আরবের অপরদিকে লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর। যা এশিয়া মহাদেশ ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে পৃথকীকরণ সীমানা এবং এশিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ এই মহা সঙ্গমস্থল ও জলীয় ভূখণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত। এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সমুদ্রপথে যাতায়াত যা অতিক্রম ব্যতীত হতে পারে না।

লোহিত সাগর ব্যবহার করা ছাড়া যদি কেউ সমুদ্রপথে এশিয়া থেকে ইউরোপ-আমেরিকা যেতে চায় তাহলে তাকে ভারত মহাসাগরের ইডেন উপসাগরে এসে সোমালিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া এবং মুজাম্বিকের উপকূল ঘেঁষে পৃথিবীর শেষ স্থলাংশ এবং আফ্রিকা মহাদেশের একেবারে দক্ষিণ উপকূল কেপটাউনের উপর দিয়ে ঘুরে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত হাজারো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। এতে অজস্র ব্যয় ছাড়াও এত বিপুল পরিমাণ সময় নষ্ট হবে যে, তার ব্যবসায় লাভ তো নয়ই, বরং উল্টো তা লাটে উঠবে। বিপরীতে যদি লোহিত সাগর ব্যবহার করা হয় তাহলে ইডেন উপসাগরের পর বাবুল মানদাব এবং জিবুতির কূল ঘেঁষে লোহিতসাগরে আসার পর হানিশ এবং দেহলাকের দীপাঞ্চল অতিক্রম করে জেদ্দা এবং ইয়াম্বু সমুদ্রবন্দরের পাশ দিয়ে সুইজখালের মাধ্যমে অতি সহজেই ভূমধ্যসাগর কিংবা রোমসাগরে প্রবেশ করতে পারবে। ইউরোপীয় উপকূলগুলো ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন। এ সাগরের একদিকে আফ্রিকা মহাদেশের মিশর, লিবিয়া, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো অবস্থিত। অপরদিকে তুরস্ক, গ্রিস, ইটালি, আলবেনিয়া, ফ্রান্স ও স্পেন। এসকল দেশ রোমসাগরের ইউরোপীয় প্রান্তে অবস্থিত। স্পেনে পৌঁছে সাগর শেষ হয়ে যায়। এই [illegible] একটি সামুদ্রিক রেখা রয়েছে। যার নাম জিব্রালটার প্রণালী ও [illegible] তারেকের [illegible]। এটাই ইসলামি ইতিহাসের সেই

গৌরবোজ্জ্বল স্থান, যেখানে স্পেন বিজেতা তারিক বিন যিয়াদ মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিয়ে অবতরণের পর স্বীয় নৌযানগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সামুদ্রিক সরু পথটি অতিক্রম করলেই আটলান্টিক মহাসাগর শুরু হয়। এখান থেকে সামান্য ডানদিকে গেলেই ইংল্যান্ড (গ্রেট ব্রিটেন)। আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ। আর পশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশ। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে খুব সহজেই আমেরিকা এবং কানাডা পৌঁছা যায়। এটাই উপসাগর ও আরব উপদ্বীপের সম্পদ লুট করে ইউরোপ আমেরিকা পৌঁছানোর অতি সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত নিরাপদ রাস্তা। যখন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়ার জার শাসন) ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ পদার্থে ভরপুর মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীন হয়ে যায় এবং গোটা বিশ্ব তাদের সাথে বাণিজ্যিক সখ্য গড়তে পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, তখন থেকেই এই সামুদ্রিক পথের গুরুত্ব ও মান অনেক বেড়ে যায়।

বিশ্ব কুফরি শক্তির ষড়যন্ত্রসমূহ ও মুসলমানদের নির্লিপ্ততা

সমুদ্রপথটির এমন গুরুত্বের ফলে এই ভূখণ্ড বর্তমানে বিশ্ব কুফরি শক্তির সর্বপ্রকার লোভ-লালসা ও দেশ দখলের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় লোভী পশ্চিমা গোষ্ঠী এ জন্যই এখানে কোনো না কোনোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার এবং খুঁটি গাড়ার চেষ্টায় রত আছে। হীম শীতল অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও লাল চামড়া ও সাদা বর্ণের জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে গরম অঞ্চল ও ঝলসানো এই আবহাওয়ায় এখানের বাসিন্দাদের কল্যাণ ও উপকার এবং সংরক্ষণ ও সাহায্যের জন্য নয়; বরং নিজেদের জীবিকা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যই এসেছে। বিগত শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর নতুন নতুন আবিষ্কার ও দ্রুত উন্নয়নশীল ব্যবসা-বানিজ্যের এই যুগে উন্নতি সাধন করা তাদের জন্যই সম্ভব, যারা লবণাক্ত পানির (সামুদ্রিক পথের) ওপর কর্তৃত্বশীল। সকল অর্থনীতিবিদগণ একমত যে, আধুনিক অর্থনীতির এ যুগে তারাই অন্যকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে যারা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে পরিবহন অর্থাৎ সামুদ্রিক পথে আমদানি ও রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার এ যুগে জয়ী হওয়া তো দূরে থাক; নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও কঠিন। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, তারা পৃথিবীর এই শাহরগের (প্রাণ শক্তির) মালিক হওয়া সত্ত্বেও এর ওপর স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে

ব্যর্থ এবং একে বিশ্ব মুসলিমের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত। এতে অন্যদের ধোঁকাবাজি ও চালবাজির চেয়ে নিজেদের দীন থেকে দূরে সরা, দুনিয়ার ভালোবাসা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি আলস্যভাব ও বেপরোয়া মনোভাব, আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়াই অধিক দায়ী।

আর ঋণ গ্রহণ নয়, জিজিয়া আদায়; সাহায্য-প্রত্যাশা নয়, গনিমত অর্জন

আসুন দেখি, বিশ্ব দখলদার ও লুটেরা আমেরিকা এবং তার পদলেহী ও উচ্ছিষ্টভোগী অন্যান্য কাফির পশ্চিমা গোষ্ঠী কীভাবে এই সামুদ্রিক পথসমূহ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ধীরে-ধীরে দখলে নিয়েছে? কীভাবে তারা মুসলিমদেরকে বিশাল আমদানি ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করে তাদের সম্পদ লুটছে? এবং কী চরম নির্লজ্জতা প্রদর্শন করে তারা এই লুটেরা সম্পদ থেকে সামান্য অর্থ মুসলিম দেশগুলোকে কঠিন শর্তে ঋণের নামে সাহায্য দিচ্ছে এবং তার প্রতিদানে তাদের দীন ও ঈমানের সওদা করার সাথে সাথে দুনিয়াবী দিক থেকেও নিজেদের মুখাপেক্ষী ও অভাবগ্রস্ত বানিয়ে রাখছে। আসুন! ইহুদি বেনিয়াদের এই চালবাজি ও ভেলকিবাজি বুঝুন। তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হোন। তাদের ছড়ানো মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সতর্ক হোন। এই চেতনা বুকে ধারণ করুন যে, ইন শা' আল্লাহ একদিন আমরা এই সুদখোরদের থেকে সমুদয় হক পাই-পাই করে উসুল করবো। এই লুটেরাদের ফুলা-ফাঁপা পেটকে ছিঁড়ে তাদের থেকে আমাদের দখলকৃত সম্পদ ফেরত আনব, যা তারা আমাদের অলসতার সুযোগ নিয়ে গিলে নিয়েছে। এই প্রত্যয়ের সাথে এটাও জেনে রাখুন, ভবিষ্যতে আমরা তাদের থেকে ঋণ চাইব না; জিজিয়া উসুল করব। তাদের সামনে ভিক্ষার ঝুলি বিছিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করব না; তাদের মাথার ওপর ঝলকানো তরবারি উঁচিয়ে গনিমত উসুল করব, ইন শা' আল্লাহ।

হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদ জরুরি

কিন্তু হে মুসলমান, এই সবকিছু কেবল জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব; তোমাদের বানানো উন্নতির ফর্মুলায় নয়। যতক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের রক্ত প্রবাহিত না হবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনো পদক্ষেপই সফল হবে না। মনে রেখো, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহ শুধু কনফারেন্স ও সেমিনারের আয়োজনের দ্বারা অবতীর্ণ হয় না; দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার দ্বারা অবতীর্ণ হয়। নিজেদের হারানো ঐতিহ্য অর্জন করতে চাও? তাহলে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করো, যা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়ে গেছেন। নিজেদেরে বানানো পথে চললে শুধু অন্যদের জন্য উপদেশ হতে পারবে; নিজেরা কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

মুসলিম সমুদ্র উপকূলসমূহ দখলের জন্য কাফিরদের ষড়যন্ত্র

কথা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু শুরুতেই লেখা হয়েছে, এই রচনা নিছক কেবল গবেষণার জন্য লেখা হয়নি। বরং দাওয়াত ও তাবলিগ এবং জিহাদি চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কলমের কালি দিয়ে নয়, হৃদয়ের খুন দিয়ে লেখা হয়েছে। এ জন্য এটা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই পড়বে; শুধু মানসিক প্রশান্তি ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য নয়। কথা হচ্ছিল সেই ষড়যন্ত্র নিয়ে, যা আমেরিকা ও তার মিত্ররা মুসলিম দেশের সমুদ্র উপকূলগুলো দখলের জন্য করছে। এর সূচনাতে তারা সেই মুসলিম দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে সেই সম্পদশালী দেশগুলোর মার্কেট তাদের তৈরি করা পণ্য দিয়ে ভরে দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে সামরিক সাহায্য ও যুদ্ধ সামগ্রী দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু এই শর্তে যে, আমেরিকান অস্ত্রের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান স্বয়ং আমেরিকার হাতেই থাকবে এবং এসকল অস্ত্র কেবল প্রতিরক্ষার জন্যই ব্যবহার করা হবে। তা ছাড়া এসকল অস্ত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে কখনোই ব্যবহার করা হবে না। এটাও শর্ত, তারা এই অস্ত্র অন্য কোনো মুসলিম দেশের কাছে বিক্রি করবে না। যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রেরণের পরে সামরিক উপদেষ্টা এবং প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষজ্ঞ পাঠায়। এভাবেই মুসলিম শাসকদের নিজেদের আয়ত্তে এনেছে। একেক শাসকের ক্ষেত্রে একেক পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। অভিজ্ঞজনদের নিকট যা গোপন কোনো বিষয় নয়। এখানে সেসবের বিস্তারিত বিবরণ অযথা দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করবে।

তারা সাদ্দামের ভূত দেখিয়ে প্রথমে নিজেদের সংরক্ষণকারী ও কল্যাণকামী সৈন্য সমাবেশ করেছে। তারপরে সেনা ছাউনি প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ী বসবাসের স্থান তৈরি করে নিয়েছে। এসব কিছুই হয়েছে ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের প্রণয়ন করা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে। বর্তমান অবস্থা হলো, মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ভূখণ্ড উপদ্বীপসমূহ, আরবের আশপাশ, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথসমূহ এবং সামুদ্রিক যাতায়াতের যত

বন্দর এবং উপদ্বীপ প্রয়োজন, এ সবগুলোর ওপর আমেরিকা, ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সের কারও না কারও সেনা ছাউনি রয়েছে। এই ছাউনিগুলোতে পণ্য প্রেরণ ও প্রয়োজনের সময় সাহায্য ও সহযোগিতা পৌঁছানোর জন্য ওই সকল সামুদ্রিক অঞ্চলে নৌযান, বিমান ও যুদ্ধজাহাজও ঘোরাফেরা করে; যা চলন্ত ছাউনি। নিম্নে এই সেনা ছাউনি ও তাদের বিদ্যমান সামরিক শক্তি-সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশের স্বার্থে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এসকল নির্লজ্জ দেশগুলো তাদের সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা সর্বদাই গোপন রাখে এবং নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেদের মিত্র ও অস্ত্রের সঠিক সংখ্যা কখনো প্রকাশ করে না, তা ছাড়া এই পরিসংখ্যান কিছুদিন পূর্বের এবং বর্তমানে ইরাকের কুয়েতের ওপর কাল্পনিক চড়াওয়ের অজুহাতে আরও সৈন্য আহ্বান করা হয়েছে, এসব কারণে এটা আন্দাজ করে নেওয়া উচিত যে, প্রকৃত পরিসংখ্যান তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। কারণ, জল এবং স্থল বাহিনী ছাড়াও নৌ সৈন্যও অনেক বেশি এবং অবিশ্বাস্য সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য নৌ সৈন্য ও স্থল সৈন্যকে আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে।

আরব উপদ্বীপে অমুসলিম নৌ ও স্থল সৈন্য

পূর্বেই লিখেছি, জাজিরাতুল আরবের একদিকে আরব উপসাগর, অপরদিকে লোহিত সাগর, অন্য দিকে ভারত মহাসাগর। আমরা এই ধারাবাহিকতায় লুটপাট এবং নির্যাতন ও দখলদারিত্বের বাস্তবতা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি—এই প্রত্যাশায় যে, এটা ইন শা' আল্লাহ তাদের অন্তরে নিভে যাওয়া ঈমান ও বীরত্বের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে জলন্ত অগ্নিশিখায় রূপান্তর করবে; যার তীব্রতা ও উত্তাপ নাপাক ও নোংরা কাফিরদেরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে, ইনশাআল্লাহ।

১। কুয়েতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সামরিক শক্তি

আরব উপসাগরের উত্তর সীমান্তে সর্বপ্রথম কুয়েত অবস্থিত। ছোট্ট এই দেশটি আমেরিকা ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের একপ্রকার কলোনিতে পরিণত হয়েছে। ১৬ হাজার বর্গ কি.মি.-এর এই দেশে ৬ হাজার আমেরিকান সৈন্য; যা ১২৯ জন সেনা অফিসার এবং সামরিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ২৪টি যুদ্ধবিমান, ১৫টি সামরিক হেলিকপ্টারসহ বিদ্যমান। এ ছাড়াও পাকিস্তানের একটি জেলার সমান এই দেশে আমেরিকা এ পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক এবং ভারী অস্ত্র মওজুদ করে রেখেছে, যা গোটা একটি ডিভিশনের জন্য যথেষ্ট।

কুয়েত এবং এই কুফরি শক্তির মধ্যে নিম্নবর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে।

ব্রিটেন : ১১.০২.১৯৯২ তারিখে উভয় দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, "ব্রিটেন কুয়েতের সুরক্ষা করবে। ব্রিটেনের ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যরা কুয়েতি মুসলিম সৈন্যদের সাথে যৌথ সামরিক কর্মসূচি পালন করবে। কুয়েত ব্রিটেনের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করবে।"

ফ্রান্স : ১৮.০৮.১৯৯২ তারিখে ফ্রান্সের সাথে ১০ বছরের জন্য প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অক্টোবর ১৯৯৩-তে আরও একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার আলোকে কুয়েত ফ্রান্স থেকে অস্ত্র এবং যুদ্ধ-সরঞ্জাম ক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

রাশিয়া : ২৯.১১.১৯৯৩-তে রাশিয়ার সাথে ১০ বছরের সামরিক সহযোগিতার চুক্তি হয়েছে।[৫২]

২। হারামাইনের দেশে (সৌদি আরবে) অমুসলিম সৈন্য

কুয়েতের পরেই সৌদি আরব অবস্থিত। যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর এবং তার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মস্থান ও বাসস্থান। পবিত্র হারামাইনের অন্তর্ভুক্ত এই পবিত্র ভূখণ্ডেও ইহুদিরা তাদের সৈন্য অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে। গোটা আরব উপদ্বীপে এটাই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এই রচনার মূল বিষয়বস্তু বিধায় আমরা এখানে বিদ্যমান মার্কিন, ব্রিটিশ এবং ফ্রান্সের সৈন্যদের সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তারিত লিখব। অনুভূতিপ্রবণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে তাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন সেনা ছাউনি রয়েছে।

১. দাম্মাম
২. হাফরুল বাতেন
৩. আল-জওফ
৪. তাবুক
৫. জেদ্দা (যা বাইতুল্লাহ থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে)
৬. তায়েফ (যা বাইতুল্লাহ থেকে মাত্র ৫৪ মাইল দূরে)
৭. রিয়াদ (রাজধানী)
৮. আল খুরুজ।

---

৫২. The International Institute for Strategic Studies : The Military Balance 1992-93, Oxford University Press 'London 1992' P-115-117

হারামাইনের আশপাশে ইহুদি সৈন্যদের ঘেরাও

আপনি যদি সৌদি আরবের মানচিত্রে দৃষ্টি দেন তাহলে আপনার বুঝে আসবে যে, এ স্থানগুলো একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত করলে পূর্ণ একটি বৃত্ত তৈরি হয়। তার সীমান্তে সৌদি আরবের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ এসে যায় এবং এটা গোটা সৌদি আরবের দৈর্ঘ-প্রস্থকে বেষ্টনকারী। তন্মধ্যে দাহরান, জেদ্দা এবং তায়েফ সমুদ্রের সন্নিকটে, যেখানে বাকি স্থানসমূহ দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এর অর্থ হলো, পবিত্র হারামাইনের আশপাশে ইহুদি সৈন্যরা চতুর্দিকে বেষ্টনী দিয়ে রেখেছে এবং এর কোনো অংশ তাদের তত্ত্বাবধান ও উপস্থিতি থেকে খালি নয়। হারামাইনের ভূমিতে মার্কিন সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা কত? এই তথ্য আমেরিকা ছাড়া এ পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি কিংবা সরকারের জানা নেই। কারণ, কার্যত সৌদি শাসকদের কোনো নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট নেই এবং বিষয়টি সম্পূর্ণই মার্কিনীদের হাতে। কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে হারামাইনের ভূমিতে অবস্থানকারী ভিনদেশী সৈন্যদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেনাছাউনির সামান্য বিশ্লেষণ তুলে ধরছি; যেন সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যার অনুমান করা যায়।

আল খুরুজ

আমেরিকা বলে যে, সৌদি আরবে আমাদের সৈন্যসংখ্যা মোট পাঁচ হাজার, যা ইরাকি সীমান্তে নিয়োজিত। আর সামরিক অফিসার এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ ৪ হাজার ৪ শত ১০ জন।[৫৩]

কিন্তু মার্কিনদের এই মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে, যখন ১৩.১১.৯৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রাজধানী রিয়াদের উপকণ্ঠে 'উলইয়া' নামক এলাকায় আমেরিকান সেনাছাউনিতে বোমা হামলা হলো; যাতে পাঁচ মার্কিন সৈন্য নিহত ও ডজন খানেক আহত হয়েছে। সে সময় বেহুঁশ মার্কিনীরা এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে, আমরা আমাদের ৬ হাজার সশস্ত্র সৈন্যকে উলইয়া থেকে স্থানান্তর করে রিয়াদ থেকে ৮০ মাইল দূরে দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চল 'আল খুরুজ' নিয়ে যাচ্ছি। কোথায় গোটা সৌদি আরবে সাড়ে চার হাজার আর কোথায় শুধু এক ছাউনিতেই ছয় হাজার।

---

৫৩. The Military Balance 1995-96

তারপর ২৫.০৬.৯৬-তে সৌদি আরবের উপকূলীয় শহর 'আল খুবাবে' আরও একটি শক্তিশালী হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী বিস্ফোরণ হয়; যাতে ১৯ জন মার্কিন সৈন্য নিহত এবং ৪০০ এর মতো আহত হয়। সে সময় পৃথিবীবাসী সে শহরেও মার্কিন সৈন্যদের উপস্থিতি জানতে পেরেছে। মার্কিনীরা হুঁশহারা হয়ে পেছনের ঘোষণাকে ভুলে যায় এবং তারা মার্কিন জনগণকে শান্ত করার জন্য ঘোষণা দেয়, আল খুবাব থেকে ৪ হাজার ২ শত ৪০ মার্কিন সৈন্যকে 'আল খুরুজ' এর নিরাপদ এলাকায় স্থানান্তর করছে।[৫৪]

তারপর এক খবরে প্রকাশ, 'আল খুরুজের' সামরিক ছাউনি স্থাপনের জন্য যে স্টাফ আমেরিকা হতে আনা হয়েছে, তার সংখ্যা ১২ শত; যার মধ্যে বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞ।[৫৫]

এ সংবাদ অনুযায়ী কেবল এক 'আল-খুরুজের' সামরিক ছাউনিতেই ১০ হাজার ২ শত ৪০ জন সৈন্য এবং ১২ শত অন্যান্য স্টাফ রয়েছে। মার্কিনদের এই স্বীকারোক্তি অতীত হয়ে গেছে, সৌদি আরবে তাদের সামরিক অফিসার এবং সামরিক বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৪ হাজার ২ শত ১০ জন।

এমন একটি দেশে, যে দেশের তাদের নিজেদের মোট সৈন্য সংখ্যাই ৬০ হাজার। সে দেশে সাড়ে চার হাজার সামিরক অফিসার ও সামরিক বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি, তা-ও আবার এক ছাউনিতেই দশ হাজারের অধিক সৈন্য। যেখানে এমন আরও অনেক ছাউনি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এর চেয়ে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক তথ্য যে গোপন করছে, তা কোনো বিবেকবান মানুষের নিকটই গোপন নয়।

প্রকাশ থাকে যে, সৌদি আরবের মোট সৈন্য সংখ্যা ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজারের মধ্যে। যদি তাদের মাঝে ৪৪১০ জন মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞকে বণ্টন করা হয় তাহলে প্রতি ১৩ কিংবা ১৫ জন সৌদি সৈন্যের মাঝে একজন মার্কিন অফিসার-সামরিক বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত (আল্লাহর কাছে পানাই চাই)।

---

৫৪. জারিদাতুল হায়াত-১১.০৮.১৯৯৬

৫৫. প্রাগুক্ত

হারামাইনের শহরে চল্লিশ হাজার বেসামরিক মার্কিন

এই পরিসংখ্যান হলো মার্কিনদের নিজেদের স্বীকার করা পরিসংখ্যান। আরব উপদ্বীপের স্থানীয় নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। উল্লেখ্য, এই পরিসংখ্যানের মধ্যে আমেরিকার তথ্য অনুযায়ী ওই ৪০ হাজার মার্কিনী পাপী অন্তর্ভুক্ত নয়; যারা জেদ্দা, তায়েফ, রিয়াদ, দাম্মাম, দাহরান ও অন্যান্য শহরে বসবাস করে এবং যাদের সাথে অধিকাংশই ব্যভিচারিণী নারী রয়েছে। যারা হারামাইনের শহরের বরকতময় পরিবেশকে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, মদ পান ও শুকর ভক্ষণের অপবিত্রতা ও নোংরামি দ্বারা কলুষিত করছে।

মার্কিন বেসামরিকদের এই পরিসংখ্যানও স্বয়ং মার্কিনীদেরই সরবরাহ করা; যাকে গ্রহণযোগ্য মনে করাও দৃশ্যত অনেক কঠিন। কেননা, আল খুবার, দাম্মাম, দাহরান ছাড়াও রিয়াদ, জেদ্দা এবং ইয়াম্বুর অনেক এলাকায় মার্কিনদের স্রোত, যা যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় দেখতে পারে।

জেদ্দা ও তায়েফ

তায়েফ এবং জেদ্দার দক্ষিণে মার্কিন স্থল ঘাঁটি রয়েছে। তিন বছর পূর্বে মার্কিন সৈন্যদের এক বাসের ওপর আঘাত হানা সশস্ত্র হামলার পরে মার্কিন সৈন্যদের জন্য একটি এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে কোনো সৌদি নাগরিকেরও প্রবেশের অনুমতি নেই। এখানে থাকা যুদ্ধবিমান এবং সৈন্যদের প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না; কিন্তু লোহিত সাগরে জেদ্দার সন্নিকটে মার্কিন নৌবাহিনী রয়েছে, যা দানবসদৃশ বিভিন্ন নৌযানে সুসজ্জিত। 'ক্রোজ' ও 'প্রাগেট'-এর মতো এককেটি নৌযানের মধ্যে কর্মচারী-স্টাফই থাকে হাজারের মতো, তাহলে সৈন্যের সংখ্যা কত হবে—এবার অনুমান করুন।

হাফরুল বাতেন

ইরাকের সন্নিকটে এই স্থানে অনেক বড় মার্কিন সেনা ঘাঁটি রয়েছে। পূর্বেই লেখা হয়েছে, একবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সৈন্যদের পরিদর্শনের জন্য সৌদি আরব আসেন। তখন ওয়াশিংটন থেকে সোজা এখানে এসে অবতরণ করেন। তারপর তিনি রিয়াদের গভর্নরের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার রাজপ্রাসাদে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে হাফরুল বাতেনে ডেকে এনে বুঝিয়ে দেন যে, কার্যত এখানে কার রাজত্ব।

তাবুক

গাজওয়ায়ে তাবুকের সূত্রে এই নাম খুবই পরিচিত। যেখানে একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ৩০ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম এবং ১০ হাজার যুদ্ধের ঘোড়াসহ খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ২০ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু গোটা খ্রিষ্টজগৎ মুখ লুকিয়ে নিজেদের অনুশোচনার অনলে জ্বলছিল, কিন্তু সেদিন তাদের সাহস হয়নি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মোকাবিলা করার। আর আজকে এখানে সেই খ্রিষ্টানদের এমন কেন্দ্র, যেখানে কোন সৌদি সৈন্য গোপনেও তাকাতে পারে না।

হাফরুল বাতেন এবং তাবুকে কত হাজার মার্কিন সেনা আছে? অস্ত্র ও যুদ্ধ-সরঞ্জামের সংখ্যা কত? এর কোনো পরিসংখ্যান এখানো পর্যন্ত জানা যায় না; তবে আল খুরুজে—যা সৌদি আরবের মাঝামাঝি অবস্থিত—যদি দশ হাজার মার্কিন সৈন্য থাকতে পারে তাহলে এই এলাকায়—যা ইরাক ও ইসরাইলের সীমান্তবর্তী এবং যেখান থেকে ইসরাইলের ইহুদি সাম্রাজ্যের আরো ভালোভাবে সুরক্ষা করা সম্ভব—কত সংখ্যক থাকতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সৌদি আরবে মার্কিন যুদ্ধ বিমান

যেমনটি *যরবে মুমিনের* বিগত সংখ্যাগুলোতে বলা হয়েছে, সৌদি আরবে অর্ধ ডজনেরও বেশি মার্কিন স্থলঘাঁটি কিন্তু তাতে যুদ্ধবিমানের সংখ্যা কত? তার প্রকৃত পরিসংখ্যান কারও জানা নেই। তবে মার্কিনদের দাবি হলো, সৌদি আরবে আমাদের মাত্র ১ শত ৩০টি যুদ্ধবিমান রয়েছে; যেখানে ৬ মে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভয়েস অব আমেরিকার উর্দু সংবাদে মার্কিন প্রশাসনের এই স্বীকারোক্তি প্রচার হয়েছে, উপসাগরে তাদের ৩ শত ৫৫টি যুদ্ধবিমান রয়েছে। তাদের অন্য স্বীকারোক্তির আলোকে এই পরিসংখ্যানও ভুল। এসব মিথ্যাবাদীদের কিন্তু স্মরণশক্তি ভালো থাকে না এর প্রমাণ বিস্তারিত সামনে আসবে ইন শা' আল্লাহ।

সৌদি আরবে ব্রিটিশ সৈন্য

আমেরিকার পরে পশ্চিমা কুফরি শক্তির অধিনায়ক এবং নিউওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার তথা নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে পূর্ণতা দানের পথপ্রদর্শক হলো ভীতু ইংরেজ জাতি। এই অসভ্যজাতি ১৯৪৮ সালে যেভাবে ফিলিস্তিন

ইহুদিদেরকে অর্পণ করে পৃথিবীতে প্রথম ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মুসলিমরা তাদের প্রথম কিবলা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তা কোনো গোপন বিষয় নয়। এখনো সে জখম তাজা এবং তাতে প্রবাহিত রক্ত মুসলিম বিশ্বকে বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় এই অভিশপ্ত জাতি উপসাগরে তাদের ঘাঁটি স্থাপনের জন্য আমেরিকার সাথি ও তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আরব উপদ্বীপে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের দাস্তান অনেক দীর্ঘ ও পুরোনো। যার বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। উসমানী খেলাফতের পতন এবং হেজাজের ভূমিকে তুর্কীদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যে তাদের জঘন্য ভূমিকার কথা ইতিহাস সচেতন প্রতিটি মুসলমানের মানসপটে এখানো বিদ্যমান। তুর্কী খেলাফতের বুক বিদীর্ণ করার মধ্যে তাদের যে ভূমিকা ছিল, তার বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনো মুসলিম সন্তানদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। মুসলিম বিশ্বকে এই মহান দুর্ঘটনার মুখোমুখী করার পর এখন এই দেশ বর্তমানে আরব উপদ্বীপের ওপর দখলদারিত্বের ষড়যন্ত্রে আমেরিকার পুরোপুরী সহযোগী ও পদলেহী। আমাদের থেকে প্রথম কেবলা ছিনিয়ে নেওয়ার পর বাকি দুই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে পুনরায় মাঠে নেমেছে। ব্রিটেনের নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শুধু সৌদি আরবেই তাদের আটটি যুদ্ধ বিমান, ৪০ জন সামরিক উপদেষ্টা ও সামরিক বিশেষজ্ঞ রয়েছে। তাহলে সাধারণ সৈন্য কত জন—এই তথ্য এখনো পর্যন্ত জনগণের সামনে আসেনি। সৌদি আরবের আশপাশে মুসলিম সমুদ্রগুলোতে বৃটেনের দানবসদৃশ নৌযানের বিষয় ভিন্ন, যার মধ্যে স্টাফই রয়েছে তিন হাজারের অধিক এবং যা ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক ও হেলিকপ্টারে সজ্জিত।

সৌদি আরবে ২৭ হাজার বৃটিশ

রিয়াদে ১৩.১১.৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বিস্ফোরণের একদিন পর বিবিসি বলেছে, ব্রিটিশ সরকার তাদের এই ২৭ হাজার ব্রিটিশ নাগরিকদের ব্যাপারে ভয়ে আছে, যারা জেদ্দা, তায়েফ, তাবুক, রিয়াদ, ইয়াম্বু এবং দাম্মামে বসবাস করছে।

সৌদি আরব ও ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

সামরিক সম্পর্ক ছাড়াও সৌদি আরবের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও অনেক মজবুত। বিগত বছর উভয় দেশের মধ্যে ৩২ শত কোটি ডলারের ব্যবসা হয়েছে।[৫৬]

এমনিভাবে সৌদি আরবের তেলের মোট উৎপাদনের ১১ শতাংশ ব্রিটেন নিয়ে যায়।[৫৭]

মুসলিমদের এমন জঘন্য ও খাঁটি দুশমন এবং মুসলিমদের পবিত্র ভূমির শাসকদের মাঝে বিদ্যমান সামরিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের যে ভয়াবহ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

মুসলিমদের স্মরণশক্তি এত দুর্বল কেন?

গত বছর ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ আরব উপদ্বীপ ভ্রমণে গেলে সেখানের শাসকরা এই পাপীষ্ঠাকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করে। এ বিষয়ে এক ইংরেজ সাংবাদিক লন্ডনে বলেন, আমি আশ্চর্য হই, মুসলমানদের স্মৃতিশক্তি কতটা দুর্বল! তারা কি ভুলে গেছে যে, তারা এই রানির গোলাম হয়ে আছে এবং তারই শাসনামলে ফিলিস্তিন ইহুদিদের অর্পণ করা হয়েছে।

ব্রিটেনের অন্য এক অতীত

হায়! যদি মুসলিম শাসকদের ব্রিটেনের সামান্য ইতিহাসও স্মরণ হতো, যারা সামরিক সেনাছাউনির সূত্র ধরেই ওমান, আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ইরাক ও জর্ডান দখলে নেয় ১৮৬০ সালে। ১৮৩৯ সালে দখলে নেয় দক্ষিণ ইয়ামান। মিশর এবং সুদানকে নিজেদের আয়ত্তে নেয় ১৮৮২ সালে।[৫৮]

এরাই সেই অভিশপ্ত জাতি, যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের পিঠে খঞ্জর বসিয়ে মুসলিম বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তারাই প্রথম মোঘল সাম্রাজ্যের

---

৫৬. বিবিসি মে-১৯৯৮
৫৭. কাযায়া দুওয়ালিয়া পৃষ্ঠা-৩৩ সংখ্যা-৩৫৩, ১.৬.১৪১৭ হি.
৫৮. কাযায়া দুওয়ালিয়া-পৃষ্ঠা : ১৪, সংখ্যা : ৬.১৪১৭ হি.

ছায়া উপমহাদেশের মাথার ওপর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখানের সম্পদ লুট-পাট করে ইংল্যান্ড পাঠিয়েছে। মুসলমানদের ওপর সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন করে ফিরে যাওয়ার সময় তিন চতুর্থাংশেরও বেশি ভূমি হিন্দুদের দিয়ে গেছে।

ইংরেজরা যেহেতু মুসলমানদের ওপর দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছে, তাই তারা মুসলমানদের প্রকৃতি ও চেতনা সম্পর্কে অবগত ছিল। ইংরেজদের তুলনায় মার্কিনীরা কম চালাক। তা ছাড়া তাদের মুসলমানদের সম্পর্কে সে অভিজ্ঞতা নেই, যা ইংরেজদের রয়েছে। এ জন্য মুসলমানদের মার্কিনদের পাশাপাশি ব্রিটিশদের মতো বড় শত্রুদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে পবিত্র স্থানগুলোর ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক থাকা খুবই জরুরি।

সৌদি আরবে ফ্রান্সের সৈন্য

ফ্রান্স কুফরিবিশ্বের সে দেশ, যারা প্রথম দিন থেকেই মুসলিম বিশ্বের ভয়াবহ ক্ষতি করে চলেছে। সর্বপ্রথম আন্দালুস পতনের বেদনায়ক ঘটনায় খ্রিষ্টান আক্রমণকারীদের ২০টি ক্যাম্পের সমপরিমাণ সহযোগিতা দিয়েছে।

ক্রুসেডযুদ্ধগুলোর প্রতিটিতে কাফির সৈন্যদের সাথে প্রথম সারিতে শামিল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন যখন ইরাক, জর্ডান এবং ফিলিস্তিন দখল করল, ১৯৬১ সালে তখন ফ্রান্স এবং ব্রিটেন 'সাইকস বেক'-এর অধীনে ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি স্থাপনের ঘোষণা দেয়। ১৯৪৮ সালে 'বেলফুর' চুক্তির অধীনে ফিলিস্তিন ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমান যুগেও এ দেশটি তার মুসলিম-শত্রুতা ও ইহুদি-সখ্যতা প্রকাশ হতে দেয় না। কিন্তু শুরু থেকেই তাদের গোপন প্রবণতা ইহুদিদের দিকেই ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইহুদি ও মুসলমানদের সাথে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সবকটিতে ফ্রান্স সরাসরি ইসরাইলের সাথে ছিল।

ফ্রান্স ও মুসলিম বিশ্ব

মুসলমানদের স্মরণ রাখা উচিত, ইতোপূর্বে ফ্রান্স ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া, ১৮৫৮ সালে মুরতানিয়া, ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়া, ১৯১১ সালে মরক্কো এবং ১৮৮২ সালে সিরিয়া ও লেবাননকে নিজেদের দখলে নেয়।[৫৯]

[৫৯]. কাযায়া দুওয়ালিয়া-পৃষ্ঠা:৩৫৩৪, সংখ্যা : ১.৬.১৪১৭হি.

বর্তমানে সৌদি আরবে ফ্রান্সের বেশ কিছু যুদ্ধ-বিমান রয়েছে। সেনা বিশেষজ্ঞ এবং সৈন্যদের প্রকৃত সংখ্যা কত, তা জানা নেই। কিন্তু আরব উপদ্বীপের আশেপাশে ফ্রান্সের নৌযান ভরপুর। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইন শা' আল্লাহ।

তা ছাড়া পবিত্র হারামাইনের উপকূল, লোহিত সাগরের মুখে 'বাবুল মানদাবে' ফ্রান্সের নৌযান ছাড়াও ফ্রান্সের বিমান ও স্থল বাহিনীর অনেক বড় কেন্দ্র রয়েছে। তাতে সামরিক সরঞ্জামের পরিসংখ্যান জানা নেই। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় ফ্রান্সের চেয়ে বড় কোনো স্থল-নৌ-বিমানবাহিনীর কেন্দ্র নেই।[৬০]

লোহিত সাগরে 'বাবুল মান্দার'-এর মুখে ফ্রান্সের ক্ষমতাশীন হওয়ার অর্থ—সে ইয়ামান, সৌদি আরব, সুদান ও মিশরসহ অন্যান্য আরবদেশগুলোর সামরিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ওপর ক্ষমতাশীল হওয়া, সাথে সাথে পবিত্র হারামাইনের বিরুদ্ধে যখন ইচ্ছা, ভয়াবহ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া। বিচক্ষণ ব্যক্তিদের কাছে গোপন নয়, আরব উপদ্বীপে ফ্রান্সের উপস্থিতি ও সংকল্প অন্যান্য পশ্চিমা কাফের সৈন্যদের কাছে ভিন্ন কিছু নয়। যে দেশ ইসরাইলের বাইতুল মোকাদ্দাসে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসরাইলের মিত্র ও সহযোগী হতে পারে, সে দেশ হারামাইন শরীফাইনের সুরক্ষায় কীভাবে সত্যবাদী হতে পারে?

বাইতুল্লাহর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র

আজ থেকে আনুমানিক ২০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১২১৩ হিজরিতে যখন ফ্রান্সের সৈন্যরা মিশরের ওপর আক্রমণ করেছিল তখন উসমানী সাম্রাজ্যের বাদশাহ খলিফাতুল মুসলিমিন মক্কার গভর্নর গালিব বিন মাসায়ীদকে ফ্রান্সীদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেছিলেন, তাদের আসল টার্গেট মিশর নয়, আসল টার্গেট আমাদের পবিত্র হারামাইন। সুতরাং হারামাইনের বাসিন্দাদের এখন থেকেই নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এখানে সে চিঠির অনুবাদ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে চিঠি মুসলিম সুলতান মক্কার গভর্নরকে লিখেছিলেন, যা আল্লামা শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ তার প্রিয় *আল-বদরুত তালি* গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। উসমানী খলিফা লিখেছেন, "আমি আপনাকে এ কথা অবহিত করতে চাই, ফ্রান্সের কাফেররা (আল্লাহ তাদের দেশকে ধ্বংস করে দেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করুন)

[৬০]. হারবুল খালিজ, মুহাম্মদ হোসাইন, পৃ : ২০৯-২১৪

তাদের সকল ওয়াদা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং যে সকল অঙ্গিকারে তারা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়েছিল, তা থেকে পুরোপুরি সরে গিয়েছে। তারা মানবতা ও মনুষ্যত্বের জামাকে টুকরো টুকরো করে মিশরের গ্রাম ও শহরে অতিগোপনে হট্টগোল তৈরি করে দিয়েছে। যে স্থানই ওরা দখল করেছে, সেখানেই কুফরের ফেতনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে রেখেছে। ভ্রষ্টতা ও গাদ্দারির বাজার গরম করে দিয়েছে; যেন তারা শয়তানের পতাকাতলে সমবেত হয়।" একটু সামনে বেড়ে সুলতানুল মুসলিমিন ফ্রান্সিস দখলদারীদের প্রত্যয় সম্পর্কে তাদেরই ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই প্রত্যয় বিশ্বকুফরি শক্তির ওই টার্গেটের সাথে মিলে যায়, যা নিকট অতীতে তারা দখলকৃত এলাকায় নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর করে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সুলতানের বর্ণনা করা এই বাক্য এক ফ্রান্সিস জেনারেলের, যা তার বাদশাহকে পাঠানো রিপোর্টে লিখে পাঠিয়েছে। নিজ মতামত ব্যক্ত করে সে লেখে, "আমাদের মূল চেষ্টা, কীভাবে এখানকার জনগণকে ইসলাম ও আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য থেকে বের করা যায়; যেন এখানে পরিপূর্ণভাবে আমাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরা সকলেই আমাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যায়। কেননা, আমরা যদি আমাদের এই উদ্দেশ্যে সফল হতে পারি তাহলে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং তাদের একতা ও ঐক্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এরূপ তখনই হবে যখন আমরা তাদের ওপর এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সব ধরনের সাজ-সরঞ্জামের ওপর আমাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারব। আরবরা এমন জাতি, যাদের ওপর দুই কারণে অনেক দ্রুত দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এক. তারা একত্রে বাস করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের এলাকা ও খেজুর বাগানে বসবাস করে।

দুই. তারা তাদের জাতীয় লাভ-ক্ষতি ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন।

সবচেয়ে বড় কথা, যে জিনিস তাদের বিক্ষিপ্ত, সাহসহীন ও ভীরু বানাবে তা হলো এই, যদি তাদের কেবলা ভেঙ্গে ফেলা যায় (আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন) এবং তাদের মসজিদগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আমরা যদি কোনোভাবে এ দু'টি কাজ করতে পারি, তাদের কা'বা এবং তাদের নবীর মসজিদ তথা মসজিদে নববী ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে পুড়িয়ে দিতে পারি (কাফিরদের নির্লজ্জতা থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাই) তাহলে তাদের সকল আশা-ভরসা মুখ থুবড়ে পড়বে। তাদের ঐক্য ভেঙে যাবে। আমরা তাদের ওপর খুব সহজেই ক্ষমতাশীল হয়ে যাব।"

ফ্রান্সিস জেনারেলের এই রিপোর্ট বর্ণনা করা এবং তাদের গোপন দুরভিসন্ধি সম্পর্কে মক্কার গভর্নরকে অবহিত করার পর অবশেষে মুসলিম সুলতান পবিত্র হারামাইনের বাসিন্দাদের জিহাদের ওপর উদ্বুদ্ধ হওয়ার, সজাগ ও সতর্ক থাকার এবং নিজেদের আশপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ওপর জোর দিয়ে বলেন, "সুতরাং হে মক্কার গভর্নর! হে উচ্চ বংশের সন্তানেরা! হে ইসলাম ও মুসলমানের পথপ্রদর্শকেরা! হে তুমুল লড়াইয়ে ভূমিকা পালনকারী গাজী ও বীর যুবকেরা! হে দীনের নিদর্শন সুরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গকারীরা! হে নিজেদের দৃঢ়প্রত্যয়ের দ্বারা কুফরি ঝড়ের গতি পরিবর্তনকারীরা! হে আমাদের দীনি ভাইদের এবং নিজের রবের দীন সুরক্ষায় জীবনবাজি রাখা ভাইয়েরা! জলদি করো—স্বীয় রবের আনুগত্যে। জলদি করো স্বীয় কেবলার সুরক্ষায়। এটাই আত্মমর্যাদার পরিচয় দেওয়ার উপযুক্ত সময়। এটাই দীনের দুশমনের মোকাবিলায় বীরত্ব দেখানোর যথাযথ সময়। সুতরাং তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেদের ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করো। নিজেদের উপকূলসমূহ এবং প্রবেশপথসমূহের হেফাজত করো। কাফেরদের সাথে সংযুক্ত সীমান্তগুলোর সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধান করো। বিশেষ করে জেদ্দা ও ইয়াম্বুর বিমানবন্দর ও তার আশপাশের এলাকায় কড়া নজরদারি করো; যাতে ইসলাম ও মুসলমানের ইজ্জত সুরক্ষা করতে পারো।[৬১]

পবিত্র হারামাইনের ওপর ধেয়ে আসা বিপদ

প্রিয় পাঠক, আপনি দুর্ভাগা ফ্রান্সিস জেনারেলের নোংরা ইচ্ছেগুলো পড়েছেন। মুসলিম সুলতান নিজ ঈমানী দৃষ্টি দিয়ে ফ্রান্সিস দখলদারদের পেছনে লুকিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রগুলোর যে তথ্য প্রদান করলেন, আপনি তার সততা ও সত্যবাদিতা অবলোকন করেছেন। উপসাগরে অমুসলিম সৈন্যদের উপস্থিতির যে বিপদগুলো পবিত্র হারামাইনের ওপর ঘোরাফেরা করছে, মুসলমানদের তার কিছু উপলব্ধি হওয়া উচিত। এখন তাদের অলসতার চাদর ছুড়ে ফেলার এবং আত্মমর্যাদা ও বীরত্বে অন্তর জাগ্রত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এখন শুধুমাত্র দু'আর দ্বারা কিছু হবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মতো অলস ও অকর্মণ্য লোকদের জন্য তাঁর নিয়ম পরিবর্তন করবেন না। তাঁর নিয়ম হলো, তিনি তাদেরকেই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার এবং নিজেদের দুর্বলতাগুলো দূর করার সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। আর যারা ভীরুতা

৬১. আল্লামা শাওকানী রহ., আল-বদরুত তালি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা : ১০-১৩

দুর্বলতা ও অলসতা ত্যাগ না করে, তাদের জন্য তাঁর কাছে শুধু অভিশাপ ও শাস্তি; কোন রহমত ও পুরস্কার নেই।

৩। বাহরাইন

সৌদি আরবের পরেই বাহরাইন অবস্থিত। এ দেশের মোট আয়তন ২৬৮ বর্গমাইল এবং এখানকার নৌ ও বিমানবাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা ১০ হাজার ২০০। বিমানবাহিনীর কাছে মাত্র ২৪টি বিমান রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের একটি জেলার সমান এই দেশটিতে মার্কিনীদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আমেরিকার ১৮টি যুদ্ধ বিমান, ৬০০ সৈন্য ও ৫০ জন সামরিক উপদেষ্টা ও সামরিক বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান। কারণ, উপসাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি এখানেই অবস্থিত। ৮০-৯০টি যুদ্ধ বিমান নিয়ে গঠিত আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিমান-নৌযান বাহরাইনের দক্ষিণ উপকূল 'জাফির' নামক জায়গায় নোঙর করা। এই বিমান বহনকারী নৌযানে স্টকই থাকে পাঁচ হাজরের অধিক।

এখানে ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা কত, তা এখনো আমাদের জানা নেই। তবে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, 'জাফির' বন্দরে বৃটিশ সেনারাও থাকে।[৬২]

৪। কাতার

বাহরাইন সংলগ্ন দেশটিই কাতার। এ দেশের মোট আয়তন ১১ হাজার ৪ শত ৩৭ বর্গ কিলোমিটার। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা যথাক্রমে ৮৫০০, ৮০০ ও ১৮০০। যেখানে স্বয়ং মার্কিনীদের বর্ণনানুযায়ী তাদের সৈন্য ৫ হাজার। কাতারে বিমান বাহিনীর কাছে মাত্র ১২টি যুদ্ধবিমান, অপরদিকে মার্কিন বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান রয়েছে ৩৪টি। তা ছাড়াও কাতারের বন্দরগুলোতে হাজার হাজার মার্কিন সেনা দেখতে পাওয়া যায়।[৬৩]

এমনকি আমেরিকা একটি পরিপূর্ণ ব্রিগেডের জন্য ট্যাংক, ভারী তোপসহ সবধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামও কাতারে মওজুদ করে রেখেছে; যেন প্রয়োজনের সময় শুধু সৈন্যদেরকে আমেরিকা থেকে এখানে স্থানান্তর করে তাদেরকে সাথে সাথে মার্চ করাতে পারে।

---

৬২. কাযায়া দুওয়ালিয়া/সংখ্যা : ৩৫৩
৬৩. প্রাগুক্ত

৫. আমিরাত

আমিরাতে আমেরিকার ১২০ জন সামরিক উপদেষ্টা ও সামরিক বিশেষজ্ঞ রয়েছে। যেখানে সাধারণ সৈন্যদের ব্যাপারে আমেরিকার বক্তব্য হলো, এখানে আমাদের মাত্র ৬০ জন সৈন্য রয়েছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা পৃথিবীতে আর কী হতে পারে? কোনো সৈন্যবাহিনীতে কি একজন সৈন্যের জন্য দুইজন অফিসার নিয়োগ হয়েছে কখনো? আমেরিকা প্রকৃত সামরিক শক্তি গোপন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সেই ভয় ও আশঙ্কাকেই সত্যায়ন করে; যার দিকে মুসলিম মনীষীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন।

৬। ওমান

এ দেশ একদিকে তো ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করছে। অপরদিকে আরব উপদ্বীপে সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে এই রাষ্ট্র আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাফিরদের কাছে স্বর্গ হয়ে আছে। আরব উপসাগরে বিদ্যমান পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ পেট্রোলখনি পর্যন্ত পৌঁছার প্রবেশদ্বারে হরমুজ প্রণালী নামক সামুদ্রিক রেখাটিও এই ওমানের সন্নিকটে অবস্থিত। এ জন্য এখানে বিশ্ব কুফরি শক্তির সৈন্যসংখ্যা বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। ওমান আমেরিকা, মিশর, মাসকার্ট, মাতরাহ ও হরমুজের পাশে খাসাবে চারটি বিমানঘাঁটি সরবরাহ করে রেখেছে। তা ছাড়া এখানে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের নৌ-সেনা ও দানবসদৃশ সামুদ্রিক অভিযানের অনেক বড় বেষ্টনী রয়েছে; যা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তানের জন্যও অনেক বড় আশঙ্কার বিষয়। মার্কিন সামুদ্রিকযান ও যুদ্ধবিমান নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে পাকিস্তানের জল এবং আকাশসীমা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ করছে। ওমানে ব্রিটেনের ৬০০ এবং আমেরিকার সাতজন সামরিক বিশেষজ্ঞ ও সামরিক উপদেষ্টা রয়েছে।

৭। ইয়ামান

ওমান অতিক্রম করলেই ইয়ামান। বিগত দিনে **যরবে মুমিনে** সংবাদ ছাপা হয়েছে, ইয়ামান সরকার ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ উপদ্বীপ 'সুমাত্রা'-কে আমেরিকার সোপর্দ করে দিয়েছে। এই উপদ্বীপ থেকে পুরো ইডেন উপসাগর—যা লোহিত সাগরের চৌকাঠ (প্রবেশদ্বার)—মার্কিনীদের সোপর্দ করা হয়েছে। বরং বর্তমানের তাজা সংবাদ অনুযায়ী ইয়ামান সরকার সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বয়ং ইডেন সাগরে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যদের স্থায়ী ক্যাম্পের অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এই সত্য সংবাদ এই অঞ্চলে আমেরিকার প্রসারিত

উপদ্বীপের শাসকদের পক্ষ থেকে ইরাক হামলার যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে, তা না বিবেক সমর্থন করে, আর না যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। জেদ্দা ও ইয়াম্বুর বন্দর ইরাক থেকে হাজার মাইল দূরে বিপরীত দিকে অবস্থিত। এখানে না সাদ্দাম আছে, না তার পিপলস আর্মি আছে। এখানে তো শুধু গভীর সমুদ্র, যার তীরে মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ সুদান। যাদের থেকে কারও কোনো ভয় নেই। হাসি ও কৌতুকের বিষয় হলো, এই সেই সমুদ্র, যেখানে উসমানী খলিফারা কোনো নাপাক অস্তিত্বকে প্রবেশ করতে দেননি, সেখানে আজ দুর্গন্ধময় এবং নাপাক ইহুদিরা অত্যাধুনিক অস্ত্র ও বিশাল সামরিক শক্তি নিয়ে এক মুসলিমের হামলা থেকে অন্য মুসলিমকে রক্ষা করতে এসেছে। যদি শোকের অনুমতি থাকত, তাহলে উচিত ছিল এমন দুর্ঘটনার জন্য শোক করা।

১০। মিশর

সুদানের পরে মিশর। এই মুহূর্তে দুর্ভাগ্যক্রমে আফ্রিকা মহাদেশে আমেরিকার স্বার্থের সবচেয়ে বড় সহযোগী ও প্রধান মিত্রে পরিণত হয়ে আছে মিশর। এখানে ইয়াম্বুর, অপর পাশে 'বুনইয়াসের' অনেক বিশাল এবং পূর্ণাঙ্গ সেনাঘাঁটি রয়েছে। একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি মতে, এখানে ১০ হাজার মার্কিন সৈন্য রয়েছে। এই স্থল ও বিমানঘাঁটি থেকে মদিনাতুর রাসুল অতি নিকটে। বুনইয়াসের পরে সুইজখালের নিকটবর্তী উপত্যকা 'ক্বানায়' বিমানঘাঁটি রয়েছে। সুইজখালের এই পাড়ে সীনাই অবস্থিত। এখানে অনেক বড় সেনাঘাঁটি রয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী, এখানে মিশর সরকারের একটিও সৈনিক কিংবা একজনও দায়িত্বশীল নেই। পুরো উপত্যকা মার্কিনীদেরকে অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘাঁটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে।

এক. সুইজখালের বহুপথ-সংবলিত যাতায়াত ব্যবস্থাকে নিরাপদ করা।

দুই. এই উপত্যকা সংলগ্ন ইসরাইলের সুরক্ষা। এর ওপর ভিন্ন একটি রচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

১১। জর্ডান

সীনাই উপত্যকার ডান দিকে জর্ডান অবস্থিত। আমেরিকা এটাকেও তার অপবিত্র অস্তিত্ব দ্বারা ময়লাযুক্ত করা জরুরি মনে করেছে। এখানে 'আরজাক' নামক স্থানে মার্কিনী সেনাঘাঁটি স্থাপন করেছে।

১২। ইসরাইল

জর্ডানের পরে আসে ইসরাইল। এর সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, এখানে কুফরি শক্তি এমন কিছু নেই, যা জমা করে রাখেনি। এখানে

আমেরিকার অনেকগুলো সেনাঘাঁটি রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি 'হাইফায়' অবস্থিত। তারপরে দ্বিতীয়টি 'তেলআবিবে' অবস্থিত।

১৩। তুরস্ক

ইসরাইল অতিক্রম করে সামনে গেলে আরব উপদ্বীপের পাশে বিছানো কুফরি জালের পরবর্তী ঘাঁটি তুরস্কে। যেখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি পরিপূর্ণভাবে আমেরিকার নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। এ ছাড়াও কয়েক হাজার সেনা এবং নির্ভরযোগ্য যুদ্ধবিমান রয়েছে. যার মধ্যে বর্তমানের প্রসিদ্ধ **F-16** (এফ-১৬)ও রয়েছে।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রদত্ত চিত্র নং ৭, ৮, ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য।

আরব উপদ্বীপের আশপাশে কাফিরদের নৌ-সেনা

সম্মানিত পাঠক, সেনা ও বিমান বাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ তো আপনারা শুনলেন। এত অধিক সংখ্যক সেনা ও বিমান বাহিনীর সামরিক শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন আমরা আরব উপদ্বীপের তিন দিকে ছড়িয়ে থাকা জলভাগে কুফরি শক্তির নৌ-সেনাদেরকে দেখি, তখন প্রচণ্ড বিহ্বলতায় উৎকণ্ঠিত হই। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রকার বিরাট বিরাট যুদ্ধ জাহাজ, নৌ-যান এবং বিমানসজ্জিত জাহাজগুলো দেখে এমন মনে হয় যে, এই দেশগুলো তাদের নৌ-সেনাদের গঠনই করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, তারা এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের অন্তরের কল্পিত ভয় থেকে সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। অথচ বাস্তবে ওরা এই বাহানায় আরব উপদ্বীপ ও তাতে অবস্থিত মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থানসমূহ পবিত্র মক্কা ও মদিনা ঘেরাও করে একদিকে দুই হাতে সেখানের সম্পদ লুটে নিচ্ছে, অপরদিকে পবিত্র হারামাইনের বিরুদ্ধে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাকে বাস্তবতার জামা পরানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

মুসলিম সমুদ্রাঞ্চলে কাফিরদের সেনাছাউনি

১. কুয়েতের বন্দর (কুয়েত)
২. দাম্মামের বন্দর (সৌদি আরব)
৩. জাফিরের বন্দর (বাহরাইন)
৪. খাসাবের বন্দর (হরমুজ, ওমান)
৫. মিশর উপদ্বীপের বন্দর (ওমান)

ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত কোনো নৌযান নড়াচড়া করতে পারে না। মুসলিম দেশ সুদানের নৌযানগুলোকে তল্লাশি ব্যতীত অতিক্রম করতে দেওয়া হয় না। এ ছাড়াও স্বয়ং আরব উপদ্বীপের শাসকদের কোনো জাহাজের ওপর তাদের সন্দেহ হলে সেটাকে তল্লাশি করাও তারা তাদের দায়িত্ব মনে করে।

আমেরিকার নৌযান নং-৫

এই মার্কিন নৌযান আরব উপসাগর থেকে ওমান উপসাগর, ইডেন উপসাগর এবং লোহিত সাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এটা পৃথিবীর দুটি বৃহৎ বিমানসজ্জিত নৌযানের অন্যতম এবং অপর ৩৩ টি বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ এতে অন্তর্ভুক্ত। যাতে ক্রোজার (CRUSIER), ব্যাটেলশিপ (BATTLE SHIP) এবং ডিস্ট্রয়ার (DESTROYER) এর মতো অত্যাধুনিক নৌযানও রয়েছে। নৌবাহিনী বিশেষজ্ঞরা ভালো করেই জানেন, এমন বড় বড় জাহাজে স্টকই থাকে হাজারের মতো। ৬ মে ১৯৯৮-তে স্বয়ং মার্কিন বেতারের ঘোষণা–উপসাগরে ৩৭ হাজার মার্কিন সেনা বিদ্যমান। মার্কিন নৌযান নং ৫-এর সেন্ট্রাল অফিস বাহরাইনের 'জাফির' নামক বন্দরে। উল্লেখ্য, বাহরাইনের নিজস্ব নৌযান মাত্র ১২টি যুদ্ধ জাহাজ ও সাতশত সৈন্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মার্কিন নৌবাহিনীর ৩টি বিমানসজ্জিত নৌযান

আরব উপদ্বীপের আশপাশে আমেরিকার ৩টি বিমানসজ্জিত নৌযান আছে।

১. দ্বিতীয় ওয়াশিংটন

এক হাজার ফুট লম্বা এ বিমানসজ্জিত নৌযানে দিনরাত কর্মরত ইমার্জেন্সি স্টাফ সাড়ে ৫ হাজার; যারা সকলেই মার্কিনী। তাতে বিদ্যমান ৮০টি যুদ্ধবিমানের জন্য প্রশস্ত রানওয়ে, সৈন্যদের জন্য ব্যারাক, বিমান মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপ এবং ভারী অস্ত্র বিদ্যমান।

২. ইন্ডিপেনডেন্ট

এটি ৮০টি যুদ্ধ বিমান উঠিয়ে নিয়ে গত রমজানের শেষ দশকে আমেরিকা ও ইরাকের এক বানোয়াট বাস্তবতাবর্জিত খবরের ভিত্তিতে উপসাগরে উপস্থিত রয়েছে। যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখানেও অনুমান করে নিন।

আমেরিকার বক্তব্য হলো, তারা একে ফেরত নিতে ইচ্ছুক। কোনো কোনো গুজব অনুযায়ী, শাইখ উসামার জারি করা ফতোয়া এবং সাংবাদিক সম্মেলনের পরে এই বিমানসজ্জিত যুদ্ধজাহাজটি ফেরত চলে গেছে। কিন্তু সঠিক সূত্র তা অস্বীকার করে।

৩. এন্টারপ্রাইজ

এটা শুধু আমেরিকারই নয়; বরং গোটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিমানসজ্জিত নৌযান। যা ৯০ টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান স্কোয়াডের অন্তর্ভুক্ত। এটা ইহুদিদের সুরক্ষার জন্য ইসরাইলের হাইফা বন্দরে নোঙ্গর করা আছে। আমেরিকা ইসরাইলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও আরব দেশগুলোকে হুমকি দেওয়ার জন্য মার্কিন নৌযান নং ৬-কে ভূমধ্য সাগরে নিয়োজিত করে রেখেছে। এখানে এন্টারপ্রাইজ বিমানসজ্জিত নৌযান ছাড়াও আরও ২৩টি মার্কিনী নৌযান ইসরাইলি বন্দরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও ইসরাইলে আমেরিকার সাড়ে ১৬ হাজার সৈন্য রয়েছে; যারা ইহুদিদের সুরক্ষায় নিয়োজিত।

ফ্রান্সি নৌযান

আমেরিকার পরে সবচেয়ে অধিক সামরিক শক্তি হলো ফ্রান্সের। যারা আরব উপসাগর থেকে নিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের ঘেরাওয়ের অংশীদার। ফ্রান্সের নৌবাহিনীর ১৬ টি নৌযান রয়েছে। যেগুলো যুদ্ধবিমান, সামরিক হেলিকপ্টার, দূরনিক্ষেপণ অত্যাধুনিক মিজাইল এবং ভারী তোপখানা দিয়ে সজ্জিত। এই ১৬ টি জাহাজে ক্রুজার (CRUSIER), ব্যাটেলশিপ (BATTLESHIP) এবং ফ্রিগ্যাটের মতো অত্যাধুনিক নৌযানও অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের নৌবাহিনীর এই সামরিক শক্তি সেগুলো ছাড়া, যেগুলো লোহিত সাগরের প্রবেশ পথ বাবুল মান্দাবে জিবুতির পাশে নিয়োজিত রয়েছে।

বৃটিশ নৌযান

আরব উপদ্বীপের সমুদ্র ঘেরাওয়ে ব্রিটিশ নৌবংরও আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাথে পুরোপুরিভাবে শরিক। বৃটেনের 'আর্মিলা' নামক নৌযান, যা ফ্রিগ্যাট, ডিস্ট্রয়ারের মতো জাহাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত পারস্য উপসাগরের প্রবেশপথ 'হরমুজে' নিয়োজিত।

হে মুসলমানেরা!

হে মুসলামানেরা! এই হলো সেই বিবেকবুদ্ধি হরণকারী ও ভয়াবহ বাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা, যা বর্ণনা করতে অন্তর রক্ত-অশ্রু প্রবাহিত করে এবং কলিজা মুখে চলে আসে। এখনো যদি তোমরা সতর্ক না হও, তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তোমাদেরকে গাজর-মুলার মতো টুকরো টুকরো করা হবে। তোমাদের দুশমন এর চেয়ে কমে কোনোভাবেই রাজি নয়।

প্রিয় পাঠক! দয়া করে এই রক্তাক্ত দাস্তানকে পুনরায় আরেকবার পড়ুন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিন যে, সকল গুনাহ ত্যাগ করে এবং জিহাদের রাস্তাকে জীবিত করার পথ অবলম্বন করে দুনিয়া ও আখেরাতে আনন্দিত হবেন, নাকি নিজের বদ আমল এবং দুনিয়ার ভালোবাসায় মত্ত থেকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের শিকার হবেন। মনে রাখবেন, এ কথা তো নির্ধারিত, গোটা দুনিয়ার কাফিররা মিলে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেও হারামাইন শরিফাইনের একটি ইটও বাঁকা করতে পারবে না ইন শা'আল্লাহ। যেমনিভাবে অতীতে আবরাহা লাঞ্ছিত হয়ে অপমানজনক মৃত্যুবরণ করেছে, আজকের আবরাহারাও সেই একই পরিণতি ভোগ করে ধ্বংস হবে ইন শা'আল্লাহ। যে আল্লাহ তা'আলা আবাবিলের মাধ্যমে হস্তি আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারেন, তিনি শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ-এর আল-কায়দার জানবাজ মুজাহিদদের হাতেও নিউ ওয়ার্ল্ড ওর্ডার তথা নতুন বিশ্বব্যবস্থার রঙ্গিন স্বপ্নে বিভোর সুপার পাওয়ারকেও ধ্বংস ও নিঃশেষ করতে সক্ষম। সিদ্ধান্ত আপনাদের! আপনারা কি হারামাইনের ডাক ও জিহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের সৌভাগ্য কিংবা বিজয়ের নেয়ামত অর্জন করবেন নাকি দুনিয়ার চাকচিক্যে মত্ত থেকে ও ভীরুতার চাদরে মুখ লুকিয়ে রেখে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও এবং তার গজবের লক্ষ্যবস্তু হবেন? আমরা আমাদের নিজেদের অশ্রু প্রবাহিত করে এবং নিজেদের ফরজ আদায় করে সিদ্ধান্ত আপনাদের পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই কিতাবের শেষাংশে প্রদত্ত চিত্র নং ১১, ১২, ও ১৩ দ্রষ্টব্য।

২. বাবুল মান্দাব

এটা পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কেন্দ্রস্থল "লোহিত সাগরের" প্রবেশপথে অবস্থিত। এখানের পাহারাদারির জন্য ফ্রান্স তার ঘাঁটি গেড়ে রেখেছে।

৩. সুইজখাল

মিশরে অবস্থিত এই নদী মানুষের হাতে খনন করা; যা লোহিত সাগর ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী শুকনো অংশকে খনন করে বের করা হয়েছে। যদি এই নদী মুসলমানদের দখলে থাকত, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকাগামী জাহাজকে হাজার হাজার মাইলের পথ অতিরিক্ত ঘুরে যেতে হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কর্মফল হলো, এই নদীও বর্তমানে আমেরিকার দখলে।

৪. ফসফরাস প্রণালী

এটা এশিয়া এবং ইউরোপের মাঝখানে সীমান্তের কাজ দেয়। লোহিত সাগর থেকে রোম সাগরে যেতে হলে এটা অতিক্রম করা ব্যতীত যাওয়া যাবে না। তুরস্কের সীমান্তে অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র পথের ওপরও আজ আমেরিকা খুঁটি গেড়ে রয়েছে।

৫. তিব্বত প্রণালী

তিউনিশিয়ার উপকূলে অবস্থিত এই গিরিপথও আমেরিকার দখলে। এর উল্টোদিকে সাকিলা উপদ্বীপ। মাল্টাদ্বীপও এর কাছাকাছি। যেখানে রেশমী রুমাল আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহিমাহুল্লাহ ইংরেজ উপনিবেশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শাস্তিস্বরূপ বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন।

৬. জিব্রাল্টার প্রণালী বা জাবালুত তারেক

এটা সেই জগদ্বিখ্যাত সংকীর্ণ সমুদ্ররেখা, যা অতিক্রম করে স্পেন বিজেতা তারিক বিন যিয়াদ ইউরোপে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন। এটা মরক্কো এবং স্পেনের মাঝখানে অবস্থিত। স্পেনের দিকে সেই উপকূলে যেখানে মুসলিম বাহিনী তাদের নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই দৃঢ়চেতা মুসলিমদের দুনিয়া পূজা ও জিহাদের প্রতি অনিহার পরিণতি হলো, একদিকে ব্রিটেন অন্যদিকে আমেরিকা সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার মাধ্যমে এর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। এই সমুদ্ররেখাটিই রোম সাগর এবং লোহিত সাগরের একমাত্র সঙ্গমস্থল।

এই মানচিত্র আমাদের কী বলে?

এই মানচিত্রের ওপর বর্ণিত বাস্তবতা আজও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বাণীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। **"যখন মুসলমান জিহাদ-কিতাল ত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। আর এই লাঞ্ছনা জিহাদ শুরু না করা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"**[৬৪]

আমাদের যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সত্যিই ঈমান থেকে থাকে, তাহলে আসুন আজই অঙ্গীকার করি, আমরা লাঞ্ছনা থেকে বের হতে জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাস্তব জিহাদে স্বীয় জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করব। তারপর আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, তিনি মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করবেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান জিহাদ এবং কমিউনিস্ট ও জালিমদের বিরুদ্ধে তালেবানদের জিহাদের মধ্য দিয়ে আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে এবং আমাদের সকল বেদনার পরিপূর্ণ চিকিৎসাও।

লোহিত সাগরের দখলদারিত্ব নিয়ে ইহুদি পরিকল্পনা

এমনিতেই লোহিত সাগরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার জন্য এটাই যথেষ্ট, এটা ইসলামের প্রধান কেন্দ্র এবং মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান মক্কা-মদীনার সীমান্ত সংলগ্ন। কিন্তু লোহিতসাগর তার নিজস্ব ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই বর্তমানে সমস্ত বিশ্বশক্তির কাছে, বিশেষ করে ইহুদিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের বিরুদ্ধে সকল পরিকল্পনাকে বাস্তবতার জামা পড়াতে লোহিত সাগর অনিবার্য। কেয়ামতের আগে বাইতুল্লাহর ওপর 'হাবশার' যে বাহিনী আক্রমণ করবে, হাদিস অনুযায়ী তারাও এই লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েই আসবে। লোহিত সাগরের তীরে পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের অবস্থান ইহুদিদের বিশ্ব সাম্রাজ্যের জন্য সাগরকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বানিয়ে দিয়েছে। লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূল ইয়ামান ও সৌদি আরবের সাথে সংযুক্ত। যেখানে পশ্চিম উপকূল মিশর, সুদান, ইরিত্রিয়া এবং জিবুতি বন্দরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণে জিবুতি এবং ইয়ামানের মাঝখান দিয়ে লোহিত সাগর ইডেন উপসাগর ও আরব মহাসাগর কিংবা ভারত মহাসাগরে গিয়ে

---

৬৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৪৬২

ইসরাইলের অভিপ্রায়

১৯৭৩ সালের পরাজয়ের পর থেকেই ইসরাইল চেষ্টা করে যাচ্ছে যেকোনোভাবে লোহিত সাগরকে নিজেদের দখলে নিতে। যেহেতু বিশ্বশক্তি আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র। তাই তারা তাদের এই অভিপ্রায়কে গোপন রাখার পরিবর্তে তা ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে।

ইসরাইলি নৌবাহিনী প্রধানের ঘোষণা

ইসরাইলের নৌবাহিনীর পরিচালক 'কাল্সাল্টন' স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, "আমরা এমন নৌযানের মালিক, যা সকল আন্তর্জাতিক বন্দরে রয়েছে।" সে আরও বলেছে, "আগামী দশকে ইসরাইলি নৌবাহিনীর জাহাজগুলো আশানুরূপ সংস্কার করা হবে।" ইসরাইলি নৌবাহিনীর প্রধান বলেছে, "আমাদের জন্য আমাদের নৌবাহিনী ও নৌশক্তিকে শক্তিশালী করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, তা ছাড়া আরব দেশগুলোর ঘেরাও সমাপ্ত করা যাবে না।" সর্বশেষ ইহুদি নৌবাহিনীর কমান্ডার বলেন, সংক্ষেপ কথা হলো, "বর্তমানে আমরা এমন এক অভিপ্রায়ের ওপর চলমান, যার মাধ্যমে একদিন লোহিত সাগর আমাদের অধীনে চলে আসবে। লোহিত সাগরকে ইসরাইলি সাগর বা ইহুদিদের সাগর বলা হবে।"[৬৫]

আমিরাতের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য পত্রিকা আল-ইত্তেহাদ এটাও দাবি করেছে, ইসরাইল আকাবা উপসাগরের তীরে নিজস্ব বন্দর 'ইলাত' থেকে লোহিত সাগরে নৌবাহিনী বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ইসরাইলি নৌবাহিনী তাদের নিরাপত্তার জন্য লোহিত সাগরে টহল বৃদ্ধি করেছে। আর ইসরাইল এ ভয়ও পাচ্ছে, লোহিত সাগরের এত গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র যে সকল বড় বড় দেশগুলোতে অবস্থিত—যেমন : সৌদি আরব, ইয়ামান, মিশর, সুদান ও জর্ডান। এসকল দেশ মূলত ইসলামি দেশ; যারা ইসরাইলবিরোধী—ইসরাইলের ধারণা, এ দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে ইসরাইলের ধারণা মতে, তা কখনো যদি সম্ভব হয়, তাহলে লোহিত সাগরের মাধ্যমে সকল বিশ্বশক্তিকে পরাজিত করতে পারবে।

৬৫. জারিদাতুল ইত্তেহাদ, আমিরাত, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬

ইরিত্রিয়া ও ইসরাইলের সম্পর্ক

আফ্রিকার খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হাবশা যা ইথিওপিয়া নামে প্রসিদ্ধ, আজ পর্যন্ত ইরিত্রিয়ার ওপর ক্ষমতাশীল ছিল। যখন ইরিত্রিয়াবাসী ইথিওপিয়ার সাথে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করল, সে সময় যেহেতু ইরিত্রিয়ার মুসলমানরা এ সংগ্রামে অগ্রগামী ভূমিকায় ছিল, এ জন্য সুদান ও ইয়ামান তাদের এ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে। পরবর্তীতে বিশ্ব শক্তিও ইথিওপিয়াকে লৌহ ভয় দেখিয়ে স্বাধীনতা প্রদানে প্রস্তুত করে ফেলে। কিন্তু মুসলমানদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে স্থানীয় ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হাতে ক্ষমতা সোপর্দ করে দেয়। এটা ১৯৯৩ সালের কথা। বর্তমানে ইরিত্রিয়া ও ইসরাইলের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক আরও গভীর এবং বৃদ্ধি হচ্ছে। উভয় দেশের শাসকদের মধ্যে সাক্ষাতে পারস্পরিক চুক্তি ও সামরিক সহযোগিতার ধারা স্পষ্ট হচ্ছে। যেহেতু ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা ও কাফের সরকার প্রতিষ্ঠা লোহিত সাগরে ইহুদি দখলদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই ইসরাইল তাৎক্ষণিক ইরিত্রিয়াকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য শুরু করে দেয়। খুব দ্রুত ইরিত্রিয়ার সবচেয়ে বড় বন্দর 'মাসু' নামক বন্দর ইসরাইলের দখলে চলে আসে। মিশরের এক আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন জেনারেল তালাত মুসলিম দাবি করেন, মাসুরের ইরিত্রিয়া বন্দরে ৬০০ ইসরাইলের সামরিক উপদেষ্টা ও সামরিক বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান। এছাড়াও জেনারেল তালাত মুসলিমের দাবি অনুযায়ী মিজাইলসজ্জিত ইসরাইলি নৌযান 'ডি-বোর্ড' (D-BOARD) নিয়মতান্ত্রিক নৌযানের অংশ হয়ে গেছে।

লোহিত সাগরে দেহলাক উপদ্বীপ ও ইসরাইল

ইরিত্রিয়ার স্বল্প সংখ্যক নৌবাহিনী লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ উপদ্বীপ দেহলাক উপদ্বীপও ইহুদিদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছে; যেখানে তাদের মজবুত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে।

ইরিত্রিয়া প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টার সাক্ষ্য

ইরিত্রিয়া ও ইসরাইলের সম্পর্ক তো পৃথিবীবাসীর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু লোহিত সাগরে ইসরাইলি দখলদারিত্বের স্বীকারোক্তি স্বয়ং ইরিত্রিয়া প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা 'আবুল কাসেম হাজ হামদ' তার এক সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন—যা তিনি আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক জারিদকে দিয়েছেন। ইরিত্রিয়ার উপদেষ্টাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ইসরাইল কি আফ্রিকা ও সুদান দখলের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে? তখন তার উত্তর ছিল, না। ইসরাইল

এমনটা করতে চায়। কিন্তু পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপ পূর্ণ করার পর ইরিত্রিয়ার এ উচ্চ পদস্থ দায়িত্বশীল বলেন, ইসরাইল এ পর্যন্ত তার প্রথম ধাপ পূর্ণ করেছে। অর্থাৎ জর্ডান ও মিশরকে আরব দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা। যা তারা 'ক্যাম্প ডেবিট' চুক্তির মাধ্যমে পূর্ণ করেছে। দ্বিতীয় ধাপ হলো, আরব উপদ্বীপের অর্থনীতিকে তাদের হাতে নেওয়া। আর তৃতীয় ধাপ হলো, লোহিত সাগরে তাদের পূর্ণ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, বর্তমানে ইসরাইল তার তৃতীয় ধাপ অতিক্রম করছে।[৬৬]

হানিস উপদ্বীপের ওপর ইরিত্রিয়ার দখলদারিত্ব

লোহিত সাগরের দক্ষিণের প্রবেশপথ বাবুল মান্দাবের মাত্র ৩৮ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ইয়ামান সীমান্তের সন্নিকটে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপদ্বীপ অবস্থিত।

১. হানিশে সুগরা

২. হানিশে কুবরা

৩. যু-ওয়াকার

এই উপদ্বীপগুলো সর্বদাই ইয়ামানের অংশ ছিল। এক বছর পূর্বেও ইয়ামানের দখলে ছিল। সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই উপদ্বীপগুলো বাবুল মান্দাবের সন্নিকটে এবং লোহিত সাগরের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে লোহিত সাগরের কোমর বন্দনী আখ্যা দিয়ে থাকেন।

১১ ডিসেম্বর, ৯৬-তে ইরিত্রিয়ার নৌবাহিনীর একটি জাহাজ তার সরকারের পক্ষ থেকে হানিশ উপদ্বীপে বিদ্যমান ইয়ামানি সৈন্যদের—যাদের সংখ্যা ছিল ৫০০ জন—এই উপদ্বীপ খালি করার লিখিত বার্তা পাঠায়। ইয়ামান এবং ইরিত্রিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা ঠিক করেন, বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। কিন্তু ১৫ ডিসেম্বর, ৯৬-এ হঠাৎ করেই ইরিত্রিয়া সেই উপদ্বীপে আক্রমণ করে বসে। ইয়ামানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এই হামলায় ইসরাইলের ৪টি যুদ্ধজাহাজ অংশ নেয়। যার ফলে হানিশে কুবরা উপদ্বীপের কিছু অংশ ইরিত্রিয়ার দখলে চলে যায়। হামলার ফলাফল হলো, ৩ জন ইয়ামানি সৈন্য শহিদ এবং ১৮০ জন গ্রেফতার হয়। সেখানে ইরিত্রিয়ার মাত্র ৬ জন নিহত হয়।

৬৬. কাবায়া দুওয়ালিয়া, সংখ্যা. ৩৭৮, পৃ. ১৪

ইসরাইলি পরিকল্পনায় আমেরিকার সরাসরি অংশগ্রহণ

তারপর ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট 'আবদুল্লাহ সালেহ' এবং ইরিত্রিয়ার প্রেসিডেন্ট 'সাইয়াম আফ্রেকি' এক টেলিফোন আলাপের পরে যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে একমত হয়ে যায়। উভয়ে এটাও নির্ধারণ করে, যুদ্ধ বন্ধের তত্ত্বাবধান করবে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি। কমিটিতে থাকবে উভয় দেশের একজন করে উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং উভয় দেশে বিদ্যমান মার্কিন দূতগণ। মার্কিন দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ বন্ধের সূচনা হয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৬-এর মাঝরাতে। ২৪ ঘণ্টাও যায়নি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত শুধু ইয়ামানকে ধোঁকা দেওয়ায় ব্যস্ত ছিল। পরের রাত ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ হতে ইরিত্রিয়া বাহিনী ইসরাইলি নৌবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ চুক্তি ভঙ্গ করে পুরো উপদ্বীপ দখল করে নেয়।

আরব সংবাদ মাধ্যম ও হানিশ উপদ্বীপ দখল

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭-হতে জর্ডানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'আররায়' সংবাদ দেয়, ইরিত্রিয়া আমেরিকা ও ইসরাইলের সহায়তায় একদিকে সুদানের ইসলামি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত। আর অপরদিকে ইয়ামানের হানিশ উপদ্বীপ দখল করে নিয়েছে। সংবাদ অনুযায়ী এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, ইরিত্রিয়ার সকল কার্যক্রম আমেরিকার ডলার আর ইসরাইলের অস্ত্রের জোরেই হয়েছে।[৬৭]

আরও একটি প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আশ-শারকুল আওতাদ' দাবি করেছে, হানিশ দখলে ইসরাইল জড়িত।[৬৮]

আরও একটি আরবি দৈনিক 'আল-হায়াত' প্রকাশ করেছে, ইরিত্রিয়াকে আমেরিকা ২০ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে।[৬৯]

মিডলিস্ট পলিসির স্বীকারোক্তি

আরও একটি সংবাদপত্র 'মিডলিস্ট পলিসি' মার্কিন প্রফেসর 'জিফরি লিপের্লিয়র'—যিনি মার্কিন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হওয়া

৬৭. রোজ নামা আর-রায়, ১৯.০১.১৯৯৭
৬৮. আশ-শারকুল আওতাদ : ২২.০২,১৯৯৭
৬৯. রোজ নামা আল-হায়াত :২৫.১২.১৯৯৭

ছাড়াও আফ্রিকা মহাদেশের পরিস্থিতির ওপর পি.এইচ. ডি করেছেন—এই স্বীকারোক্তি বর্ণনা করেছেন, ইসরাইলের লোহিত সাগর দখলের পরিকল্পনা রয়েছে। আর এ জন্য ইরিত্রিয়া থেকে ভালো একটি বন্ধু রাষ্ট্র পাওয়া গেছে। ইরিত্রিয়া নিজেও ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে। যাতে আমেরিকা থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়।[৭০]

এসকল তথ্য-প্রমাণ থেকে এ কথা সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট যে, ইরিত্রিয়ার ইয়ামানি উপদ্বীপে আক্রমণ ও দখল লোহিত সাগরের ওপর ইহুদি দখলদারিত্বের পরিকল্পনারই অংশ এবং এসব কিছু বিশ্ব শক্তির ইশারায় বরং নির্দেশেই হচ্ছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্লজ্জতা

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি ইরিত্রিয়া লঙ্ঘন করেছে। তখন আমেরিকার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 'রবার্ট' ইরিত্রিয়ার হামলার নিন্দা পর্যন্ত জানাননি। বরং তিনি বলেছেন, আমেরিকা এই হামলাকে ইরিত্রিয়ার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি মনে করে না।[৭১]

আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জাতিসংঘ

ইয়ামান ও ইরিত্রিয়ার সংঘাতকে মিটানোর জন্য আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করেছে। ইয়ামানের দুর্বল সরকার—যিনি মুসলিম বিশ্বের মৌখিক সমর্থন থেকেও বঞ্চিত। ওআইসির পর্যবেক্ষণ থেকেও ছিলেন হতাশ—এর ওপর তাকে বাধ্য করা হয়েছে, তিনি আন্তর্জাতিক মিত্র শক্তির নির্দেশ এবং সালিশ মেনে নিতে।

আন্তর্জাতিক আদালতে ইনসাফ হত্যা

হানিশ উপদ্বীপের সংঘাত নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের কয়েকটি বৈঠক লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় এবং অবশেষে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আদালত এই রায় দিয়েছে, এই তিন উপদ্বীপ ইয়ামানের নয়; ইরিত্রিয়ার।[৭২]

---

৭০. মিডলিস্ট পলিসি, ১৯৯৬
৭১. কাথায়া দুওয়ালিয়াঃ সংখ্যা-৩১৬
৭২. [প্রাগুক্ত]

কিন্তু ইরিত্রিয়ার মাধ্যমে ইসরাইলি কার্যক্রম এখনো বন্ধ করেনি। ইয়ামান সরকার অপবাদ দিচ্ছে, ইরিত্রিয়ার নৌবাহিনী বর্তমানে বাবুল মান্দাবের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত আরও একটি উপদ্বীপ 'বারিম' অথবা 'মাইউন' দখলের ষড়যন্ত্র করছে। সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, আমেরিকার সাথে ফ্রান্সও ইসরাইলি পরিকল্পনায় শরিক আছে। কেননা তারা পূর্ব থেকেই জিবুতির সবচেয়ে বড় বন্দর দখল করে রেখেছে। এটা ফ্রান্সের নিজেদের দেশের বাইরে সবচে বড় সেনা, নৌ ও বিমান ঘাঁটি।

মিশরীয় উপকূল বুনইয়াসে মার্কিন সৈন্য

মনে রাখতে হবে যে, লোহিত সাগরে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের এটাই প্রথম অনুপ্রবেশ নয়। আমেরিকা সৌদি আরবের উপকূলীয় শহর ইয়াম্বুর বিপরীতে মিশরীয় উপকূল বুনইয়াস বন্দরে বড় একটি সামরিক ঘাঁটি করে রেখেছে; যাতে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী দশ হাজার মার্কিন সৈন্য রয়েছে।

সিনাই উপত্যকা ও সুইজখাল

১৯৬৭ সালে মিশর-ইসরাইল যুদ্ধে ইহুদিরা পুরো ফিলিস্তিনের সাথে সিনাই উপত্যকা ও সুইজখাল দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে মিশরি সৈন্যরা সুইজখাল ও সিনাই উপত্যকা থেকে ইসরাইলি সৈন্যদেরকে মেরে ভাগিয়ে দেয়। মিশরি সৈন্যরা অধিকৃত ফিলিস্তিন পর্যন্ত পৌছে যায়। তখন ইহুদি স্বার্থের জন্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সাথে সাথে হস্তক্ষেপ করে। তারা যুদ্ধ বন্ধ করানোর পরে সিনাই উপত্যকার গোটা এলাকা নিজেদের পর্যবেক্ষণে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন, বৃটিশ, ফ্রাঙ্গিস ও অন্যান্য ইউরোপীয় সৈন্যদের দ্বারা গঠিত শান্তিরক্ষী বাহিনী উক্ত এলাকায় নিয়োগ করে দেয়। সংবাদ মাধ্যম জানায়, বর্তমানে সে এলাকায় মিশরের একটি সৈন্যও নাই। সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ অফিসার এবং সৈন্যই ইহুদি।

ইরিত্রিয়া ও হাবশার অভিশপ্ত বাদশাহ আবরাহা

উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী সুদানের ইসলামি জিহাদি গ্রুপগুলো বার বার মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে যে, হাবশা—যার উপকূলীয় অংশ ইরিত্রিয়া নামে ভিন্ন একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জন্মের ৫৫ দিন পূর্বে আবরাহার নেতৃত্বে বাইতুল্লাহর ওপর আক্রমণ করে। মুসলিম মনীষীদের মতে—হাবশা এবং ইসরাইল

বর্তমানে পুনরায় সেই একই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এ অবস্থায় মুসলিমদের অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া উচিত। কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং তাদের ছড়িয়ে দেয়া ফেতনাসমূহকে খতম করার জন্য কুরআন-হাদিসের প্রদর্শিত পরীক্ষিত পদ্ধতি জিহাদ ও কিতালকে আঁকড়ে ধরে ছোট-বড় সকলকে জিহাদি প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আরব দেশগুলো এবং ইহুদি সৈন্যদের সম্মিলিত সামরিক মহড়া

আমেরিকা তার পশ্চিমা মিত্রদের সাথে মিলে উপসাগরে নিজেদের দখলদারিত্ব ঠিক রাখতে, এখানে নিজেদের উপস্থিতি বৈধ করতে এবং বিভিন্ন সময়ে সৈন্য ও অস্ত্র বৃদ্ধি করার জন্য আরও বাহানা তৈরি করে রেখেছে। সামরিক মহড়া, যুদ্ধ কার্যক্রম ও সামরিক রহস্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এ কথা গোপন নয়, দুই দেশের মাঝে সম্মিলিত সামরিক মহড়ার অর্থ এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? সামরিক মহড়ার মাধ্যমে ভিন্ন দুটি সামরিক শক্তি বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব অনুশীলন। টেকনোলজির আদান-প্রদান ও নিজস্ব সৈন্যদের উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণের মতো লক্ষ্য অর্জন করে। আমেরিকা এবং তার বন্ধু রাষ্ট্র পশ্চিমা দেশসমূহ এসকল বিষয় ছাড়াও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উপসাগরে কখনো কখনো সামরিক মহড়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন অর্থাৎ লোহিত সাগরের পূর্ব ও মধ্যবর্তী স্থানে নিজেদের স্থায়ী উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং এর আড়ালে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্যসমূহকে পূর্ণ করা। এই অনুশীলনকে পূর্ণমাত্রায় চালু রাখার জন্য এই প্রতারক চক্র উপসাগরীয় দেশসমূহের সাথে বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করে রেখেছে; যার অধীনে কাফির সৈন্যদের সাথে এই সম্মিলিত মহড়া চালু থাকে।

১৯৯৬ সালে আমেরিকা সেই চুক্তিসমূহের অধীনে অনেক বড় সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিল। যার নাম দিয়েছিল NAUTILUS। এটা ১০.৭.৯৬ থেকে নিয়ে ৩০.৮.৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ দিন চালু ছিল। এতে ১৩ হাজার সৈন্য অংশ নেয়। যার মধ্যে আমেরিকার মেরিন সেনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মহড়াগুলোতে গোয়েন্দা বিমান, যুদ্ধবিমান ও সামরিক হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়াও এতে বিশাল দানবসদৃশ্য সামরিক নৌযান ও ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে সাজোয়া যান এবং দশহাজার সৈন্য কুয়েতের

উপকূলে অবতরণ করে। বিশেষ করে "আলবাসিয়া" নামক স্থানে এ সকল অস্ত্র ও সৈন্য অবতরণ করেছে।[৭৩]

তারপরে আরব উপদ্বীপে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিমান, নৌ ও সেনাবাহিনীর মহড়া চলতে থাকে। মিশর, ওমান, সোমালিয়া এবং জর্ডান মৌলিকভাবে আমেরিকার সাথে মিলে সামরিক মহড়া করে। এছাড়াও বৃটেন, মিশর ও ওমানের সাথে এবং ইটালী ও ফ্রান্স মিশরের সাথে বিভিন্ন সময় সামরিক মহড়া করে চলেছে। কুয়েতি সৈন্যরা কখনো আমেরিকার সাথে এবং কখনো আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাথে মিলে অসংখ্য মহড়া করেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য যে "বছরের এই দিনগুলো গণনা করাও কঠিন যে দিনগুলো কুয়েতি সৈন্যরা ইহুদি সৈন্যদের সাথে মিলে মহড়া করে।" আরব ভূখণ্ডে আমেরিকার নেতৃত্বে প্রতি দুই বছর পরপর "শাইনিং স্টার" নামক বিমান বাহিনীর সামরিক মহড়া হয়ে থাকে। যাতে মিশর, ওমান ও সোমালিয়ার সৈন্যরা অংশ নিয়ে থাকে। এতে ভারী যুদ্ধসরঞ্জাম ব্যবহারের ওপর একটি বিশেষ মহড়া হয়। যাকে "ল্যান কোবার" নাম দেওয়া হয়েছে। "শাইনিং স্টারের" সাথে সাথে "সমুদ্রের হাওয়া" নামে একটি সামরিক নৌ মহড়া হয়ে থাকে। এটাও প্রতি দুই বছর পরপর হয়। এতে মিশর ও রোম সাগরে বিদ্যমান আমেরিকার ছোট নৌযানগুলো অংশ নিয়ে থাকে। এই মহড়াগুলোর সাথে বিমান বাহিনীর প্রতিরক্ষার ওপর একটি কৃত্রিম মহড়াও হয়ে থাকে, যাকে "সামরুল জাদ" নাম দেওয়া হয়েছে। প্রথম সূচনায় তাতে ওমান, সুদান ও সোমালিয়া অংশ নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সুদান পশ্চিমা দেশগুলোর পরিকল্পনামাফিক কাজে না লাগার কারণে এবং সোমালিয়ায় আমেরিকার দখলদারিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এবং তাদের প্রিয়পাত্র না থাকার কারণে এই মহড়াগুলোতে এখন আর অংশ নেয় না। আমেরিকা ও বৃটেন উপসাগরীয় দেশসমূহের সাথে মিলে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ এ এক বিশেষ সামরিক নৌ মহড়ারও আয়োজন করে। যাতে শুধু সাবমেরিন ব্যবহার করা হয়েছিল। এর কারণ ইরানী সাবমেরিনের মোকাবিলা করা। এই মহড়ার নাম ছিল এক্সার সাইজ গালফ, "EXERCISE GULF"[74]

জর্ডান ও আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক বিশেষ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার অধীনে সম্মিলিতভাবে সামরিক মহড়া করা হবে। এই

---

৭৩. জারিদাতুল হায়াত ১.৮.৯৬

৭৪. কাযায়া দাওলিয়া- অক্টোবর১৯৯৬

মহড়াগুলো ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত চালু আছে। শুধু ১৯৯৬ সালে কিছু অজুহাতে এই ধারাবাহিকতা বন্ধ ছিল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হলো এই, জর্ডান একবার ইসরাইলের সাথে মিলেও সামরিক মহড়া করেছে। ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিবেশী মুসলিম দেশের সাথে এত ঘনিষ্ঠ সামরিক সম্পর্ক মুসলিম বিশ্বের জন্য অনেক দুঃখজনক এবং কুফরি শক্তির জন্য অনেক বেশি আনন্দের।[৭৫]

আমেরিকা ও অন্যান্য উপনিবেশিক শক্তি এসব মহড়া দ্বারা উপসাগরে তাদের অবৈধ দখলদারিত্ব ঠিক রাখা ছাড়াও আরো অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করে থাকে। সেগুলো পরে উল্লেখ করবো। প্রথমে আমরা ধারাবাহিকভাবে উপসাগরীয় দেশসমূহ ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যদের সাথে মিলে বরং তাদের তত্ত্বাবধানে করা মহড়াগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি। এসকল বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত; যা সাথে সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিশর

মিশর, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালির সাথে মিলে ১৯৮৫ সাল থেকে যৌথ সামরিক মহড়ার ধারাবাহিকতা শুরু করেছে। এতে নৌ-বাহিনী, সেনা বাহিনী ও বিমান বাহিনীর সৈন্যরা অংশগ্রহণ করে এবং সব ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার করা হয়।[৭৬]

তারপরে মিশর "শাইনিং স্টার" নামক ভিন্ন মহড়ার ধারাবাহিকতা শুরু করে; যা প্রতি দুই বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়। উপসাগরের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৯৯০-১৯৯১ খ্রি.) এই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৩ সালে পুনরায় পূর্বের চেয়ে আরও অনেক বড় আকারে এই সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ হাজার মার্কিন সৈন্য ও সমপরিমাণ মিশরীয় সৈন্য অংশগ্রহণ করে এবং নৌ, বিমান, ও সেনা তিনও বাহিনী পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে আক্রমণ করা ও প্রতিরক্ষা করার মহড়া করে।[৭৭]

রোম সাগরে মিশরের উপকূলসমূহ ১৯৯৬ সালে এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করেছে। যখন মিশর, ফ্রান্স ও ইটালি মিলে "কুলুপ্তারাই-৯৬"

---

৭৫. কাযায়া দুওয়ালিয়া পৃ. ২২ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৬

৭৬. আত-তাকরিরুল ইসতিরাতিজিল আরাবি : প. ৪৮৪

৭৭. মারকাযু দিরাসাতিস সিয়াসিয়্যাতি ওয়াল ইস্তিরাতিজিয়্যাতি বিল আহরাম- ১৯৯৩, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪

নামক নৌ মহড়া করেছে। এতে ১৩ প্রকারের বিভিন্ন সামরিক নৌযান, সামরিক হেলিকপ্টার, গোয়েন্দা ও যুদ্ধ বিমান অংশ নেয়। এই মহড়া ১১ মে থেকে ১৬মে ১৯৯৬ পর্যন্ত একাধারে ছয়দিন চলেছিল।[৭৮]

কুয়েত

কুয়েতে একবার বিশাল এক সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ১৪টি দেশ অংশ নেয়। যার মধ্যে উপসারীয় আটটি দেশ ছাড়াও আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, এবং ইটালি অংশ নেয়। শেষের তিন দেশ পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নিয়েছিল। এই মহড়ায় সাধারণ সৈন্যদের সাথে সাথে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণও শরিক ছিল। ১৩.৪.১৯৯৬ ইং শুরু হয়ে একাধারে ছয়দিন চালু ছিল। এই মহড়াকে "আল হাসমুন নাহায়ী" উপাধী দেওয়া হয়।[৭৯]

মার্কিন সৈন্যদের সাথে কুয়েতের অসংখ্য বহুমুখী উদ্দেশ্য-সংক্রান্ত সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাশিয়ার সাথেও কুয়েতের একপ্রকার সামরিক চুক্তি ২৯.১১.৯৩ ইং সালে সম্পাদিত হয়। যার অধীনে উভয় দেশ বহুমুখী সামরিক মহড়া করছে। ১৯৯৩-৯৪ইং সালে তারা উভয়ে মিলে এক নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। যা ২৪.১২.৯৩ থেকে নিয়ে ০১.০৩.৯৪ পর্যন্ত চালুছিল।[৮০]

কাতার

কাতারের নৌ ও বিমান বাহিনীর সৈন্যরা ফ্রান্সের সৈন্যদের সাথে মিলে উপসাগরের জলভাগে এক দীর্ঘ সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়; যা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। মার্চ ১৯৯৬ সালের কথা। তারপরে জুন ১৯৯৬ তে তারা মার্কিন সৈন্যদের সাথে একটি মহড়া করে; যাতে আমেরিকার পক্ষ থেকে ৩টি যুদ্ধজাহাজ, ১৫টি বিমান ও হেলিকপ্টার ও ৩০০ সৈন্য অংশ নেয়। এই মহড়া উভয় দেশের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়।[৮১]

---

৭৮. প্রাগুক্ত

৭৯. জারিদাতুল হায়াত ২৮.০৬.১৯৯৭

৮০. জারিদাতুল হায়াত : ২৪.১২.১৯৯৩

৮১. জারিদাতুল হায়াত ২৩.০৬.১৯৯৬

তার পূর্বে আমেরিকা এক বিশেষ সামরিক চুক্তির অধীনে এফ-১৫ ও এফ-১৬ ধরনের ৩৪টি যুদ্ধ বিমান কাতারে পাঠায়। এই বিমানগুলো জুলাই, ১৯৯৬-এর শেষ দিন কাতারের উদ্দেশ্যে মার্কিন ঘাঁটি থেকে উড়াল দেয় এবং আগস্ট ৯৬ সালের শেষ দিন পর্যন্ত কাতারেই অবস্থান করে। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের তথ্য অনুযায়ী এসকল এয়ারফোর্স শক্তি এই অঞ্চলে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল; ওই এয়ারফোর্স শক্তি ছাড়া, যা উপসাগরের মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে পরিপূর্ণভাবে থাকে।[৮২]

জর্ডান

১৯৯৬ সালের এপ্রিলে জর্ডানের "আরযাক" সামরিক ঘাঁটিতে ৩০টি এফ-১৫ ও এফ-১৬ বিমান আমেরিকান বিমান বাহিনীর ২০০০ (দুই হাজার) সৈন্য নিয়ে অবতরণ করে। তাদের আগমন বিমান বাহিনীর সামরিক মহড়ার জন্য ছিল। যা ১৪.০৪.৯৬ হতে শুরু হয়ে ৩০.০৬.৯৬ পর্যন্ত চলে। এ সময়ে মার্কিন বিমান ইরাকের নো-প্লাই (নিষিদ্ধ আকাশসীমা) এরিয়ায় গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করতে থাকে।[৮৩]

৯৬ সালের জুলাইয়েও আমেরিকা ও জর্ডানের সম্মিলিত মহড়া হয়েছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে "মুনলাইট"। এতে আমেরিকার পঞ্চম নৌযানের মেরিনরাও অংশ নেয়। তাছাড়াও আমেরিকার পক্ষ থেকে ৩০টি বিমানও অংশ নিয়েছিল। যেখানে উভয়পক্ষ থেকে ২০০০ (দুই হাজার) সৈন্য এই মহড়ায় অংশ নেয়। পূর্বেই লেখা হয়েছে, জর্ডানে ১৯৯৬ সালের পরে ইসরাইলের সাথে মিলেও একটি সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা এরপূর্বে যার কোনো দৃষ্টান্ত নাই।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সৈন্য ফ্রান্সের সাথে সম্মিলিতভাবে কয়েকটি সামরিক মহড়া করে; যাতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী করা হয়।[৮৪]

---

৮২. পেন্টাগনের মূল বক্তব্যের জন্য দেখুন, আরবি সংবাদপত্র আল হায়াত, মে- ১৯৯৬ সংখ্যা
৮৩. জারিদাতুল হায়াত : ১১ ও ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৬
৮৪. কাযায়া দুওয়ালিয়া- পৃষ্ঠা. ১৮

মুসলিম সৈন্যদের সাথে কাফিরদের সামরিক মহড়া কেন?

পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এক বছর কিংবা ছয় মাস পরপর আরব উপদ্বীপের মরু অঞ্চলে ও উপসাগরের জলভাগে যে সামরিক মহড়া করে, তার উদ্দেশ্য কখনোই তা নয়, যা বন্ধু দেশসমূহের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহড়াগুলোতে হয়ে থাকে। বরং বাস্তবে এই মহড়াগুলোর পেছনে তাদের বিভিন্ন অসৎ উদ্দেশ্য গোপন থাকে। এই প্রতারক-ধোঁকাবাজ সৈন্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিংবা সামরিক তথ্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করা হবে অথবা তাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে। আশ্চর্য! কেউ কি নিজের শত্রুকে শক্তিশালী দেখতে চায়? বিশেষ করে ওই শত্রু, যারা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এবং তাদেরকে অনুগত ও বন্ধু বানিয়ে তাদের সম্পদকে লুটপাট করা হচ্ছে। তাদের যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করা কি কোনো যুক্তিসংগত কথা?

দখলদার উপনিবেশিক শক্তি কখনোই চাইবে না যে, তার প্রতিপক্ষ জাতি নিজের পায়ে দাঁড়াক। ওরা তো সর্বদা তাদেরকে অনুগত ও অক্ষম এবং নিজেদের মুখাপেক্ষী ও অভাবী বানিয়ে রাখতে চায়; যেন তাদের শত্রু নিধন সুদৃঢ় হয় এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে। পাকিস্তানের কথাই ধরুন! আমেরিকা আমাদের থেকে এফ-১৬ বিমানের ক্রয়মূল্য পরিশোধের পরেও বিমান সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও না মূল্য ফেরৎ দিচ্ছে, না বিমান সরবরাহ করছে। সবধরনের চারিত্রিক ও সংবিধানিক বৈধতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান বাধ্য হয়েছে, সেই গচ্ছিত অর্থ সুদী ঋণে এনে স্বীয় ধ্বসে পড়া অর্থনীতি সামাল দিতে।

অপরদিকে বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আমেরিকার মধ্যে ৮০টি এফ-১৬ বিমানক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই ক্রয়-বিক্রয়কে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সামরিক লেনদেন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। এই লেনদেন অর্জনের জন্য ফ্রান্সের মিরাজ ও আমেরিকার এফ-১৬ বিমানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। উভয় দেশই তা অর্জনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিল; কিন্তু অবশেষে ইহুদি বণিকরা মাঠে মারা পড়েছে এবং এই অর্ডার আমেরিকাই পেয়েছে। প্রশ্ন হলো, যেই আমেরিকাকে পাকিস্তান অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা সত্ত্বেও যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই একাধারে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও বিমান সরবরাহ করছে না, সেই আমেরিকা সংযুক্ত আরব

আমিরাতের নিকট সেই একই বিমান বিক্রি করতে এত আগ্রহী কেন? উত্তর খুবই স্পষ্ট। আমিরাত এই বিমানগুলো ক্রয় সত্ত্বেও এগুলোর ব্যবহার, দেখাশোনা ও মেরামতের জন্য আমেরিকার দ্বারস্থ হবে। সুতরাং আমেরিকার কোনো প্রকার আশঙ্কা নেই। যেখানে পাকিস্তানের হাতে এই শক্তি এসে পড়লে তারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে যাবে। আমেরিকা মুখে মুখে লাখো বার নিজেকে পাকিস্তানের বন্ধু বললেও এমনটা একদমই পছন্দ করে না যে, কোন মুসলিম দেশ সামরিক দিক থেকে স্বাধীন ও মজবুত হোক। এ ব্যাপারে তারা না কোনো বন্ধুত্বের তোয়াক্কা করে, না কোনো সমালোচনার তোয়াক্কা করে।

এই মহড়াগুলোর উদ্দেশ্য

উপসাগরে কাফিরদের মুসলমানদের সাথে সামরিক মহড়ার প্রকৃত কারণ এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান করা উচিত—আমেরিকা ও তার মিত্ররা এখানে ঝলসানো গরমের মৌসুম উপভোগ করতে আসে না। না তাদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের সামরিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা বরং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনই তাদেরকে উত্তপ্ত মরু এবং তপ্ত বালিতে কাজে ব্যস্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

১. ওদের প্রথম উদ্দেশ্য, এই অজুহাতে আরব উপদ্বীপে তাদের অশুভ ছায়াকে ঠিক রাখা; যেন ওরা একদিকে মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহকে (ধ্বংস হোক ওরা) তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বীকৃত ইহুদি রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং **"গ্র্যান্ড ইসরাইল"**-এর ইহুদিস্বপ্ন পূর্ণ হয়। অপর দিকে, ওরা এখানের ভূখণ্ডে বিদ্যমান তরল স্বর্ণের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। যার ওপর বর্তমান উন্নত জীবনযাপন নির্ভরশীল এবং যা তাদের ওখানে যৎসামান্যই পাওয়া যায়। মোটকথা, এই মহড়াগুলোর আড়ালে ওরা দীনী এবং দুনিয়াবী উভয়দিক থেকে মুসলিমদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংস করতে চায়। মুসলমান, এখনো কি সতর্ক হবে না?

২. ওদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, মুসলিম সৈন্যদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা এবং তাদের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ও ভালোভাবে অবগত হওয়া। ধূর্ত ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা এই মহড়াগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই ভয়াবহ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে, যে দেশগুলোর সাথে ইসরাইলের যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে, সে দেশগুলোকে বিশেষভাবে এসকল মহড়ায় শরিক করা

হয়; যেন ইহুদি সৈন্যরা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে ভালোভাবে অনুমান করে তাদের সাথে লড়াই করার যোগ্যতা ভালোভাবে অর্জন করতে পারে। বলা হয়ে থাকে, ইসরাইল তার প্রতিবেশী জর্ডানের সাথে মিলে এক সামরিক মহড়া করে। মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শত্রুর একটি মুসলিম দেশের সাথে মিলে সামরিক প্রশিক্ষণ ও বাস্তব প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া বিস্ময়করই বটে। বিবেক ও প্রজ্ঞার চোখ দিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, ইহুদিরা মুসলিমদের এই বোকামির ওপর মনে মনে কতটা হাসছে। তাদের এই অনুভূতিহীনতাও গাফলতের ওপর কী পরিমাণ খুশি ও আনন্দিত হচ্ছে।

৩. তৃতীয় কারণ, এসকল সামরিক মহড়ার মাধ্যমে ওরা মুসলিম সৈন্যদেরকে বিগড়ানোর সহজ পদ্ধতি রপ্ত করছে। মুসলিমদের থেকে জিহাদি চেতনাকে ধ্বংস করা, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদেরকে ভীরু ও আরামপ্রিয় বানানোর জন্য এর চেয়ে অধিক কার্যকরী আর কোন পদ্ধতি নাই যে, তাদেরকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের শিষ্যত্ব ও পরিচর্যায় দিয়ে দেওয়া হবে; যারা তাদের মাঝে চেপে চেপে দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় ঢুকিয়ে দেবে। তাদেরকে জান্নাতের আগ্রহ এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করে দেবে। পাপাচার ও অনাচারে অভ্যস্ত এবং অলস ও অকর্মণ্যতাপ্রিয় বানিয়ে দেবে। সংশ্রবের কার্যকারিতাকে কে অস্বীকার করতে পারে? আর শিষ্যত্ব তো সংশ্রবের চেয়েও অধিক কার্যকর। মুর্দা দুনিয়ার নিকৃষ্ট কুকুর ইহুদি ও ক্রুশের পূজারী খ্রিষ্টানরা নিজেরাও ভীরু, মৃত্যুর প্রতি ভীতু এবং কুরবানী দেওয়া থেকে পলায়নকারী হয়। তাদের এই অশুভ ও নিকৃষ্ট স্বভাব তাদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মুসলিম সৈন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে। তারপর শুধু এর উপরই শেষ নয়; বরং এই 'যোগ্য উস্তাদ' নিকৃষ্ট দোষত্রুটি ও বর্ণনাতীত চারিত্রিক অধঃপতনের শিকার হয়। পশ্চিমা সমাজে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন অপকর্ম কারও নিকট গোপন নয়। তার ওপর বিষয় হলো—ওরা ওদের এই নিকৃষ্ট অভ্যাসগুলো প্রকাশে একটুও কুণ্ঠিত হয় না, লজ্জিতও হয় না। ফলে তাদের নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য ও সাথে থাকা অফিসাররাও তাদের রঙে রঙিন হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এই সংবাদ অনেকবারই এসেছে, মার্কিন সৈন্যদের মাঝে বহু সংখ্যক সৈন্যের একটি গ্রুপ সমকামী পাওয়া গেছে। যখন তাদেরকে বহিষ্কারের প্রস্তাব সামনে আসল; তখন তাদের অধিকার নিয়ে আমেরিকায় দীর্ঘ প্রতিবাদ হয়। যে সৈন্যদের মাঝে এমন নিকৃষ্ট অপরাধী—যা বীরত্বের জন্য হত্যাকারী ও বীরত্ব এবং আত্মসম্মানবোধকে উইপোকার মতো

লেহনকারী—বিশাল এক অংশ পাওয়া যায় এবং যে জাতি তাদেরকে ঘৃণা করা ও তাদের শাস্তি দাবি করার পরিবর্তে তাদেরকে বহাল রাখতে এবং তাদের সহযোগিতা ও আশ্রয়দানের জন্য বিক্ষোভ করে। সেই অপবিত্র জাতির চারিত্রিক অবক্ষয় অধঃপতনের কী অবস্থা হবে? অপবিত্র বস্তু পান করা, অপবিত্র বস্তু খাওয়া এবং হারাম কর্ম সম্পাদনকারী এই ভীরু এবং নিকৃষ্ট জাতি আজ সামরিক কর্মকাণ্ডে মুসলিমদের শিক্ষকে পরিণত হয়েছে। হায় আফসোস!

সিংহ আজ শৃগালের শিষ্য

সেই মুসলমান—যাদের ইতিহাস তাকওয়া ও পবিত্রতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, বাহাদুরী ও পুরুষ্যত্বের বিস্ময়কর ঘটনায় ভরপুর, সেই সিংহ-হৃদয় ও ঈগলের গুণে-গুণান্বিত মুসলমান আজ শৃগালের গুণে-গুণান্বিত ঘৃণিত এক জাতির নিকট যুদ্ধবিদ্যা ও বীরত্বের সবক শিখতে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এ তো এমন হলো, যেমন ঈগলের বাচ্চা মরা-ভক্ষণকারী শকুনের নিকট যাওয়া কিংবা সিংহ সাবক শৃগালের নিকট শিকারের উপড় ঝাঁপ দেওয়া শেখার মতো।

পাকিস্তানী সৈন্যদের সেবা কেন গ্রহণ করা হয় না?

উপসাগরীয় দেশসমূহের শাসকদেরকে কে বোঝাবে যে, যদি নিজেদের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নিজেদের ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশসমূহ এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, তুরস্ক এবং সুদানের সৈন্যদের সাফল্য এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে রয়েছে অত্যন্ত গৌরবময় অতীত। বিশেষভাবে পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের গৌরবময় বর্ণনা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার অক্ষয় কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে সাফল্যের সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত। তারা এই নিকৃষ্ট সময়েও ঈমানী চেতনা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষার এমন চিরন্তন প্রদর্শনী করেছে যার মাধ্যমে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিম মুজাহিদদের স্মরণ তাজা হয়ে যায়।

এদের প্রশিক্ষণব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এতটা উন্নত ও যোগ্য যে, অন্যান্য দেশসমূহের জন্য তার উপমা পেশ করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন তো বটেই। স্বীয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত পেশাদারিত্বপূর্ণ যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সেনাবাহিনীকে বিশ্বে অনন্য ও সফল মনে করা হয়।

আরব দেশসমূহের প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং ভালোবাসাও স্বীকৃত। তারপর ধর্মীয় সম্প্রীতি ও দ্বীনি ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনাও সর্বোচ্চ শিখরে। এসকল অগ্রগণ্যতা থাকতেও তাদের ছেড়ে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, তাদের সাথে বিভিন্ন সামরিক চুক্তি করা, তাদেরকে সামরিক কর্মকাণ্ডের গুরু বানানো—যার দ্বারা ওদের অনেক অর্থনৈতিক উপকারও হয় এবং ইজ্জত-সম্মানও পায়—তা বুঝে না আসার মতো কথা? হাজারো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যাবে, কিন্তু এ কথা বিবেক ও যুক্তির কোনো মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ হয় না। সামান্য বিবেকবান মানুষও একে আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্র আখ্যা দেওয়া ব্যতীত থাকতে পারবে না।

তারপর এই প্রশ্ন জাগে, সামরিক মহড়া ও সামরিক প্রশিক্ষণ তো শত্রুর মোকাবিলার জন্যই করা হয়ে থাকে। যখন এসকল মহড়া ওই শত্রুদের সাথে মিলেই করা হবে, যাদের সাথে কাল মুখোমুখী হতে হবে, তাহলে তাদের স্বার্থই কী থাকবে এবং কার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য হবে? যার সাথে যুদ্ধ হবে, সে তো মিত্র এবং পৃষ্ঠপোষক হয়ে আছে। যার থেকে দীন ও ধর্মের আশঙ্কা রয়েছে তাকে তো উস্তাদের পবিত্র মর্যাদা দান করে রেখেছি। তাহলে এসকল প্রস্তুতি কি জিনদের বিরুদ্ধে নাকি ফেরেশতাদের সাথে মোকাবিলার টনিক? এটা কি সম্ভব যে, নির্লজ্জ ও ধোঁকাবাজ কাফির সৈন্যরা মুসলিমদেরকে ওই সকল ভেদ ও রহস্যের প্রশিক্ষণ দেবে, যা কাল তাদেরই বিরুদ্ধে পরীক্ষা করা হবে? কেউ কি নিজের শত্রুকে সামরিক প্রশিক্ষণ দানে একনিষ্ঠ হয়? যদি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর না-সূচক হয় এবং আল্লাহর কসম অবশ্যই না-সূচকই হবে তাহলে এ কথা সমর্থন করা ছাড়া উপায় নেই যে, এসব কিছু একই সুতায় গাঁথা এবং গভীর ষড়যন্ত্রের অধীনেই হচ্ছে। যার চতুর্পার্শ্বে সকল কুফরি শক্তি শরিক আছে এবং মহাসত্যবাদী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যবাণী অনুযায়ী নিজ নিজ মতবিরোধ ভুলে **'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা'** তথা সকল কুফর এক জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে আছে। সুতরাং হে বিশ্বের মুসলমান, বিবেক খরচ করো। সুযোগ থাকতে সজাগ হয়ে যাও। এমন যেন না হয়, তোমাদের ওপর জমিনকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হলো যে, শেষাবধি কোথাও গিয়ে আশ্রয় মিলল না। এমন সংকীর্ণ ঘাঁটিতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো, যেখান থেকে বের হওয়ার পথ পাওয়া গেল না।

জাজিরাতুল আরব' তথা আরব উপদ্বীপের গুরুত্বের তৃতীয় কারণ' পেট্রোল এবং গ্যাসের ভাণ্ডার

পেছনের লেখাগুলোতে আরব উপদ্বীপের গুরুত্বের দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক দ্বীনি ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। দুই ভৌগলিক অবস্থানের কারণে। এখন তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের গুরুত্বের তৃতীয় কারণ হলো, এখানে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল পাওয়া যাওয়া। আরব উপদ্বীপ পৃথিবীর মোট আবাদির দুই শতাংশ; কিন্তু এখানে প্রাপ্ত পেট্রোলের পরিমাণ গোটা পৃথিবীর পেট্রোল ভাণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ। মার্কিন দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী এই পরিমাণ ৬৬ শতাংশ।

আরব উপদ্বীপের পবিত্র ভূমির তলদেশে প্রবাহিত এই সেই **'তরল সোনা'**। আফসোস! তা যদি মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণে ব্যবহৃত হতো, তাহলে আজ গোটা মুসলিম বিশ্বের চিত্রই পাল্টে যেত। কিন্তু আবিষ্কারের দিন থেকেই কুফরি শক্তিসমূহের মধ্যে এর ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছে।

নিকট অতীতে বিশ্বশক্তিগুলোর মাঝে স্নায়ুযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

অনেক কম লোকই জানে যে, নিকট অতীতে বিশ্বপরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার মাঝে সংঘটিত স্নায়ু যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য ছিল পেট্রোলের এই ভাণ্ডার পর্যন্ত পৌছা। আফগানিস্তানে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ ছিল এই ভাণ্ডার অর্জন করার প্রচেষ্টার সর্বশেষ ধাপ। রাশিয়া যদি মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মতো আফগানিস্তান দখলে সফল হত তাহলে আধা ইরানি, আধা পাকিস্তানী বেলুচিস্তান দখল হত তাদের এই সম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার শেষ পদক্ষেপ; যাতে সফল হলে ওরা হয়ে যেত গোটা পৃথিবীর একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুপার পাওয়ার। এর কারণ দুটি :

প্রথমত, বেলুচিস্তানের উপকূল পৃথিবীর প্রতিরক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। কেননা এখান থেকে সামান্য দূরত্বে সেই আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ যেখান দিয়ে ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, ইয়েমেন, ইরাক, সৌদি আরব, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ও অন্যান্য দেশসমূহের সকল সামুদ্রিক যানবাহন যাতায়াত করে থাকে। যেখানে গোয়াদর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরেই জাইওয়ানি অঞ্চল। যেখান থেকে আব্বাস বন্দরের আলো দেখা যায়।

এই সূক্ষ্ম অবস্থানের কারণে সারা পৃথিবীর প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা গোয়াদরের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। কেননা ওরা জানে, যদি গোয়াদরের উপকূলের ওপর মিজাইল স্থাপন করা যায় তাহলে যেখানে গোটা দুনিয়ার সমুদ্র জাহাজগুলোর যাতায়াত শেষ হয়ে যাবে, সেখানে সমগ্র আরব, সমগ্র মধ্য এশিয়া এবং গোটা পূর্ব দিগন্ত অরক্ষিত হয়ে যাবে। চীন ও ইরানের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর মৃত্যু থেকে এতটুকুই দূরে হবে আঙ্গুল ও বাটনের দূরত্ব যতটুকু। এ জন্যই জাপান, চীন, ইরান, ভারত, আমেরিকা এবং রাশিয়া সকলেই গোয়াদরের ওপর দৃষ্টি রেখেছিল। প্রথমে যার আধিপত্য বিস্তার হবে, সে অর্ধ পৃথিবীরও বেশি করায়ত্ব করে নিল।

পেট্রোল

দ্বিতীয়ত, বেলুচিস্তান যেহেতু আরব উপসাগরের তীরে অবস্থিত; এ জন্য সেখানে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থ হলো, তার উপসাগরে বিদ্যমান পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ পেট্রোলের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়া। বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশসমূহকে তাদের সামনে হাঁটু গাড়তে কয়েক দিনও লাগত না; কারণ, সকলেই জানে যে, বর্তমান পৃথিবীতে পেট্রোল হলো ওই বস্তু, যার ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা ও বেঁচে থাকা নির্ভরশীল। সর্বপ্রকার উন্নতি—চাই ব্যক্তিগত দিক থেকে হোক কিংবা রাজনৈতিক দিক থেকে হোক, শিল্প কর্মের ময়দানে হোক অথবা শিক্ষা ও সাংস্কৃতির ময়দানে হোক—সবকিছুই পেট্রোলের নিকট কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া না কৃষি হয়, না ব্যবসা। না যাতায়াত সম্ভব, না পরিবহন। এই পেট্রোল যদি না হয় তাহলে কোনোভাবেই ফ্যাক্টরিতে কোনো যন্ত্রাংশ তৈরি হবে না। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে জীবনের কোনো শাখা এমন নেই, যা পেট্রোল ব্যতীত একদিনও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন ও জীবনপোকরণ, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ব্যবহার সামগ্রীসহ প্রতিটি বস্তু উৎপাদন থেকে নিয়ে ভোক্তার হাতে পৌছা পর্যন্ত উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পেট্রোলের প্রয়োজন। এটা এমন এক আবে হায়াত বা অমৃতজল যে, যদি তার উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করবে। এসকল গুরুত্বকে বিবেচনায় রাখার পর ওই রিপোর্টগুলো দেখুন, যে রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার পেট্রোলের ভাণ্ডার ২০০০ সালে এবং রাশিয়ার ভাণ্ডার ২০০৩ সালে শেষ হয়ে যাবার কথা এবং ইউরোপের অনেক

দেশ তো এমন রয়েছে, যে দেশে পেট্রোলের একটি ফোঁটাও পাওয়া যায় না; অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, সৌদি আরব যদি বর্তমান পরিমাণের চেয়ে আরও অধিক পরিমাণেও তেল উত্তোলন করে তাহলেও তাদের ভাণ্ডার ১২৫ বছর পর্যন্ত, কুয়েতের ১৪৪ বছর পর্যন্ত, ইরাকের ৯৮ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[৮৫]

এর সাথে এই ব্যবধানটুকুও মনে রাখতে হবে, আমেরিকার খনিতে দৈনিক উৎপাদন হয় মাত্র ১৮ ব্যারেল, যেখানে সৌদি আরবের খনিতে অধিকাংশ সময়ই উৎপাদন হয় ১৮০০ ব্যারেল।[৮৬]

প্রাকৃতিক গ্যাস

পেট্রোলের পরে শক্তি অর্জনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। এ ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা এই মুসলিম ভূখণ্ডকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন। গোটা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬৫ শতাংশই এই ভূখণ্ডে পাওয়া যায়।[৮৭]

যেখানে সাতটি শিল্পোন্নত দেশও পশ্চিম ইউরোপের বাকি সকল দেশের নিকট পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ৫.৫ শতাংশ গ্যাস রয়েছে, যার ভাণ্ডার মাত্র ১০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।[৮৮]

এই সেই কারণ, যে কারণে উপসাগরের অনুর্বর ভূমি পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক উপনিবেশিক শক্তি তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত তরল পদার্থের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা এটা খুব ভালো করেই জানে, যারা এই ভূখণ্ডের ওপর ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে, তারাই গোটা পৃথিবীর সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হতে পারবে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেছিলেন, আরব উপসাগর ও পূর্ব দিগন্তের ওপর ক্ষমতা অর্জনের অর্থ হলো, সমগ্র পৃথিবীর ওপর ক্ষমতা অর্জনের চাবি-কাঠি হাতে এসে যাওয়া।[৮৯]

---

৮৫. মাজাল্লাতুল উসবুয়িল আরাবি-২২.১০.১৯৯০
৮৬. ওআদ-কিসিঞ্জার, ড. সফর বিন আবদুর রহমান আল হাওয়ালী, পৃষ্ঠা-১০
৮৭. ফারুক আহমাদ ইউসুফ মাজাল্লাতুশ শারাকিল আওসাত, আল-কাহেরা জুন-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৭২
৮৮. কাযায়া দুওয়ালিয়া, তাওফিক গানিম-অক্টোবর-১৯৯৬ পৃষ্ঠা-৩৫
৮৯. প্রাগুক্ত

প্রেসিডেন্ট কার্টার একবার তার দুঃখ এবং অক্ষমতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা যদি আরবের পেট্রোলকে সামান্য একটু পশ্চিম দিকে সরিয়ে দিতেন তাহলে আমাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যেত।[৯০]

দ্বিতীয় বাক্যে মার্কিন ইহুদি প্রেসিডেন্ট এই আকাঙ্ক্ষা করছে—আহ, পেট্রোল যদি ওই ভূখণ্ডে হতো, যেখানে মুসলমান নেই। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ক্ষমতা, অর্থাৎ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে।

পেট্রোল আবিষ্কারের ইতিহাস

মুর্দা দুনিয়ার জন্য লালা ঝরানো ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের সেই লালায়িত ইচ্ছা পূরণের জন্য আরব উপদ্বীপের ওপর পূর্ব থেকেই তাদের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আসছে। এর জন্য ওরা কী কী চেষ্টা করেছে, কী পরিমাণ কষ্ট করেছে, কত দীর্ঘ ও পীড়াদায়ক অপেক্ষা করেছে, তার কিছুটা অনুমান করা যায় বর্তমানে প্রকাশিত বাদশাহ আবদুল আজিজের জীবনী থেকে। তাতে পেট্রোল আবিষ্কারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে জীবনীকার যা লিখেছেন এবং যে সকল ছবি সংযুক্ত করেছেন, তা থেকে মার্কিনীদের পরিকল্পনা খুব সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে। আমরা এখানে সেই উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি, যার প্রতিটি লাইনে লাইনে পাঠক ইহুদিদের দূরদৃষ্টি এবং ধোঁকাবাজি ও চালবাজির কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারবেন।

বাদশাহ আবদুল আজিজের জীবনীকার বাহরুল্লাহ হাজারুবি লেখেন, "আল-ইহসা অঞ্চলে পেট্রোল উত্তোলনের সূত্রে যদি কারও প্রশংসা করতে হয়, তাহলে তিনি হলেন স্বয়ং বাদশাহ আবদুল আজিজ আলে-সৌদ। কারণ, এটা একমাত্র তারই কৃতিত্ব যে, তিনি ১৯৩৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া পেট্রোলিয়াম কোম্পানির সাথে তেল উত্তোলনের চুক্তি করেন। আরামকো অয়েল কোম্পানির ডাইরেক্টরের বর্ণনা আমাদের সাথে তেল উত্তোলনের চুক্তি করে ইবনে সৌদ অনেক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। কেননা এটা সেই অঞ্চল, যেখানে কোন অমুসলিম প্রবেশ করেনি। মরুভূমির বুদ্দুদের জন্য কোন কাফিরের সেই এলাকায় পা রাখাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে করা হতো। কিন্তু এই সাহসিকতা একমাত্র বাদশাহ আবদুল আজিজের যে, তিনি শুধু আমাদের সাথে তেল উত্তোলনের চুক্তিই করেননি বরং আমাদেরকে সেই নিরাপত্তা

---

৯০. আত-তাদাখুলুল আসকারি ফি মানাবিউন-নফত, পৃষ্ঠা-১২

দিয়েছেন যা আমরা আমাদের নিজের দেশেও চিন্তা করতে পারতামনা। আমাদের সম্পর্কে আরবদের যে সংশয় ছিল তাও বাস্তবতার আলোকেই ছিল। কেননা সে সময় মুসলিম বিশ্ব ও আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পশ্চিমা কলোনি ছিল।"[৯১]

তেল উত্তোলনের প্রাণান্তকর চেষ্টা সম্পর্কে আরামকো যে ইতিহাস লিখেছে, তার কিছু অংশ :

"তেল অনুসন্ধান শুরু হয় ১৯৩৩ সালে। সেই মার্কিন বিশেষজ্ঞরা যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নিতে এসেছিলেন। তারা লম্বা দাড়ি রেখেছেন এবং লম্বা লম্বা জুব্বা পড়তেন।"[৯২]

বাদশাহ আবদুল আজিজ তার বিশেষ পুলিশের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন, যেন বুদ্দুরা তাদের কোনো ক্ষতি না করতে পারে। সর্বপ্রথম যে স্থানে তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা হয়, সেখানে কিছুই পাওয়া যায়নি। এই কাজের জন্য কেবল যন্ত্রাংশই আমেরিকা থেকে আনা হয়নি; বরং খাদ্য ও পানীয় ছাড়াও সাবান এবং সবধরনের ব্যবহারিক সামগ্রী পর্যন্ত আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে। প্রথমে তিনটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু তেল পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ওরা যে ধরনের জীবনাচারে অভ্যস্ত ছিল, তা এর চেয়ে অনেক কষ্টের ছিল; কিন্তু তথাপিও চেষ্টা অব্যাহত ছিল। মার্কিনীরাও অত্যন্ত মনোবল ও ধৈর্য্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছিল। প্রথম কূপ যে অবস্থায় খনন করা হয়েছে, তার বর্ণনা অনেক কঠিন। মোটকথা, প্রথম কূপে ব্যর্থ হওয়ার পরে দ্বিতীয় কূপ খনন করা হয়, কিন্তু এতেও কোনো লাভ হয়নি। তৃতীয় কূপ খননের সময় ওদের বিশ্বাস ছিল, এবার অবশ্যই কিছু পাওয়া যাবে, সে সময় পর্যন্ত এর ওপর হাজার হাজার ডলার খরচ হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের থাকার জন্য শুরুতে তাঁবু বানানো হয়েছিল। গরমও এমন ছিল, যে গরমে চেহারা ঝলসে যেত। পরে রিয়াদের মাটির ঘরগুলোর মতো ছোট ছোট ঘর বানানো হয়। এই ঘরগুলো পুরোনো স্মৃতি হিসেবে আজও বিদ্যমান।

[৯১]. বাদশাহ আবদুল আজিজ : পৃষ্ঠা-৩৯৭

[৯২]. আরবি পোশাক পরিহিত সেই ধোঁকাবাজ মাকিনীদের ছবি উপরিউক্ত গ্রন্থের ৪০৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে

তৃতীয় কূপ খননের পরে এতটুকু জানা গেছে, তেল তো আছে; কিন্তু পরিমাণ এত অল্প যে, তার জন্য এত পরিশ্রম মোটেও সমীচিন নয়। তেল উত্তোলনকারী কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সন্দেহ হতে লাগল, কিন্তু তারা ধৈর্যের মানসিকতা পোষণ করছিল, যেহেতু তেল অনুসন্ধানকারী দল দীর্ঘদিন অবস্থানের কারণে এখানের আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে গিয়েছিলেন, এ জন্য ভয় পেত না। চতুর্থ কূপ যেখানে খনন করা হয়েছে, তা প্রথম স্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কিন্তু যেই তেলের জন্য এত আশা-ভরসা করা হয়েছে, সেই তেল কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল না। তাই এখন প্রশ্ন তৈরি হলো, 'কোম্পানি কি তাহলে দেওলিয়া ঘোষণা করা হবে?' যা কিছু খরচ হওয়ার, তা তো খরচ হয়েই গেছে। তাই আমেরিকায় কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিদের মিটিং হলো। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত যা লোকসান হয়েছে, তার পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ ডলার। কিন্তু তারপরও ওরা কাজ চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ওরা নতুন করে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠায় এবং কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের সাথে নতুন করে কন্টাক্ট করে এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে দেয়; যেন ওরা কাজ চালু রাখে। এই অবস্থায় পঞ্চম কূপ খননের কাজ শুরু হয়। বিশেষজ্ঞদের নিকট যে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ছিল, তার সবটুকু এতে ঢেলে দেওয়া হয়; কিন্তু এর ফলাফলও একই হলো। তবে ওরা হতাশ হলো না। তারা সিদ্ধান্ত নিল, শেষবারের মতো চূড়ান্ত চেষ্টা করা হবে, তাতে যদি তেল না পাওয়া যায় তাহলে আর কোনো আফসোস থাকবে না। এবার তারা একসাথে দুটি কূপ খননের সিদ্ধান্ত নিল। এ ছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম কূপ। বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও মুহূর্তে মুহূর্তে খবর নিচ্ছিল। ষষ্ঠ কূপ থেকেও কিছুই পাওয়া গেল না। যার ফলে ওদের হতাশা আরও বৃদ্ধি পেল। এমনকি জাহরান ও ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝে এই ধারণা বদ্ধমুল হচ্ছিল, যেকোনো মুহূর্তেই নির্দেশ আসতে পারে—তেল অনুসন্ধান বন্ধ করে ফেরত চলে আসো। হঠাৎ করে জানা গেল, কোম্পানির ডাইরেক্টর জেনারেল নিজেই আসছেন এবং কোম্পানির একাউন্টে আমেরিকা থেকে ডলার প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন সরঞ্জামও রওয়ানা হয়েছে, কিন্তু সপ্তম কূপ এখনো পুরোপুরি খনন শেষ হয়নি। এরই মধ্যে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল, যার ফলে মার্কিনীদের চোখ কপালে উঠে গেল। মাটির নিচ থেকে তেলের ভাণ্ডার উতলে উঠছে এবং এ পরিমাণ তেল বের হচ্ছে, যার ওপর স্বয়ং মার্কিনীরাই আশ্চর্য হয়ে গেলো।

এটা হলো মার্চ ১৯৩৭ সালের কথা। এখন ইতিহাসের নতুন এক যুগ শুরু হয়ে গেল। এই ঘটনা শুধু ক্যালিফোর্নিয়া কোম্পানির জন্যই আশ্চর্যজনক ছিল না, বরং পুরো আরব উপদ্বীপের জন্যই ছিল একটি মুজেযা তথা অত্যাশ্চার্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কূপকে আজও সাত নাম্বার বলে ডাকা হয়। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের শেষ পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলন হয়েছে। কিন্তু কেবল ১৯৩৯ সালেই ৩৯,৩৪,০০০ (উনচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার) ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়। অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরের তুলনায় সাতগুণ বেশি। এই পরিমাণ ১৯৪০ সালে ৫০ লাখ ৫৭ হাজার ব্যারেল এবং ১৯৫৪ সালে তা ২ কোটি ১১ হাজার ব্যারেল পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ পরিমাণ গোটা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে তেল উত্তোলন করা হয়, সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অধিক। ১৯৪৬ সালে ৯৯০ লাখ ৬৬ হাজার ব্যারেল হয়, অর্থাৎ বছরে ৬০ মিলিয়ন ব্যারেল ১৯৪৭ সালে ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ব্যারেল, অর্থাৎ এটা ৯০ মিলিয়ন ব্যারেল হয়ে গেছে। কর্মচারীর সংখ্যা ২০ হাজার হয়ে গেছে। এখান থেকে শুধু তেল নয়, বরং গ্যাসও উত্তোলন হচ্ছে। তারপর শুধু আরামকো কোম্পানিই কর্মরত নয়, বরং অন্যান্য জাপানি, ইটালি, ফ্রান্স ও আরব বিশ্বের কোম্পানিগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৯৩]

উপসাগরের পেট্রোল পর্যন্ত পৌঁছার বিশ্ব ষড়যন্ত্রের ইতিহাস

হেরেমের ভূমির পানি ও ঘাসবিহীন মরুভূমিতে যখন তেলের সন্ধান পাওয়া গেল তখন তা আন্তর্জাতিক সম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মনোযোগ ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানে বিদ্যমান কালো ঝলমলে আবে হায়াত তথা জীবন রসের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বশক্তিসমূহের জোড় প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। বিষয়টি পুরোপুরি বোঝার জন্য আমাদেরকে সামান্য পেছনে গিয়ে নিকট অতীতের ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। না হয় এই আকর্ষণীয় কাহিনির সাথে ইনসাফ হবে না। আজ থেকে আনুমানিক ৭০ বছর পূর্বে কমিউনিজম যখন এক জীবনব্যবস্থা ও মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল এবং তা রাশিয়ার শাসকদের পরাজিত করে রাশিয়ার রাজধানী দখল করে নিল তখন পৃথিবীতে দুটি মতবাদ ছিল, একটি অপরটির

[৯৩]. বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান আল সৌদ, লেখক বাহরুল্লাহ হাজারুবি : পৃষ্ঠা-৩৯৯-৪০৩

প্রতিপক্ষ হয়ে সামনে আসল। এক আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রচলিত পুঁজিবাদী মতবাদ এবং অপরটি হলো রাশিয়া ও কমিউনিস্ট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে প্রচলিত কমিউনিজমের মতবাদ। এই দুই মতবাদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত্ শীতল যুদ্ধ চলে আসছে এবং বইপুস্তক ও লিখনী থেকে শুরু করে তোপ-কামান পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ বাদানুবাদ চলে আসছে। দৈনন্দিন ব্যবহৃত সামগ্রী উৎপাদন থেকে নিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে উভয়ে একে অপরকে হীন করে দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এতে কোনো সন্দেহ নেই, বর্তমানে কমিউনিজমের লাল ভল্লুক আফগান মুজাহিদদের হাতে শোচনীয় এবং শিক্ষণীয় পরাজয় বরণ করে তার ক্ষত চাটায় ব্যস্ত রয়েছে; কিন্তু একটা সময় এমন ছিল, যখন তা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকদের নিদ্রা হারাম করে রেখেছিল।

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সামরিক শক্তি থেকে নিয়ে মহাকাশ শক্তি পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে তার প্রতিপক্ষকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে। কারও অনুগ্রহ মনে রাখার ব্যাপারে পশ্চিমা জাতির স্মৃতি খুবই দুর্বল। অন্যথায় তাদের উচিত ছিল, আফগান মুজাহিদদেরকে নিজেদের অনুগ্রহকারী মনে করে সর্বদা তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল ও কৃতজ্ঞ থাকা। কেননা অবশেষে তারাই এই লাল ভল্লুকদের মুষ্টি ভেঙে এবং দাঁত বের করে তাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে, না হয় সেই দেশসমূহের এতটুকুও সাহস ছিল না এই ঝড়ের মোকাবেলা করার।

কমিউনিজমের প্লাবন

কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন তারা স্বেচ্ছায় গোটা পৃথিবীর অসহায় জনতাকে পুঁজিবাদীদের জুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছে করে। এ উদ্দেশ্যে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরকে আর্থিক এবং সামরিক সহযোগিতা করে। প্রথমে মতবাদের দিক থেকে মানুষকে সমমনা বানিয়েছে, তারপর এই লালবাহিনীর মাধ্যমে লাল বিপ্লব সংঘটিত করেছে। প্রত্যেক দেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী যথপোযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কোথাও কথার ফুলঝুরি দিয়ে ও সাহিত্য-সংস্কৃতি দিয়ে, কোথাও অস্ত্র ও শক্তি দিয়ে। মোটকথা, সারা পৃথিবীতে কমিউনিজম এক মহা প্লাবনের মতো

প্রবেশ করেছিল রাশিয়া তখন ভিয়েতনামকে সম্ভাব্য সবধরনের সহযোগিতা করেছে, যাতে আমেরিকাকে শিক্ষণীয় পরাজয়ের দ্বারা নাজেহাল করে নিমিষেই বাহিরে বের করে দিতে পারে।

উপসাগরে রুশদের আনন্দের কারণ

এর সাথে সাথে ওরা উপসাগরকেও ভুলেনি। আমেরিকার উপসাগরের প্রয়োজন ছিল শুধু পেট্রোলের কারণে, কিন্তু রুশদের উপসাগরে আনন্দের আরও একটি কারণ ছিল। অর্থাৎ গরম পানি পর্যন্ত পৌছা। দুর্ভাগ্য যে, রাশিয়ার নিকট যে জলভাগ ছিল, তা ছিল ঠাণ্ডাপ্রবণ অঞ্চল। যেখানে পুরো বছরই বরফ জমে থাকে কিংবা বরফের দানবসদৃশ টুকরো বর্ষণ হতে থাকে। যার ফলে তাতে জাহাজ চলা সম্ভব ছিল না। এই দুই কারণে ওরা উপসাগরের পানি পর্যন্ত পৌছার জন্য অস্থির ছিল। এ উদ্দেশ্যে ওরা আরব উপদ্বীপে অবস্থিত দেশসমূহে তাদের প্রভাব ও অবস্থান তৈরি করতে শুরু করে এবং এখানেও ওরা আমেরিকা ও তার মিত্রদেরকে হারিয়ে দেয়। একদিকে ওরা ইরাক এবং সিরিয়াকে তাদের সমমনা বানিয়েছে, অপরদিকে ইয়েমেনকে দু-টুকরো করে অর্ধেক ইয়েমেনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়েছে। আরব উপসাগরের ডান দিকে ইরান অবস্থিত। শাহের যুগে ইরান ছিল আমেরিকার সহযোগী। কিন্তু বিপ্লবের পরে আমেরিকার সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত টানাপড়েন হয়ে যায়। বিজ্ঞজনেরা অবশ্যই জানেন, বিপ্লবের পর থেকেই ইরান রাশিয়ার মিত্র। এ বিষয়ের ওপর একাধিক নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বিদ্যমান। ইরানে রাশিয়ার প্রতি নমনীয় এবং আমেরিকাবিরোধী সরকার এসে যাওয়াতে মার্কিনী স্বার্থের সীমাহীন ক্ষতি হয়ে যায়।

মোটকথা, উপসাগরের এদিকে ইরান এবং ওপারে ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনকে নিজেদের মিত্র বানানোর পরে রাশিয়ার জন্য উপসাগরে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের সময় এসে গিয়েছিল। ওরা সফলতার একদম দ্বারপ্রান্তে ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তিনি যখন চান দু-চার ইঞ্চি প্রান্ত বাকি থাকতেই ফাঁস ছিড়ে যায়। রাশিয়া সর্বদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তাদের শেষযুদ্ধ মনে করে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। আফগানিস্তানে লালবিপ্লবকে স্বাগত জানানোর মতো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। এ উদ্দেশ্যে ওরা আফগানিস্তানকে অনেক সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে এবং

অনেক বিশাল বিশাল ব্রিজ-কালভার্ট ও সেতু উত্যাদি বানিয়ে দেয়। সালাং-এর বিশাল মহাসড়ক ও আমু দরিয়ায় অবস্থিত বন্দর সেতু তার জীবন্ত প্রমাণ।[৯৪]

রাশিয়ার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য

আফগানিস্তানের পরে অর্ধ ইরানি বন্দর আব্বাস এবং অর্ধ পাকিস্তানী বেলুচিস্তান গোয়াদর, জাইওয়ানি দখল করা কোনো কঠিন ছিল না। এই সেই জায়গা, যা তাদের দীর্ঘদিনের দখলদারিত্বের চেষ্টা প্রচেষ্টার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ছিল। পূর্বের দুটি প্রবন্ধে বার বার শুনে আসছি, আমেরিকা গোয়াদরে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এতে আমাদের বর্ণনার সত্যায়ন হয়। আমেরিকা মূলত ওই লক্ষ্যকে অর্জন করতে চায়—যা অর্জনের আশা করে রাশিয়া টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রাশিয়া আল্লাহ তা'আলার গায়েবি শক্তি এবং মুসলমানদের জিহাদি চেতনা সম্পর্কে বেখবর ছিল, এ জন্য এই পরিণতি হয়েছে। কিন্তু আমেরিকাও ওদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে ওদের পথেই হাঁটছে এবং ইন শা' আল্লাহ ওদের চেয়ে আরও শোচনীয় ও লাঞ্ছনাকর পরিণতির শিকার হবে। রাশিয়া ১৯৮০ সালকে আফগানিস্তানের ওপর দখলদারিত্ব পূর্ণ করা এবং ১৯৮১ সালকে বেলুচিস্তান দখল করে উপসাগরের পানি পর্যন্ত পৌঁছানোর বছর আখ্যা দিয়েছিল। এ কারণেই ওরা শীনডন্ড-এর বিমানঘাঁটি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও ঘামঝরা প্রবিশ্রম করেছে। কেননা, শীনডন্ড থেকে উড্ডয়নকৃত বিমান উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছতে মাত্র ১৫ মিনিট লাগে।[৯৫]

উল্লিখিত আলোচ্য স্থান সেই বিমানঘাঁটি, যাকে অপরাজেয় মনে করা হতো। আফগান জিহাদে তা বিজয় করা যায়নি। কিন্তু তালেবানরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের ওপর ভরসা করে অল্প কয়েকদিনে নিজেদের শক্তিবলে তা দখল করে নেয়; যা দখল করতে তাদের জীবন ও আর্থিক ক্ষতি ছিল সমপরিমাণ। তালেবান আন্দোলনের সময়ে অনুষ্ঠিত লড়াইসমূহের মধ্যে এটাকে স্মরণীয় লড়াই মনে করা হয়।

বেলুচিস্তানে লাল বিপ্লবের সহযোগী লাল ট্যাংকগুলো অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছিল। সে দিনগুলোতে এখানে খোলামেলাভাবে পাকিস্তান ভাঙা

---

৯৪. তারিখে জিহাদে আফগানিস্তান, ড. এইচ বি খান পৃষ্ঠা-১০১

৯৫. দেখুন ফিল-দিরাতি ইবরাহ, লেখক : শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ. পৃষ্ঠা ১৪৬

ও কমিউনিস্ট বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার কথাবার্তা হতো। ঘরে ঘরে লালপতাকা উড়তে দেখা যেত। অলিতে-গলিতে কমিউনিজমের চর্চা হতো। গোত্রের পর গোত্র ছিল দীনে হকের অস্বীকারকারী এবং নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতায় আসক্ত। রাশিয়ার বিশেষ দিবসগুলো ঈদের দিনের মতো পালন করা হতো। ১৭ ই অক্টোবর লেনিনের বিপ্লব এবং ২৭ শে ডিসেম্বর রাশিয়া আফগানে প্রবেশের দিবস হিসেবে পালন করা হতো। এই দিনগুলোতে বেলুচিস্তান স্টুডেন্ট অর্গানাইজেসনের স্বেচ্ছাসেবকরা লাল জামা ও লাল টুপি পরত। ভবনের ওপর থেকে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে লাল পতাকা ওড়াত।[৯৬]

পাকিস্তানের হিতাকাঙ্ক্ষী সাংবাদিকরা দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদ শিরোনাম লিখতেন : "রাশিয়ার বিরোধিতা করা উচিত নয়। রাশিয়া খুব শীঘ্রই আফগানিস্তান পর্যুদস্ত করে উপসাগরের উপকূলে গিয়ে পৌঁছাবে। তাদের বিরোধিতা ক্রয় করা কেমন বুদ্ধিমানের কাজ?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্বেত ভল্লুকদের ভয়ঙ্কর আগমন, দৃষ্টান্তমূলক ফিরে যাওয়া

মোটকথা, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমানা পর্যন্ত শ্বেত ভল্লুকদের আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ উপকূল দখল অল্প কিছুদিন আগের কথা এবং এখানে দখলের উদ্দেশ্য ছিল, উপকূলকে রাশিয়া দুই দিক থেকে দখলে নেওয়া এবং ওরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার হওয়া। যাদের হাতে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকবে। ওরা যখন চাইবে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে ইচ্ছেমতো ঘুরাতে পারবে। আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশসমূহ আফগানিস্তানে রুশদের অনুপ্রবেশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুব ভালো করেই বুঝত। রুশদের আফগান সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সংবাদ তাদের ওপর বিজলীর মতো অবতরণ করেছে। এই আকস্মিক খবর শুনে তাদের ওপর মূর্ছা জারি হয়ে গিয়েছিল। কেননা এই দেশসমূহের সর্বপ্রকার জাগতিক উন্নতি ও বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল উপসাগরের পেট্রোলের ওপর নির্ভরশীল; যার ওপর ওরা শত ধোঁকা ও চালবাজির মাধ্যমে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। আফগানিস্তানের পর বেলুচিস্তানে রাশিয়া ক্ষমতাশীল হওয়ার অর্থ হলো গোটা পৃথিবীর মূলচাবিকাঠি তাদের হাতে এসে যাওয়া। এমনিভাবে কয়েক দশক ধরে চলে আসা যুদ্ধ, পশ্চিমা গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ পরাজয় এবং শিক্ষামূলক পলায়নের সাথে সমাপ্ত হতো। কেননা উপসাগরের ওপর ক্ষমতাশীল শক্তির

---

৯৬. কাসাস ওয়া আহাদীস, শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ., পৃষ্ঠা-৮২

সাথে যুদ্ধ বাঁধানো কারও জন্যই সম্ভবপর ছিল না। রুশদের আমুদরিয়া পাড়ি দেওয়ার খবর শুনে পশ্চিমা গোষ্ঠীর নিদ্রা চলে গিয়েছিল। তারা তাদের শিক্ষণীয় পরাজয়, পিছু হটা, দাসত্ব ও ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্মুখে দেখতে পাচ্ছিল। এটা ছিল সে যুগ, যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাধা প্রদানকারী শক্তিকে সহযোগিতা করার চিন্তাও করা যেত না। শ্বেত ভল্লুকদের ইতিহাস সকলেরই জানা, এরা কোথাও প্রবেশ করলে সেখান থেকে কখনোই ফিরে আসতো না। তাতারীদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ প্রবাদ যখন তোমাকে বলা হবে, "তাতারীরা পরাজিত হয়েছে, তাহলে তুমি তা বিশ্বাস করো না" রুশদের বেলায়ও তা শতভাগ সত্য ছিল। ওরা আফগানিস্তানের পূর্বে মধ্য এশিয়ার যে ১৭টি দেশ দখল করেছিল, সে দেশগুলো আফগানিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত এবং অস্ত্র ও জনবলের দিক থেকেও অনেক অগ্রসর ছিল। বিবেক ও যুক্তি অনুযায়ী এখন রুশদের পথ রোধ করা এবং ওদেরকে উপসাগরের গরম পানি ও তেল দ্বারা ভরপুর কূপসমূহ পর্যন্ত পৌঁছা থেকে ফিরিয়ে রাখা শুধু কঠিনই নয়; বরং অসম্ভবও ছিল বটে। পশ্চিমা গোষ্ঠী নিঃশ্বাস বন্ধ করে তামাশা দেখছিল। আগামীর চিন্তায়ই ওদের জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এমনকি আফগানীদের ঈমানী শক্তি এবং জিহাদি প্রেরণা অবিশ্বাস্য পন্থা অবলোকন করেছে। তারা আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে কুড়াল আর লাঠি নিয়ে ট্যাংক এবং তোপের মোকাবিলায় যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আকাশ সে আশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করেছে। একদিকে অসহায় আফগান, অপরদিকে বিশ্ব পরাশক্তি। একদিকে অত্যাধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র ও সর্বোচ্চ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য, অপরদিকে সামান্য গুটিকয়েক ভাঙাচোড়া বন্দুক ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সামান্য ব্যক্তিগত শক্তি। কিন্তু ঈমানের শক্তি এবং আসমানি সাহায্যের অবতরণ অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে।

আফগান মুজাহিদরা কেবল এক বছর পর্যন্তই এই লাল তুফানকে পথরুদ্ধ করে রাখেনি; বরং রাশিয়ানদের এমন ধ্বংসাত্মক আঘাত হেনেছে যে, পৃথিবী অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য হয়েছে। ধীরে ধীরে পশ্চিমা গোষ্ঠীর বিশ্বাস হতে শুরু করেছে যে, আফগান মুজাহিদীন এই ঝড়ের গতি পরিবর্তন করতে পারবে। আইএসআই যখন আমেরিকাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, আফগানিরা রাশিয়ানদের দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারবে তখন ওদের জীবনে প্রাণ এসেছে। ওরা উপসাগরে তেল লুটতরাজে শরিক তাদের মিত্র দেশসমূহ ও উপসাগরীয় মুসলিম দেশসমূহকে আফগান মুজাহিদদেরকে সম্ভাব্য সবধরনের সহযোগিতার নির্দেশ দেয়। আরব দেশসমূহে বিদ্যমান হাজার হাজার দাতা

সংস্থা এবং দানশীল শাইখদের পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যক্তিগত দান ছাড়াও আফগান জিহাদের অর্ধেক খরচ সৌদি সরকার বহন করে।[৯৭]

অতীতের সহযোগীরাই আজ বিরোধী

আমেরিকা যখন আফগানদের বিস্ময়কর বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রদর্শনী দেখল,তখন ওদের আশা জাগতে শুরু করল, ওরা উপসাগরের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যন্ত পৌঁছতে রাশিয়াকে প্রতিহত করতে পারবে। ওরা তখন আরব দেশসমূহকে উৎসাহিত করল; যেন তারা নিজেদের মাঝে মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য জিহাদ সম্পর্কে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। ওই সময় সৌদি রেডিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা জিহাদি প্রোগ্রাম প্রচার করত। সংবাদপত্রে মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত সংবাদ রঙিন কালিতে ছাপা হতো। আফগান জিহাদে অংশ নিতে যাওয়া বিমান যাত্রীদেরকে বিমান ভাড়া ৭৫% ছাড় দেওয়া হতো। তাদেরকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হতো। পত্রিকায় তাদের বড় বড় ছবি প্রকাশ করা হতো। সে সময় আমেরিকার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলোও আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করত, কিন্তু তারপরও কারও আফগান জিহাদের বৈধতা ও ফরজিয়্যাত নিয়ে সন্দেহ ছিল না। অথচ আজ যখন গোটা পৃথিবীর কুফরিশক্তি তালেবানদের বিরোধী; তথাপিও মানুষের অন্তরে তালেবানদের জিহাদ সম্পর্কে বহু ধরনের সন্দেহ। কাল যখন আফগানিস্তানে এক কাফির ছিল তখন জিহাদ ফরজ ছিল। আজ পবিত্র হারামাইন শরিফাইনে সব ধরনের দুর্গন্ধময় ও অপবিত্র কাফির একত্রিত হয়েছে, কিন্তু তারপরও জিহাদ জায়েজ নাই। রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইকারী যে সকল মুজাহিদদেরকে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হতো এবং যাতায়াতের খরচাদি পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হতো, আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইকারী সেই মুজাহিদদের ওপরই জীবনোপকরণ সংকীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে। কাল পর্যন্ত ওরা ছিল জাতীয় বীর এবং জাতির জন্য গর্বের ধন আর আজ হয়ে গেছে ওরা সন্ত্রাসী এবং হত্যাযোগ্য অপরাধী। সৌদি আরবের রিয়াদে মার্কিন কমিশন ভবনে যে বিস্ফোরণ হয়েছে, এতে বিনা অপরাধে চার ব্যক্তিকে—যারা আফগান জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন—কোনো প্রমাণাদি ছাড়াই মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। এমনিভাবে হাজার হাজার আরব মুজাহিদ—যারা আফগান জিহাদে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন—আজ

৯৭. শেকাসতে রুস, বিগ্রেডিয়ার মুহাম্মদ ইউসুফ, পৃষ্ঠা-১৫২

সৌদি আরব বা মিশরে কারারুদ্ধ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে সকল উলামায়ে কেরাম ফরজিয়্যাতে জিহাদের ফতোয়া জারি করেছিলেন, তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র মনে করা হতো। আজ আমেরিকার আরব উপদ্বীপে অবস্থানরত ইহুদি-খ্রিষ্টান সৈন্যদের আশঙ্কার ব্যাপারে কোনো আলেমে-দীন যদি কাউকে সামান্য অবহিতও করে তাহলে তাকে নিকৃষ্ট অপরাধী মনে করা হয়। শাইখ সালমান আওদাহ, শাইখ সফর আল হাওয়ালী ও অন্যান্য বড় বড় উলামায়ে কেরাম শুধু এই অপরাধেই কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ যে, তারা কাফির সৈন্যদের প্রকৃত দুরভিসন্ধি সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন।

পশ্চিমা গোষ্ঠীর নিচু মানসিকতা ও অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া

সংক্ষিপ্ত কথা হলো যে, আফগানীদের পরিশ্রম কাজে লেগেছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন শিক্ষণীয়ভাবে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে, যা দেখে বহু কট্টর নাস্তিক এবং মুরতাদও মহান আল্লাহ তা'আলার শক্তির স্বীকারোক্তিদাতা হয়ে গেছে। যে সম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাজয় নামক শব্দটির সাথেই ছিল অপরিচিত, সেই অপরাজেয় শক্তি এমনভাবে টুকরো টুকরো হয়েছে যে, তারা নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে—যে দখলদার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল, 'যেখানে একবার প্রবেশ করে, সেখান থেকে ওরা আর কখনো ফিরে আসে না' সেই ওরাই অসহায় আফগানীদের হাতে এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে যে, শেষাবধি ফেরত যাওয়ার পথ আর খুঁজে পাচ্ছিল না। অবশেষে জেনেভা চুক্তির অন্তরালে নিজেদের লাঞ্ছনাকর প্রত্যাবর্তনের ওপর শত বাহানার পর্দা ঢালতে সক্ষম হয়েছে। রাশিয়ার প্রত্যাবর্তনের পরে পশ্চিমাদের নির্লজ্জচরিত্র এবং হীন মানসিকতার নতুন এক রূপ পৃথিবী অবলোকন করেছে। আফগানীরা এই যুদ্ধে নজিরবিহীন ত্যাগ দিয়েছেন। লাখ লাখ লোক শহিদ হয়েছেন। হাজার হাজার শিশু এতিম হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা হয়েছে। সমগ্র দেশ উজাড় হয়ে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম বিরান হয়ে গেছে। দেশের অর্থনীতি ও উন্নতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে এর প্রকৃত লাভ হয়েছে পশ্চিমাদের। কেননা রাশিয়া তো আফগানিস্তানের পাহাড়ে ওষুধি গাছের শিকড় খুঁজতে আসেনি। ওদের আসল উদ্দেশ্য ছিল উপসাগরের পেট্রোল। সেই পেট্রোল—যার ওপর পশ্চিমাদের বেঁচে থাকা নির্ভরশীল এবং যার

শক্তিতে ওরা আজ তাদের বাহ্যিক ঝলক ঠিক রেখে আসছে। আজ যদি উপসাগরে দ্বিতীয় কোনো বাদশাহ ফয়সাল জন্ম হয়ে যায় এবং বিশ্বের কাফিরদেরকে মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুট করে নিয়ে যেতে নিষেধ করে দেয় তাহলে পশ্চিমারা দু-দিনও নিজের জীবনের গাড়ি চালাতে পারবে না। তাদের সকল আলো নিভে যাবে। তাদের সর্বপ্রকার আলোর ঝিলিক শেষ হয়ে যাবে এবং নামসর্বস্ব উন্নতির ফুল ঝরে যাবে। আফগানরা নিজেদের জীবন দিয়ে এবং ঘরবাড়ি হারিয়ে কমিউনিজমের ধেয়ে আসা তুফানের সামনে সেকান্দরী প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যে ঝড়ের মোকাবিলা সব ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গোটা পশ্চিমারা মিলেও করতে পারেনি। মুজাহিদরা অসহায় অবস্থায় ও খালি হাতে তাদের সামনে শুধু প্রতিবন্ধকতার বাধই দেননি; বরং তাদের গতিই পাল্টে দিয়েছেন। পশ্চিমাদের যদি লজ্জা-শরম, চরিত্র ও বদান্যতা এবং উন্নত মানবিক গুণাবলির সামান্যতম লেশ মাত্রও থাকত তাহলে তারা সারা জীবন আফগানীদের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকত। তাদের নিজেদের অনুগ্রহকারী ও মুক্তিদাতা মনে করত। কিন্তু সভ্যতা ও ভদ্রতার দাবিদার এই জাতি সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করে রাশিয়ার পরাজয়ের পরেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। যতক্ষণ শ্বেত ভল্লুকের মধ্যে প্রাণ ছিল এবং ওদেরকে তাদের ধারালো থাবা ও ভয়ানক চোয়ালের ভয় ছিল, ততদিন ওরা আফগানদের পৃষ্ঠপোষকতা করত, সাহস দিত এবং যখন মুজাহিদরা সেই শ্বেত ভল্লুকের চোয়াল ছিড়ে ও হাত-পা ভেঙে তাকে কর্মফল পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন, তখনই লজ্জা-শরমহীন, দৃষ্টিকটু শ্বেতাঙ্গ চামড়ার নীল চোখবিশিষ্ট নির্দয়, হীন মানসিকতা ও আত্মসম্মান ও আত্মসম্ভ্রমবঞ্চিত পশ্চিমা গোষ্ঠী একদম আজনবি ও অপরিচিত হয়ে গেছে। উচিত তো ছিল, যেই আফগানিস্তান রাশিয়ান রক্তপিপাসু হায়েনাদেরকে উপসাগর পর্যন্ত পৌছতে বাধা প্রদান করে পশ্চিমা গোষ্ঠীকে ওদের মুখাপেক্ষী ও অক্ষম হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে, এই জাতি তার প্রতিদানস্বরূপ আফগানিস্তানে ভবন নির্মাণ করবে, মুহাজিরদের দেখাশোনা এবং শহিদদের বিধবা স্ত্রীদের ও ইয়াতিম বাচ্চাদের পুনর্বাসনের চিন্তাকরবে। কিন্তু এই দুর্ভাগারা শুধু বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের সহযোগিতা থেকেই বিরত থাকেনি; বরং উল্টো আগ্রাসনবাদী রুশদের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে এবং তাদেরকে সহযোগিতা দেওয়া শুরু করেছে। অনুমান করুন, হীনতা ও ইতরামির এর চেয়ে বড় কোনো উপমা কী হতে পারে? যদি এই ইতররা এর মধ্যেই ক্ষ্যান্ত থাকত তা হলেও গনিমত ছিল। এই নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতা

তাদের থেকে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তারা এটাও সহ্য করেনি যে, আফগানিস্তানকে তার নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে। তাহলে যদি তারা তাদের সম্পদ ও খনিজ সম্পদের শক্তিতে কিংবা মুসলিম দেশসমূহের সহযোগিতায় দ্বিতীয়বার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়! তাই তারা তার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা শুরু করল। তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রোপাগান্ডা করতে লাগল। এখানে কোনো স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব করার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করতে লাগল। চেষ্টা করা হয়েছে, জিহাদের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো থেকে ক্ষুদ্র কোনো দলকে এবং দুর্বল নেতাদেরকে ক্ষমতা দিতে; যেন এরা সর্বদা তাদের ইচ্ছার অনুগামী থাকতে বাধ্য হয়।

তালেবানদের আত্মপ্রকাশ এবং বিশ্ব কুফরি শক্তির ষড়যন্ত্রসমূহ

যখন কুফরি ষড়যন্ত্রের কারণে আফগানিস্তানে পুরোপুরিভাবে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা হলো না। অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ল। যে যেখানে পারল সে সেখানে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল। জুলুম-নির্যাতন ব্যাপক হয়ে গেল। টেক্স ও চাঁদাবাজি বেড়ে গেল। কারও জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ছিল না। উচ্চ মূল্য এবং লুটতরাজের কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। বিশ্ব কুফরি শক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া দৃষ্টি গোচর হতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা শহিদদের রক্তের লাজ রক্ষা করে তালেবানদের রূপে আফগান জিহাদের প্রকৃত উত্তরসূরিদের মুক্তিদাতারূপে আত্মপ্রকাশের তাওফিক দিয়েছেন। তাদের মহান প্রচেষ্টা ও নজিরবিহীন ত্যাগের দ্বারা আফগানিস্তানে শান্তি ও ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পেখম মেলতে লাগল। তখন এই ব্যক্তিত্বহীন ও বিশৃংখল জাতি হাত ধুয়ে তাদের পেছনে লেগেছে। ওদের তালেবান আন্দোলনের দ্বারা ইসলামের পুনর্জন্মের আশঙ্কা হতে লাগল। কখনো তাদেরকে চরমপন্থী বলা হয়। কখনো তাদের বিরোধীদের সরাসরি আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করা হয়। কখনো জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের আকৃতিতে ষড়যন্ত্রকারী দল পাঠানো হয়। কখনো সেবা সংস্থার আড়ালে নাস্তিকতা ও অশ্লীলতা ছড়ানোর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কখনো আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়ে ইউরোপে বসবাসকারী স্বাধীনচেতা ও বিপথগামী নাস্তিক নারীদের দিয়ে নারী অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করানো হয়।

মোট কথা, শয়তানের নাড়ি-ভুঁড়ির ন্যায় একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল যা চতুর্দিক থেকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এসব

কিছু করার সময় এই চরিত্রহীন জাতির না আফগানীদের করুণার কথা স্মরণ হয়েছে, না সেদিনের কথা স্বরণ হয়েছে যখন রাশিয়ানদের ভয়ে ওদের নিদ্রা উড়ে গিয়েছিল, না সেই মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ যা তারা দিন-রাত প্রচার করে। আফগান মুজাহিদদের হাতে রাশিয়ার পতনের পর এই শক্তিসমূহ "আমি ছাড়া আর কে?"-এর ফিরআউনী অহংকার ও মানসিক দৈন্যতায় লিপ্ত হয়ে এবং নিজেদের মতো গোটা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে নির্বোধ এবং দুর্বল মনে করে ভাবনাহীনভাবে উভয় হাতে উপসাগরে মওজুদ মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে এবং সে সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে যা সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত এবং অনুকূলে হবে।

সুতরাং যা ইচ্ছে করো!

প্রিয় পাঠক! এই বিবরণ আমি এজন্য লেখিনাই, যে ***যরবে মুমিনের*** কলাম পূর্ণ হবে। আপনাদেরকে এজন্য শোনাইনি যে, আপনাদের বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞান অর্জন হবে। না এই কান্না আমি এজন্য কেঁদেছি যে, আপনারা আপনাদেরকে কুফরের ষড়যন্ত্রের সামনে অসহায় ও নিরুপায় অনুভব করবেন কিংবা হীনমন্যতার শিকার হবেন। বরং আমি এই বিবরণ দ্বারা ইস্রাফিল আ.-এর শিঙ্গার কাজ নিতে চাই। যা মৃত্যুদেরকে জীবন দান করবে। ঘুমন্তদেরকে জাগ্রত করবে। অলসদেরকে নাড়া দেবে। ভুলে যাওয়াদেরকে জিহাদের পথ দেখিয়ে দেবে। আমি এর মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহে লুকিয়ে থাকা ঈমানের সেই অগ্নিস্ফূলিঙ্গকে লেলিহান শিখায় পরিণত করতে চাই যা বহুদিন ধরে অলসতার ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে নিভু-নিভুপ্রায় হয়ে আছে। এই স্ফূলিঙ্গ প্রজ্জ্বলনকারীরাও নিস্তেজ হয়ে গেছে। জিহাদের বয়ানকারীদের কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কোনভাবেই অনুভূতিহীনতার এই ছাই বিদূরিত হচ্ছে না। এই স্ফূলিঙ্গ অগ্নিশিখায় রূপ নিচ্ছে না। আমি চাই এই গ্রন্থের অক্ষরগুলো অক্ষর না হয়ে স্ফূলিঙ্গ হোক। বাক্যগুলো বাক্য না হয়ে আগুন হোক। যে আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে গোটা কুফরি বিশ্বকে তার বেষ্ঠনীতে নিয়ে নিবে। সকল কাফের ও কুফরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। ঝলসিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং আছে কি কেউ যে পবিত্র হারামাইনের এই করুণ আর্তনাদে সাড়া দেবে এবং আল্লাহর ঘরের সংরক্ষণের জন্য নিজের জীবনবাজি রাখবে? প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র রওজার সংরক্ষণের জন্য জীবন ও

সম্পদ উৎসর্গ করবে? আছে কি কেউ যিনি মুসলমানদের উন্নতি ও সফলতার জন্য নিজেদের বানানো পদ্ধতির পরিবর্তে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় জিহাদের ওপর আমল করবে? আছে কি কেউ যিনি কনফারেন্স ও সভা-সেমিনারের পরিবর্তে বাস্তব জিহাদের প্রশিক্ষণ-প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করবে? আছে কি কেউ যিনি নিজের বিলাসিতার খরচসমূহ পরিহার করে মুজাহিদদেরকে হৃদয় উজার করে দান করবে? আছে কি কেউ যিনি অনর্থক কাজ ও পাপাচার পরিহার করে আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার জীবন অবলম্বন করবে? দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস থেকে মুখ ফিরিয়ে জিহাদের ময়দানের দিকে রওয়ানা হবে? এই লেখার প্রথম ও শেষ উদ্দেশ্য এটাই—মুসলমান জিহাদের ভুলে যাওয়া শিক্ষা পুনরায় স্মরণ করবে। কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর- পরিহার করা পথকে পুনরায় আঁকড়ে ধরবে। যখন থেকে এরা ঘোড়ার পিঠ হতে অবতরণ করেছে তখন থেকেই লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছে। যখন থেকে তরবারির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তখন থেকেই অক্ষম ও অসহায় হয়ে গেছে। এই লেখার বার্তা এটাই—মুসলমান অস্ত্রকে ভালোবাসতে শিখবে। জিহাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। তার বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। শাহাদাতের প্রেরণা এবং জান্নাতের আগ্রহ অন্তরে সৃষ্টি করবে। শরীর দিয়ে না হয় তো কলম দিয়ে। কলম দিয়ে সামর্থ্য না হলে যবান দিয়ে। যবান যদি না চলে তাহলে মাল দিয়ে। জিহাদের প্রচার প্রসার ও মুজাহিদদের সেবায় নিজের সামর্থ্যানুযায়ী খরচ করবে। যেন আল্লাহর দীন পুনরায় শক্তিশালী ও বিজয়ী হয়ে যায়। পবিত্র হারামাইনের দিকে অশুভ দৃষ্টি নিবদ্ধকারী কাফিরগোষ্ঠী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুসলমান পুনরায় সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাড়ায় এবং পনঃরায় সম্মানিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদ-কিতালের মতো মহান আমলের তাওফিক দান করুন (আমিন)। আমাদের জীবন ও সম্পদকে এই পথে কবুল করুন (আমিন)। দুনিয়াতে কুফরের ওপর বিজয় এবং আখেরাতে তার দিদার নসিব করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাশ শুহাদাই ওয়াল মুজাহিদিন।

মুসলমানদের সম্পদ দখলের ভয়ঙ্কর ইহুদি পরিকল্পনা

রাশিয়া মুসলমানদের সম্পদ দখল করার জন্য যে দীর্ঘ ও অক্লান্ত ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তাদের শিক্ষণীয় কাহিনী তো শুনলেন। এখন ইহুদিদের কাজের উপকরণ পশ্চিমা শক্তিসমূহের আলোচনা করা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্রসমূহের বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এদিক থেকে অধিক

জরুরি, যে রুশীয় সর্প তো ব্যর্থ এবং অকৃতকার্য হয়ে নিজের গর্তে ঢুকে গেছে। কিন্তু ইয়াহুদিবাদী শক্তির উপকরণ এই পশ্চিমা সর্প একের পর এক আক্রমণ করে আরব উপদ্বীপের পবিত্র ভূমির অভ্যন্তরে পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে। ওরা এর আশেপাশে তাদের বেষ্ঠনীর পরিধি সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং তাদের ছোবল বর্তমানে আশঙ্কাজনকভাবে মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর ফনা বিস্তার করে আছে। এই ভূমিতে পেট্রোল আবিষ্কারের পর থেকেই এই শক্তিসমূহ এর ওপর পাহাড়া বসানো এবং দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তার উল্লেখিত স্তরসমূহ নিম্নরূপ :

উপসাগরের সম্পদের ওপর দখল প্রতিষ্ঠার স্তরসমূহ

১। আরবের ভূমিকে উসমানী খেলাফতের সুদৃঢ় ছায়া থেকে বঞ্চিত করিয়েছে। পৃথিবী জানে যে, হেজাজের ভূমিকে উসমানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার পেছনে সরাসরি দুটি ক্রুসেডার শক্তি কাজ করেছে। বৃটেন আর ফ্রান্স।

২। এই পবিত্র ভূমিকে যা উসমানি খলিফাদের সময় এক অঞ্চল মনে করা হতো এবং এক গভর্নরের অধীনে ছিল। বিশ্ব মুসলিমের সেই একক শক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন দেশে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেন ওরা সামরিক দিক থেকে সর্বদা তাদের মুখাপেক্ষী থাকে। যে দেশ যতো সম্পদশালী তাকে ততো ছোট রাখা হয়েছে, এমন কি কিছু অধিক সম্পদশালী উপসাগরীয় দেশ পাকিস্তানের একটি জেলার সমান।

৩। ওই দেশসমূহের ভবিষ্যত বংশধর-শাসকও তারাই তাদের ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে, যেন এখানে তেলের খনি, কূপ এবং তেল পরিশোধনকারীদের ওপর তাদের পূর্ণ দখল থাকে। এমন কোন শাসক যেন না আসতে পারে, যে তাদের লোভনীয় উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। অনেক আরব রাজপুত্র যিনি বিগত দিনের গভর্নর এবং আজকের শাসক। পশ্চিমা দেশসমূহের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে লালিত-পালিত এবং পশ্চিমা পরিবেশ প্রিয়। তাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আমেরিকা নিয়ে মানসিক দীক্ষা ও ব্রেইনওয়াশ করা হয়ে থাকে।

৪। তাদের প্রসারিত পছন্দের চিন্তা এ পর্যন্ত বেড়েছে, যে তাদের জন্য তেল কোম্পানি ও তার আশপাশে বসবাসের কলোনীর ওপর যথেষ্ট মনে করতে পারেনি। জনগণের উপস্থিতি, তাদের জবর দখলের চাহিদা পূরণের

নিমিত্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। এজন্য তারা বিভিন্ন তালবাহানা করে তাদের সৈন্য বাহিনী এখানে পৌছিয়েছে। কখনো সামরিক সহযোগিতার আড়ালে। কখনো সামরিক মহড়ার বাহানায়। কিন্তু একটু একটু করে তাদের অনুভব হতে লাগল- যেকোন সময় মুসলিম বিশ্বে আমাদের বিরুদ্ধে জাগরণের জোয়ার উঠতে পারে। এজন্য খুব দ্রুত সামরিক দিক থেকে এই ভূখণ্ডকে সুদৃঢ় কব্জায় নেওয়া জরুরি। এই বাহানার সুযোগে সাদ্দামকে তাদের কাজে এসেছে। সে কুয়েত ও সৌদি আরবের ওপর হামলার অজুহাতে ইহুদি সৈন্যদেরকে এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। ফলাফল হলো, অতীতে যে অস্ত্র ব্যবহার করে বাদশাহ ফয়সাল শহিদ রাহিমাহুল্লাহ আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশসমূহকে দিনের বেলাও অন্ধকার দেখিয়েছিলেন। আজ তা পরিপূর্ণভাবে আমেরিকা ও তার মিত্রদের দখলে। তেল উৎপাদন ও শোধনের দানব সদৃশ মার্কিন কোম্পানির গোটা অংক (শেয়ার) ইহুদিদের মালিকানায়। এ সকল কোম্পানি যেখানে মুসলমানদের লুণ্ঠন করছে সেখানেই মার্কিন সংস্কৃতি, ইহুদি নষ্টামী ও উলঙ্গপনা এবং বেলেল্লাপনাও ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ সবকিছু ইহুদি-খ্রিষ্টান শক্তি একদিনে অর্জন করে ফেলেনি। চরম ইহুদি মানসিকতা এর জন্য দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ১৯৭৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জোসেফ সিসকো আরবের পেট্রোল দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তার প্রতিবেদনে যে তিনটি মূলপয়েন্ট উল্লেখ করেছেন। ১৯৯৫ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সেই তিন পয়েন্টের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত বাক্যগুলো দেখুন:- আমাদের জন্য এবং আমাদের ইউরোপীয় বন্ধু ও মিত্রদের অতিরিক্ত প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করার জন্য জরুরি হল, উপসাগরের তিনটি বস্তুকে আমাদের আয়ত্বে রাখা।

১. তেল উৎপাদন। ২. দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ ৩. এবং তার মূল্য।[৯৮]

উপসাগরীয় শাসক, অযোগ্য উত্তরসূরি

যে পশ্চিমা আক্রমণকে প্রতিহত করতে বাদশাহ ফয়সাল রাহিমাহুল্লাহ নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিলেন, তার অযোগ্য উত্তরসূরিরা সেই তুফানকে নিজেরা দাওয়াত দিয়ে এনেছে এবং নিজেদের জীবন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান

---

৯৮. কাযায়াল খালিজুল আরাবী, সিলসিলাতু দিরাসাতিল ইস্তেবাজিয়াতু বৈরুত, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

সবকিছু তাদের পদতলে সোপর্দ করে দিয়েছেন। বাদশাহ ফয়সাল শহিদ রাহিমাহুল্লাহ-কে কেবল এই অপরাধেই শহিদ করা হয়েছিল- তিনি অপবিত্র মার্কিনীদের কাজে ব্যবহার হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইহুদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে বলেছিলেন,"যদি আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের এই তেলের ভাণ্ডার পর্যন্ত পৌছতে প্রতিহত করতে পারব না; তখন প্রয়োজনে আমরা আমাদের এই কূপগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেব এবং নিজেদের পূর্বসূরিদের খেজুর আর দুধওয়ালা জীবনে ফিরে যাব।" শহিদ বাদশাহ লাঞ্ছনার জীবনের ওপর ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এই অপবিত্র মার্কিনীদের সামনে নত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার অযোগ্য উত্তরসূরিরা তার প্রতিষ্ঠিত আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী হতে পারেনি। এরা ইহুদিবাদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকেই নিজেদের এবং নিজেদের ক্ষমতার জন্য নিরাপদ মনে করেছেন। তাদের কাপুরুষতা ও হীনমন্যতার ফলাফল হলো, সেই সম্পদ যা আল্লাহ তা'আলা বিপুল পরিমাণে মুসলমানদের দান করেছেন। যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে গোটা মুসলিম বিশ্বের চেহারাই পাল্টে যেত। অনেক মুসলিম দেশের বাৎসরিক বাজেটই সৌদি আরবের মাত্র কয়েকদিনের তেল উৎপাদনের খরচের সমপরিমান। এমন সম্পদকে অপবিত্র ইহুদিরা 'মালে-মুফত দিলে বে-রহম" (বিনাশ্রমে অর্জিত মাল ও নির্দয় অন্তর) মনে করে একত্র করে করে নিজদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে।

মুসলমানদের সরলতা ও কাফিরদের প্রতারণা

প্রতারণার শেষ সীমা হলো এই, সেই লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে মুসলিম দেশগুলোকে অপমানজনক শর্তে সূদের ওপর ঋণ দেওয়া হয়। মুসলমানদের এই সরলতা ও নির্বুদ্ধিতার ওপর যদি আকাশ কান্না শুরু করে তাহলে তার অশ্রু শেষ হয়ে যাবে। এর চেয়ে অধিক দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, এক ভাই দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কারণে বেদনার্ত অবস্থায় আছে। পাশেই তার সম্পদশালী ভাই তার চিৎকার ও আহাজারিতে কর্ণপাতও করবে না। এই দুই জনেরই চিরশত্রু এদের মধ্য থেকে একজনকে লুণ্ঠন করে দ্বিতীয় জন থেকে তার দীন ও ঈমান হরণ করে সেই লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে তাকে ভিক্ষা দেয়। যেখানে কাফিররা মুসলমানদেরকে লুণ্ঠন করতে কুণ্ঠিত হয়নি সেখানে মুসলমানও নিজের ধ্বংস ও লাঞ্ছনার সরঞ্জাম নিজেরাই নিজের হাতে তুলে নিতে কারও থেকে পিছিয়ে নেই। আমেরিকা ও ইউরোপীয়ান

দেশসমূহের ব্যাংকগুলোতে মুসলমানদের আটশত (৮০০) বিলিয়ন ডলার জমা রয়েছে। অথচ আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা মুসলিম বিশ্বকে দেওয়া ঋণের মোট পরিমাণ ৬১৯ বিলিয়ন ডলার। সকল ঋণ আদায় করে দিলেও মুসলমানদের ১৮১ বিলিয়ন ডলার তাদের নিকট পড়ে আছে।

এই সেই সৌদি আরব, যে মুসলিম দেশসমূহের হজযাত্রী ও জিয়ারতকারীদের সাথে অত্যন্ত অপমানজক আচরণ করে থাকে। দুর্গন্ধময় ইহুদিদের সামনে ঝুঁকে পড়ে থাকে। আল্লাহর ঘর জিয়ারতের নিয়তে আগমনকারী সম্মানের যোগ্য মনে করা হয় না। তাদেরকে দীর্ঘ লম্বা লাইন দিয়ে নিজের সৎচরিত্রের প্রমাণ দিতে হয়। আর হিংসুক ইহুদি তাদের সামনে দিয়ে কোন বাধা-বিগ্ন ছাড়াই বুক ফুলিয়ে অতিক্রম করে চলে যায়। এই দুর্ভাগাদের দেখতেই সৌদি কর্মকর্তাদের চেহারার ভাজদূর হয়ে যায় এবং কুঞ্চিত হওয়া ঠোঁটের ওপর চাটুকারীতার মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারগুলো দেখতেই কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায়। কলিজা টুকুরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু এই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক কাণ্ড-কারখানা এখনো চলছেই।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুলুম

জুলুমের শেষ হলো এই, পৃথিবীতে সকল বস্তুর দাম দিন অতিক্রম করার সাথে সাথে বাড়ে। শুধুমাত্র সৌদি আরবের পেট্রোল ব্যতীত। ১৯৭৫ সালে প্রতি ব্যারেল প্রেট্রোলের দাম ছিল ৪৫ ডলার। ১৯৯৮ সালে হয়েছে প্রতি ব্যারেল ১৫ ডলার। ধূর্ত ও প্রতারক ইহুদিরা এমন চাল চেলেছে যে, এর দাম বৃদ্ধির উল্টো আরও হ্রাস পাচ্ছে। ওরা তেল উৎপাদনকারী আরব দেশসমূহের একটি সংগঠন বানিয়ে প্রত্যেক দেশের একটি কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রত্যেক দেশ বাধ্য যে তারা এই নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অধিক তেল উত্তোলন করতে পারবে না। যেন তেলের মজুদ বৃদ্ধি হয়ে তার দাম বৃদ্ধি হতে না পারে এবং ওরা অধিক মূল্য পরিশোধ করতে না হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন মুদ্রাস্ফীতির কারণে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে তখন ওরা কোন এক দেশকে দিয়ে অধিক পরিমাণে উত্তোলন করিয়ে মজুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। চাহিদার চেয়ে মজুদ বেশি হওয়ার কারণে দাম আবার হ্রাস হয়ে যায়। এই কানামাছি খেলার দ্বারা ওরা আজ পর্যন্ত নিজেদের মন মতো মূল্য নির্ধারণ করে রেখেছে। উপসাগরের পেট্রোলের উত্তলোন ও মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি বৃহৎ বিশ্বশক্তির ঐকমত্যের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন।[৯৯]

শুধুমাত্র সৌদি আরবেই দৈনিক দশ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলন হয়। যদি হিসাব করা হয় তাহলে মুসলমান দৈনিক কয়েক কোটি ডলার লোকসান করছে। এই ভয়াবহ ধোঁকাবাজির মাধ্যমে দুই হাতে মুসলিম উম্মাহর সম্পদ লুণ্ঠন করে সে সম্পদ আবার তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হচ্ছে। অতঃপর শুধু এতটুকুতেও শেষ নয়। ওদের ধূর্ত মানসিকতা ও দুষ্ট চরিত্র ওদেরকে এই অন্যায়ের ওপরই ক্ষ্যান্ত হতে দেয়নি বরং এই নামেমাত্র মূল্যও ওরা নগদ পরিশোধের পরিবর্তে ওদের নিরাপত্তা কার্যক্রমের প্রতিদান হিসাবে উসুল করে নেয়। কেননা এটা তো তাদের নিঃস্বার্থ সেবার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকেরই একটি অংক। তারপর অধিক পরিমাণে পেট্রোল বিনা পরিশ্রমে হাতিয়ে নেওয়ার পরে ওরা ওদের সৈন্যদের ভাতা নগদ আদায় করে নেয়।

হায় আফসোস!

আফসোস হে মুসলমান! এখনো কি তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ও সচেতন বলবে? একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় তোমরা কতটা বুদ্ধিমান ও সতর্ক? নিজের মুসলিম ভাইদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে দেখানোর জন্য তোমরা কি-না করে থাকো? তোমাদের কি হলো, যে তোমরা শুধু কুফরের বিরুদ্ধেই বোকা, কাপুরুষ এবং নির্বোধ হয়ে যাও। কোন সে ধোঁকা আছে, যা কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি? কোন সে চাল আছে যা ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে চালেনি? তোমরা এগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য না তোমাদের আত্মসম্মান জাগে, না তোমাদের ঈমানী শক্তির মধ্যে ঢেউ উঠে। তোমাদের সকল পরিকল্পনা, সকল শক্তি ও সামর্থ্য কি কেবল পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য? তোমাদের শক্তি নিজের মুসলিম ভাইয়ের কণ্ঠরোধ করার জন্য উৎসর্গিত? এখনো সময় আছে আল্লাহর বান্দাগণ! এখনো সময় আছে, যা হয়েছে তা থেকে খালেস তাওবা করো। ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণ সংশোধন করো। জিহাদের পথ অবলম্বন করো। দুনিয়ার মুহাব্বতের পিছু ছেড়ে মৃত্যুকে মুহাব্বত করতে শেখ।

৯৯. ড. হোসাইন লিখিত আনফযুল আরাবী ওয়ান নিযামুল আলামীল জাদীদ, প্রকাশনায়- আফাকে আরাবিয়া বাগদাদ মে-১৯৯২ইং পৃষ্ঠা-৫৬

শাহাদাতের কামনা ও জান্নাতের আকঙ্ক্ষা অন্তরে স্থান দাও। তাওবাকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমতের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত। নির্বোধ, মাতাল তার করুণার উপযুক্ত হতে পারে না। অলসতার জীবন ত্যাগ করো। আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও প্রতিশোধকে ভয় করো। অবকাশের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। যদি তা থেকে উপকৃত না হও তাহলে- তোমাদের ইতিহাসও কিন্তু ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাবে না।

বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘটনা

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতিষ্ঠা করা আন্দোলনসমূহ ও সংগঠনসমূহ নিকট অতীতে যে গোলটি খেলেছে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে সকল ষযড়যন্ত্র করেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ তো আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নাই। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে বিগত শতাব্দীতে সংঘটিত তিনটি ঘটনা এমন যা অত্যন্ত রক্তঝরা ও দুঃখজনক। এগুলো উল্লেখ করা ব্যতীত এই বিষয়টি পূর্ণতা পাবে না।

বিগত একশত বছরে মুসলিম বিশ্বে ৩টি এমন ঘটনা ঘটেছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অস্বাভাবিক ছিল। ঘটনাগুলো ইতিহাস ও ধর্মীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। উসমানী খেলাফতের পতন

ইসলামি ইতিহাসের অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, যা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অনেক বিজ্ঞজনদের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুশোকের পরে উম্মাহর মাঝে সংঘটিত সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯২৩ সালে সংঘটিত হয় সে ঘটনা। আর তা হলো উসমানী খেলাফতের পতন। ছোটখাটো খেলাফত চাই তা যেমনই ছিল। তার পতন মুসলিম জাতির ইতিহাসের অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা যা এই শতাব্দীতে সংগঠিত হয়েছে। এদিক থেকে আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগা— আমাদের যুগেই এই দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। তার পূর্বে একবার খেলাফত কিছুটা আশঙ্কায় পড়েছিল। কিন্তু খেলাফতের সকল শৃংঙ্খলা অক্ষুন্ন ছিল। খলিফা ছিল না, আনুমানিক অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা ও মুসলিম সামাজিকতা চালু এবং বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সামাজিকতার প্রতিষ্ঠিত শক্তি অতীতে এতই বহাল ছিল এবং বাস্তবে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। কিন্তু এবার জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব এবং মুসলমানদের ঐক্য ও কেন্দ্রীয় প্রতীক এ সকল ব্যবস্থাপনাই এলেমোলো হয়ে

গেছে। মুসলমানদের মাথা থেকে এই ছায়াকে এমনভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আজকের নতুন প্রজন্ম তো এর নাম, গুরুত্ব ও সৌভাগ্য এবং উপকারিতা সম্পর্কেই অপরিচিত।

২। প্রথম কিবলা হাতছাড়া হওয়া

ইসলামি ইতিহাসের দ্বিতীয় বেদনাদায়ক ঘটনা, যা এই শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছে। আর তা হলো প্রথম কিবলা মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়া। স্মরণ করুন! উমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর যুগে যখন জেরুজালেম মুসলমানদের হাতে আসল তখন এক চুক্তিনামা লেখা হয়েছিল। তাতে হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কিছু কথা নির্দিষ্ট করে দেন এবং জাতিসমূহের ধারাবাহিকতায় কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই চুক্তিনামার গুরুত্ব যেমন ঐতিহাসিকভাবে রয়েছে তেমনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও রয়েছে অনেক গুরুত্ব। হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু কুরআন ও সুন্নাহর যে জ্ঞান রাখতেন, ইসলামের যে পরিচয় তাঁর অর্জন হয়েছিল এবং ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপত্তার বিষয়ে তার মেধা যেভাবে কাজ করত তার অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ এই চুক্তিনামায় হয়েছে। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তিনি লিখেছেন: 'ইলায় একজন ইহুদিও থাকবেনা'।[১০০]

খেলাফতে রাশেদার পরে বারোশত খ্রিষ্টাব্দে এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসে কিন্তু এই চুক্তিনামা ধ্বংস হয়নি। হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর লিখিত চুক্তিপত্র এবং বাইতুল মুকাদ্দাস সংক্রান্ত খেলাফতে রাশেদার নীতিমালা ধ্বংস হয় এই শতাব্দীতে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে জোড়পূর্বক ইসরাইল নামক এক রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ হয় এবং এই জারজ রাষ্ট্রের মাধ্যমে ১৯৬৭ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের চারিদিকে এমন সরকার নিযুক্ত করা হয়েছে যারা একটু একটু করে ইসরাইলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। তার কিছুটা বিবরণ আপনারা যরবে মুমিনের বিগত সংখ্যাগুলোতে পড়েছেন।

---

১০০. তারিখে আবারী

৩। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব উপদ্বীপে আগমন

ইসলামি ইতিহাসের তৃতীয় বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে ১৯৯১ সালে। এই ঘটনা ছিল ফারুকী যুগের পরে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা পুনরায় হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে ফেরত আসা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদিস, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান,"তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে বের করে দাও।"[১০১]

এই হাদিসে অসিয়তকৃত নির্দেশ হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু পালন করেছেন। ঐ যুগের পরে মুসলিম জাতির ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্পূর্ণ প্রভাব প্রতিপত্তি ও বিজয়ের সাথে পুনরায় আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করেছে। এর বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ বিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

তিনওটি ঘটনা একই সুতোয় গাঁথা

এ সকল ঘটনা অর্থাৎ উসমানী খেলাফতের পতন, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বাইতুল মুকাদ্দাস ও প্রথম কিবলা মুসলিমদের হাতছাড়া হওয়া এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব উপদ্বীপে ফিরে আসা। দৃশ্যত পৃথক পৃথক বিবরণ ও দুর্ঘটনা মনে হলেও বাস্তবে এগুলো একই জিঞ্জিরের কড়া। এগুলোতে একই মানসিকতা কাজ করেছে। এটা একই কর্মকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ফল। এখানে আপনাদের সামনে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা থেকে উপরোক্ত ঘটনাগুলোর পরস্পর সম্পর্ক খুব ভালোভাবে বুঝে আসবে। উসমানী খেলাফতের শেষের দিকে খলিফাতুল মুসলিমিন সুলতান আবদুল হামিদ খানের শাসনামলে ক্রুসেডার ইহুদিদের এক প্রতিনিধি দল তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। এটা উনিশতম শতাব্দীর শেষ দিকেরকথা। সে সময় উসমানী খেলাফত পশ্চিমা শক্তিসমূহের মোকাবেলায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তাদের অর্থনৈতিক খুবই দুরবস্থা ছিল এবং খেলাফত ঋণগ্রস্ত ছিল। ইয়াহুদি প্রতিনিধিদল তাকে বলল, "আপনি যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের অঞ্চল এবং ফিলিস্তিন আমাদেরকে দিয়ে দেন যেন ইহুদিরা সেখানে বসবাস করতে পারে, তাহলে আমরা ইহুদিরা উসমানী খেলাফতের সকল ঋণ পরিশোধ করে দেবো এবং অতিরিক্ত আরো কয়েক টন স্বর্ণ দেবো"। তখন সুলতান আবদুল হামিদ

[১০১]. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৬৭

খান দীনী আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মচেতনার প্রমাণ দিয়ে যা তুর্কীদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য—এমন এক জবাব দিয়েছিলেন, যা ইতিহাস কখনো ভুলবে না। সুলতান নিজের পায়ের আঙ্গুল দিয়ে ভূমি থেকে সামান্য মাটি উঠিয়ে বললেন, যদি এসকল সম্পদ দিয়ে তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের এতটুকু মাটিও চাও তাও আমি দেব না।

এই ইহুদি প্রতিনিধিদলের প্রধান এক তুর্কী ইহুদি যার নাম আফেন্দী। সে এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। এর কয়েক বছর পরই যে ব্যক্তি মোস্তফা কামাল পাশার পক্ষ থেকে খেলাফতের পতনের আদেশনামা নিয়ে খলিফার নিকট গিয়েছিল সে আর কেউ নয়; সে ব্যক্তিও ঐ আফেন্দীই ছিল।

কবির ভাষায়:

"বিদীর্ণ করে দিয়েছে তুরস্কের বোকারা
খেলাফতের চাদর নিজেদের সরলতা দেখো,
অন্যদের ধোঁকাবাজিও দেখো।"

এখানে এই ঘটনা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেন পাঠকের ভালোভাবে বুঝে আসে যে উসমানী খেলাফতের পতন, ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ইহুদিদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখল এবং ইরাকিদের থেকে কুয়েতকে খালি করার অজুহাতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আরব উপদ্বীপে ফিরে আসা, পৃথক কোন ঘটনা নয় বরং একই ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন স্তর।

এই ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা কি সম্ভব?

এখানে এসে একটি প্রশ্ন জাগে, ইহুদিদের এমন গভীর এবং বিশাল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলার কোন সম্ভবনাও কি আছে? যদি থাকে তাহলে তার কর্মপদ্ধতি কী? তার জবাব হলো, ইহুদিদের ষড়যন্ত্র নিঃসন্দেহে গভীর এবং বিশাল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহ এর মোকাবেলার পূর্ণ সামর্থ্য রাখেন। তাদের মূল শক্তি হল, এই উম্মাহ কুরআন ও সুন্নাহর ধারক-বাহক এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও কেয়ামত পর্যন্ত মানব ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে কুরআন ও সুন্নাহ তাদের পথ প্রদর্শন ও তাদের সামনে আসা সকল সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট।

কুরআনে কারিম ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাদিসসমূহে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বনি ইসরাইলের আলোচনা রয়েছে এবং এ সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অনেক উপদেশ রয়েছে।

... জানা যায়, ইহুদি ও তাদের মিত্রদের সাথে ... ও মুসলমানদের লড়াই অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী, আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের নিকট কুরআন ও হাদিসরূপে ইহুদিদের ইতিহাস, মানসিকতা ও তাদের আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বিদ্যমান।

যেমন কুরআনে কারিমের সুরা জুম'আয় বলা হয়েছে, "ইহুদিরা মৃত্যুকে ভয় করে। ওরা মরতে চায়না।" কুরআনের একথা কতটুকু সত্য তা আজ আমরা নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ইসরাইল সরকার এবং সকল ইহুদিদের অন্তরের ভয় মূলত মৃত্যুর ভয়। কোটি কোটি ডলার লোকসানে তাদের চেহারায় কোন ভাজ পড়েনা। কিন্তু একজন ইহুদির মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর ভয় তাদেরকে অস্থির করে তোলে। তাদের নিদ্রা উড়ে যায়। ওরা নিজের মাথার ওপর ঝুলে থাকা মৃত্যুর তরবারিকে এমনভাবে দেখে যেমনিভাবে অন্ধ মহিষ কসাইকে দেখে। তার বিপরীত মুসলমান মৃত্যুকে তাদের মা'বুদ ও মাহবুবের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যম মনে করে। বিশেষ করে শাহাদাতের মৃত্যু তাদের নিকট সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বড় দামী উপহার এবং সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাদের নিকট এরচেয়ে বড় কোন গর্বের বস্তু নাই এবং এরচেয়ে উপরে ইজ্জত ও সম্মানের কোন দরজা নাই। এরই খোঁজে তারা জীবন হাতের তালুতে নিয়ে রণাঙ্গনের মাটি অনুসন্ধান করে। তা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে, ওরা ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে উদগ্রীব থাকে। এটাই সেই পবিত্র মহান প্রেরণা যার মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের সফল মোকাবেলা করা সম্ভব। ইহুদিরাও একথাটা খুব ভালো করেই জানে। আর এজন্যই ওরা মুসলমানদের সেই আন্দোলনসমূহ ও সংগঠনসমূহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এবং তাদেরকে জীবিত থাকার অনুমতি দিতেও প্রস্তুত নয়, যারা উম্মতকে বিশুদ্ধ জিহাদ তথা কিতাল-ফি সাবিলিল্লাহর দাওয়াত দেয়।

আমাদের পূর্বসূরিরা ইসরাইল-সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো কেন একত্রিত করেছেন?

আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা যায়। আর তা হলো, তারা বনি ইসরাইল সংক্রান্ত প্রতিটি কথা, চাই তা যে ধরনেরই হোক, একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে তাদের এই অবচেতনের কারণ কী? অত্যন্ত আফসোসের কথা—বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশেষ করে যখন থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছে, বর্ণনাসমূহের এই সম্পদকে

সমালোচনার লক্ষ্য বানানো হচ্ছে এবং এমনটি করার মধ্যে অনেক বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিও শামিল।

প্রশ্ন হলো, এই যে আমাদের পূর্বসূরিরা, যাদের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই। কেননা ইসলামের সকল সম্পদ তাদের মাধ্যমেই আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। অবশেষে তারা এমন কেন করলেন? হয়তো এমন তো নয়, যে আমাদের ইসরাইলিয়্যাতের এই সম্পদগুলো একত্র করার প্রয়োজনীয়তা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে? বিশ্লেষকদের মত হলো, "ঐ পূর্বসূরিদের নিকট কুরআন ও হাদিসের গভীর অধ্যয়নের দ্বারা যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়েছে তা হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে ইহুদিবাদ ও ইহুদিদের লড়াই করা অবধারিত বিষয়।" এটা সেই লড়াই এবং ফেতনা যার সূচনা কোন না কোন আকৃতিতে নববী যুগেই হয়েছিল। এখন মনে হয়, এ সকল বর্ণনাগুলো এজন্য একত্র করেছেন যেন আমরা বনি ইসরাইল সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখি, এসকল ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকতে এবং তার মোকাবিলা করার চিন্তা করি। নবীজীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস থেকে জানা যায়—তার আশঙ্কা ছিল, এই উম্মত ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। নবীজীর এটাও আশঙ্কা ছিল, এই উম্মত সম্পদের ফেতনায় লিপ্ত হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে দুনিয়ার মুহাব্বত ও মৃত্যুর ভয় তৈরি হয়ে যাবে। এজন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসকল বিষয়ে সতর্ক করেছেন যা থেকে ইহুদি প্রকৃতি, ইহুদি চিন্তা-চেতনা, ইহুদি ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের একমাত্র পথ

সুতরাং ইহুদি চিন্তা ও প্রকৃতি গ্রহণ করা থেকে বাঁচতে, দুনিয়ার প্রতি অন্তর না লাগানোর উপযুক্ত শক্তি সংরক্ষণের জন্য যে সুদৃঢ় কেল্লা, তা সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যা উম্মাহর সকল শক্তির উৎস, সকল সমস্যার সমাধান ও সকল রোগের চিকিৎসা। আর তা হলো বিশুদ্ধ জিহাদ তথা কিতাল-ফি সাবিলিল্লাহ যাকে 'যুরওয়াতুন সানামিহ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ ফরজ। যার সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে: "যেমনিভাবে আমার নবুয়ত কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে তেমনিভাবে জিহাদ তথা কিতালও

কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। কোন ষড়যন্ত্র এবং কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাই তা বন্ধ করতে পারবে না।"[১০২]

অতএব সেই কাজ যার মধ্যে এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট রশদ রয়েছে তা হলো,

১. বনি ইসরাইল অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিমা চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা।

২. কুরআন ও সুন্নাহ এবং তার শব্দ ও মর্মের প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা।

৩. দুনিয়া ও সম্পদ অর্জনের ভয় এবং জিহাদ-ফি সাবিলিল্লাহ।

"আর জিহাদ-ফি সাবিলিল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ জিহাদ যার আলোচনা নিম্নের হাদিসে করা হয়েছে। "আল্লাহর রাস্তায় যার কোন আঘাত লাগবে এবং আল্লাহ তা'আলা ভালকরেই জানেন, কে তার সন্তুষ্টির জন্য আঘাত খেয়েছে। সে কেয়ামতের দিন এ অবস্থায় উঠবে যে তার আঘাত থেকে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে আর সে রক্তের রং তো রক্তের মতই হবে; কিন্তু তা থেকে মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে।"[১০৩]

এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা কার্যকরী হওয়ার প্রমাণ এর দ্বারাও পাওয়া যায়, এটাই সেই বিষয় যা থেকে পশ্চিমারা বিগত দুইশত বছর যাবৎ আমাদেরকে দূরে রাখতে চেয়েছে। এ বিষয়ে চিন্তা করতেই পশ্চিমাদের কম্পন শুরু হয়ে যায়। তাই ওরা এর দুর্নাম করার জন্য এবং একে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আখ্যা দেওয়ার অনেক চেষ্টা এবং সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে যাচ্ছে। ওরা স্বয়ং মুসলমানদের মধ্য থেকেও এমন ব্যক্তি ও দলকে প্রমোট করছে যারা জিহাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে চেয়েছিল। ওরা ইসলাম এবং জিহাদের দুর্নাম করার অনেক চেষ্টা করেছে। এজন্য তারা ইসলামি কট্টরপন্থী (Islamic Fundamentalism), ইসলামি সন্ত্রাসবাদ (IslamicTerrorism), ইসলামি উগ্রবাদ (Islamic Fanmism), ইসলামি চরমপন্থী (Islamic Extremism) এর মতো পরিভাষাগুলো আবিষ্কার করেছে। আরবের মুশরিকরা যেমনিভাবে রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুর্নাম করার জন্য এবং তাঁর দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তাকে মন্দ নাম দিয়েছে। তাকে কবি, পাগল

[১০২]. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৩৫২

[১০৩]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩০৮২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৭৮১; সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ৬৫৬১

ও ধর্মত্যাগী ইত্যাদি বলেছে। এসবকিছু এজন্যই ছিল যে, নবীজীর শত্রুরা চাইত-মানুষ যেন নবীজীর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে এবং অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমারাও একই কৌশল অবলম্বন করেছে। ওরা ইসলাম, মুসলমান, মুজাহিদদের বদনাম করার জন্য ইসলামি কট্টরপন্থী, সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী ও চরমপন্থীর মত শব্দ ও পরিভাষাগুলো আবিষ্কার করেছে এবং মানুষের মধ্যে এগুলো খুব প্রমোট কারার চেষ্টা করছে যেন মানুষ জিহাদ এবং কিতালকে ঘৃণা করতে শুরু করে। জিহাদকে লিল্লাহিয়াত ও বুজুর্গীর খেলাফ এবং যুহদ ও ইবাদতের বিপরীত মনে করে। তাকে পবিত্র ও বরকতময় হুকমে ইলাহী ও পবিত্র বরকতময় সুন্নাহ মনে করার পরিবর্তে তার নাম শোনামাত্রই ভয় পেতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীর নজিরবিহীন ঘটনা

এত কিছু সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে গেছে। যাকে পৃথিবী 'আফগান জিহাদ' নামে জানে। এটা এমন এক ঘটনা যার স্মরণ হলে ঈমানদারদের চক্ষু শীতল হয়ে যায়। তাদের অন্তরসমূহ ঈমানী উদ্দীপনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে যায় এবং সে চক্ষু ছানাভরা করে প্রত্যক্ষ করতে থাকে যে আধুনিকতার এই বস্তুগত যুগেও, নিঃস্ব ও অসহায় হওয়া সত্ত্বেও, একমাত্র ঈমানী হাতিয়ার দ্বারা লড়াই কীভাবে লড়তে হয় এবং জিততে হয়। আফগান জিহাদ সেই ঈমানী শক্তি এবং নুসরাতে ইলাহীর উত্তম নমুনা। যে লোক পরাশক্তিসমূহের বস্তুগত উন্নয়নের বিষয়সমূহ এবং উপায়-উপকরণের জ্ঞান রাখে সে আফগান জিহাদকে এক মুজিযা অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম মনে করেনা। এখানে জিহাদের ময়দান হতে দূরে থেকে তা অনুমান করা কঠিন যে, কীভাবে আফগান মুজাহিদরা তাদের অসহায়ত্ব সত্ত্বেও রাশিয়ার মত পরাশক্তির কোমড় ভেঙ্গে দিয়েছে এবং অবশেষে তাদেরকে অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয় বরণ করে ফিরে যেতে হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের গোটা শৃংঙ্খলা এবং অবকাঠামোই ভেঙ্গে গিয়েছে। বিশ্ব পর্যবেক্ষকদের এটা বলা অবশ্যই যথার্থ হবে যে, একটি পরাশক্তি মুসলিম বিশ্বের সাথে লড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এটা হুবহু ঐ ধরনের ঘটনা যেমনটি খেলাফতে রাশেদার সময়ে কিসরার ধ্বংস হওয়া। রাশিয়াও এমনভাবে ভেঙ্গে গেছে যেমনভাবে কিসরার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই সামঞ্জস্যতার সত্যতার সাক্ষী সে ব্যক্তিরা দিতে পারবে যারা আফগান জিহাদে অংশ নিয়েছেন কিংবা তা অনেক নিকট থেকে দেখেছেন।

হারানো মূলধন ফিরে পাওয়া

কিন্তু আফগান জিহাদের গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। আফগান জিহাদ মুসলিম বিশ্বে শুধু যে জিহাদের চেতনা ও চিন্তাধারাকেই জাগ্রত করেছে তাই নয় বরং তাদের অন্তরসমূহকে জিহাদের স্বাদ ও তৃপ্তিতে সিক্ত করেছে। আফগানিস্তানে শুধু আফগানিস্তান বিজয়ের যুদ্ধই লড়া হয়নি বরং বাস্তবতা হলো, আফগান জিহাদ বিশ্ব মুসলমানদেরকে জিহাদের হারানো মূলধন ফিরিয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তান গোটা পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রের রূপ নিয়েছে। এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র সামরিক প্রশিক্ষণের চেয়ে জিহাদের স্বাদ-তৃপ্তি ও জিহাদের চিন্তা-চেতনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবেই অধিক প্রমাণিত হয়েছে। গোটা পৃথিবীর সম্ভবত এমন কোন দেশ নেই যেখান থেকে ঈমানদাররা পতঙ্গের মত জিহাদে অংশ নিতে এই আফগানের পাহাড়ী ভূমিতে ছুটে আসেনি। বরং তাদের আসাটা ছিল লিল্লাহ-ফিল্লাহ-লিওয়াজহিল্লাহ অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য। পৃথিবীর কোন মহাদেশ, কোন ভূখণ্ড এবং কোন দেশ এমন পাওয়া যাবে না যেখান থেকে কোন ব্যক্তি তাও আবার এক দু'জন নয় বরং হাজার হাজার সংখ্যক অংশগ্রহণ করেনি। আফগানিস্তান কমিউনিস্টদের থেকে পাক হওয়ার পর জিহাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এই পবিত্র ধারা বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্বে নতুন করে পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

মুসলিম বিশ্বের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য

যুদ্ধের ময়দানে রাশিয়ার শিক্ষণীয় ও অপমানজনক পরাজয়ের পরে যখন এখানে ইসলামি খেলাফত পুনর্জ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগল তখন বিশ্ব কুফরি শক্তিসমূহ মিলে তার পথ রোধ করতে এখানে এমন ষড়যন্ত্র শুরু করল—যে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনার জন্য পুরোপুরি দীর্ঘ পরিসর প্রয়োজন। সেই মুসলমান যাদেরকে গোটা পৃথিবীর কমিউনিস্ট ব্লকের সকল দেশ মিলেও পরাজিত করতে পারেনি। এখানে এসে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলেন। বিশ্ব কুফরি শক্তির ষড়যন্ত্রের কারণে আফগানিস্তানে প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে জিহাদের প্রকৃত ফলাফল পৃথিবীকে দেখাতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে এবং শহিদদের রক্তের বরকতে সেখানে তালেবানদের আত্মপ্রকাশ হয় এবং তারা প্রকৃত ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যা দেখার জন্য বিগত শত বছর

যাবৎ আকাশের দৃষ্টি অপেক্ষায় ছিল। তাদের ধারাবাহিক বিজয়সমূহ এবং স্বচ্ছ ও মজবুত নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব কম্পমান এবং ইহুদিবাদীদের কাতারসমূহে শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। ওদের বিগত শতাব্দীতে করা হাজারো চেষ্টা-প্রচেষ্টা উলট-পালট হয়ে গেছে। "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে পূর্ণতা দানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।"[১০৪]

এই আয়াতের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এখন প্রয়োজন, মুসলিম বিশ্ব তার সকল শক্তি-সামর্থ্য, উপায়-উপকরণ আফগানিস্তানের শরীয়া শাসনের সফলতা ও স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহার করা। যেন উসমানী খেলাফতের পতনের কারণে মুসলমানদের যে কেন্দ্রীয় শক্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই হারানো জান্নাত পুনরায় নসিব হয়।

১০৪. আস-সাফফ: ৮

ইরাকে নতুন মার্কিন হামলা মুসলিম পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কার সত্যায়ন

[এই লেখাটি এবং পরের দুটি লেখা ১৪১৯ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৮ ইসায়ীর পবিত্র রমজানের শুরুতে ইরাকের ওপর করা মার্কিন ও বৃটিশ হামলার ওপর লেখা হয়েছে।]

অবশেষে থলের বিড়াল বের হয়ে গেল। আমেরিকার মুনাফিকির মুখোশ উন্মোচন হয়ে গেল। ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদের (আমেরিকাও বৃটেন) ঘৃণ্য পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত গেল। আরব উপদ্বীপের পবিত্র ভূমির আশপাশে বুনা ভয়ঙ্কর সব ষড়যন্ত্রের জালের 'তানা-বানা' আরো সঙ্কোচিত করে দেওয়া হয়েছে। উসমানী সাম্রাজ্যের ইসলামি খেলাফতের পতন ঘটানোর পর মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহ দখল করে তাকে **"গ্রাণ্ড ইসরাইল"** তথা বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্রের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ঘোষণা দিয়েই অতিক্রম করল। সংবাদপত্রগুলো অনেক বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহকে যে বিষয়টি বিশ্বাস করাতে চাচ্ছিল, আমেরিকার বর্তমান ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এক রাতেই তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। হঠাৎ মধ্যরাতে বিতারিত ইহুদিদের আস্তানা এবং ক্রুসেডার খ্রিষ্টানদের প্রতিনিধি দুই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী শক্তি আমেরিকা ও বৃটেন উভয়ে মিলে ঠিক সেই দিন মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিক শহর বাগদাদের ওপর রাতের অন্ধকারে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসে। যেদিন দুষ্কৃতিকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বিলাসিতা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে তার বেহায়া জাতিও অক্ষম হয়ে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিল। এই হামলায় অত্যন্ত নির্দয় ও অমানবিকভাবে মুসলমানদের গ্রাম ও শহরের ওপর ক্রোজ-মিজাইল নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর অসহায় ও মজলুম ইরাকি মুসলমানদেরকে দেওয়া এই হিংস্র শাস্তিকে যথেষ্ট মনে না করে তার ওপর সাথে-সাথে বি-৫১, বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। এতেও ক্ষ্যান্ত না হয়ে আমেরিকার ব্যাভিচারী ইহুদি প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে, ইরাকের ওপর আরো বিমান হামলা অব্যাহত থাকবে এবং এর জন্য কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। কেনো? এজন্য যে ইরাকের নিকট রাসায়নিক বস্তু, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে। কোন মুসলিম দেশের নিকট এমন অস্ত্র থাকা কি অপরাধ? স্বয়ং আমেরিকার নিকট কি এই অস্ত্র নাই? তারা কি এই অস্ত্র জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি?

ইরাকের পাশে আমেরিকার লালিত ইসরাইল এই অস্ত্রের ভাণ্ডার মজুদ করে রাখেনি? স্বয়ং আমেরিকা কি ইসরাইলকে এই অস্ত্র জমা করতে এবং উৎপাদন করতে পর্যাপ্ত সহযোগিতা করেনি? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ওপরকি এই অস্ত্র রাখার অপরাধে আন্তর্জাতিক বাহিনী কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে?

পাপের কারণ পাপের চেয়ে জঘন্য

বলা হয়, প্রতিবেশী দেশসমূহের এই অস্ত্রের মজুদের কারণে আশঙ্কা হচ্ছে। শুনো হে মুসলমান! আশঙ্কা থাকবেই। এই আমেরিকা, যার কানের ওপর অধিকৃত কাশ্মীরে বহু যুগ ধরে চলে আসা হিংস্রতার বিরুদ্ধে বার বার আপিল করা সত্ত্বেও একটি উকুনও খসেনি। এই সেই ইহুদি দারোগা, যারা কসোভোতে কাফির হায়েনাদের দল কর্তৃক সংঘটিত অসহায় মুসলিমদের ওপর সার্বীয়দের বর্বরতা দেখেও বিন্দু পরিমাণ আগ্রহী হয়নি। যারা না বসনিয়া ও চেচনিয়ার মুসলিমদের দুরবস্থা দেখতে পায়, না মাজারই শরীফের হামলায় শহিদ হওয়া মাটি ও রক্তে ছটফট করা কাফন-দাফন বিহীন লাশ দেখতে পায়, না হিন্দু বেনিয়াদের জারি করা জুলুমের কারণে মুসলমানদের জন্য ওদের সমবেদনার শিরা ধরফড় করে, না গোড়া খ্রিষ্টানদের ছড়িয়ে দেওয়া নির্যাতনের জন্য ওদের ন্যায়-নীতির প্রেরণায় ঢেউ জাগে? মুসলমানদের এই সমব্যথী, সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল আমেরিকার কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্মনিয়ন্ত্রণকে তো কার্যত চলমান রাখা এবং তদসংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাগুলো বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়। কিন্তু এক মুসলমান যদি অপর মুসলমানের দ্বারা আশঙ্কায় পতিত হয়- ওরা রাতারাতি আশঙ্কার সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী দেশের ওপর চড়াও হয়ে যায়। এর জন্য না ওদের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে প্রস্তাব পাস করানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়, না আশঙ্কার কারণ হওয়া জালেম ও আক্রমণকারীদের কোন প্রকার সাবধান করার প্রয়োজন হয়। সেই মুসলমান যাদের নিরাপত্তার জন্য তারা বাধ্য হয়ে এই হামলা করতে হয় ওদেরকে তো কল্পিত আশঙ্কা থেকে বাঁচানোর জন্য ওদের সর্বোচ্চ ফিকির ও সীমাহীন অস্থিরতা হয়ে থাকে কিন্তু ওদের হামলার ফলে যে সকল মুসলমান নিশ্চিত মারা যাবে, যে লোকালয়গুলো অবশ্যই ধ্বংস হবে, এগুলোর জন্য না তাদের কোন দুঃখ আছে না কোন পরোয়া আছে। বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রতারণার এর চেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে?

তথ্য অনুযায়ী বিল ক্লিনটন কট্টরপন্থী ও গোড়া ইহুদি এবং ইহুদিদের একটি আন্তর্জাতিক ক্লাবের কর্মী। এই তো সেদিন ইসরায়েল ভ্রমণের সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত তার সেই ছবি সব পাঠকই দেখে থাকবেন যাতে সে বিশেষ পদ্ধতির ইহুদিদের ধর্মীয় টুপি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ক্ষমতাকে সংকটাপন্ন দেখে এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিয়েছে- একদম ঠিক ঘেরাওয়ের দিন মার্কিন জনগণের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরানোর জন্য এই কুৎসিত ও ভয়াবহ খেলা খেলেছে। এর সত্যায়ন এই কাজের দ্বারাও হয়—হোয়াইট হাউজের সামনে মার্কিন সৈন্যদের মা ও স্ত্রীদের অনেক বড় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। যাতে তারা জোড়ালো অভিযোগ করেছে যে প্রেসিডেন্ট নিজেকে নিজে ঘেরাও থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের পুত্র ও স্বামীদেরকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে।

কুফরের জীবন জাগ্রতকারী চিন্তা

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ! কুফরের চিন্তা অবলোকন করেছেন। তাদের উন্নত মানসিকতা ও দুঃসাহসী নারীদের তাদের পুত্রদের ও স্বামীদের চিন্তা তো রয়েছে যারা ইরাকের জবাবী হামলার সীমানা থেকে বহু দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে। নিরাপত্তাবেষ্ঠিত মজবুত দূর্গ থেকে মুসলিমদের ওপর হামলা করছে। কিন্তু সেই নিরস্ত্র, নিরুপায়, অসহায় ও নিরপরাধ মুসলিমদের কোনো পরওয়া নেই, যারা বিনা অপরাধে এমন জঘন্য শাস্তি ভোগ করছে। কোন কোন বিক্ষোভকারী তো তাদের মহান প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য বাক্য ও মন মাতানো গল্পও বর্ণনা করেছে। যা এখানে উল্লেখযোগ্য নয়। মোট কথা, প্রতিটি সচেতন মানুষই জানেন যে ক্ষমতার রশি ও রাজত্বের নেশায় উন্মাদ, এই বেহায়া ও চরিত্রহীন লম্পট শাসক বিশেষ করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই এই অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণ করেছে।

মুসলিম রক্তের অবমূল্যায়ন

হে মুসলমান! তোমাদের রক্ত কি এতই সস্তা হয়ে গেছে, যে কখনো হিন্দু বেনিয়ারা তাদের ক্ষমতা টিকানোর জন্য তোমাদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলবে। কখনো ধূর্ত ইহুদিরা তাদের লাম্পট্যের ওপর পর্দা দেওয়ার জন্য **তোমাদের রক্তে তাদের হাত রাঙ্গাবে? তোমাদের জীবন কি এতই নিম্নমূল্য ও অগ্রহণীয় হয়ে গেছে—এক ইহুদি যৌনপূজারী যখন ইহুদি মহিলার সাথে মনমালিন্য হবে তখন নিজের চেহারার রাগ মিটানোর জন্য তোমাদের রক্তে**

ব্যাপ্টিস্ট নেবে? সালাহুদ্দীন আইউবীর উত্তরসূরিরা কি এতই নগণ্য, এত সস্তা ও এত নিম্ন মূল্যের হতে পারে? লাঞ্ছনার কি এরপরে আরও কোন সীমানা বাকি আছে যেখানে পৌঁছার পূর্বে তোমাদের জ্ঞান ফিরবে না? অলসতার এরচেয়েও গভীর কোন গর্ত আছে যাতে প্রবেশের অপেক্ষায় তোমরা উটপাখীর ন্যায় চোখ কান বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছ?

দুর্বলতার অপরাধের শাস্তি

কথা কেবল এইটুকুই নয়, দুর্বলতার অপরাধের শাস্তি আকস্মিক মৃত্যু। এখানে দুর্বলতা থেকে আরো অধিক ক্ষতিকর কিছু অপরাধে মুসলমান সম্মিলিতভাবে লিপ্ত হয়ে আছে। আর তা হলো, **অলসতা, অনুভূতিহীনতা, নৈরাশ্য ও কাপুরুষতা।** শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ গোটা জীবন আর্তচিৎকার করে গিয়েছেন—**আমেরিকা রক্ষক নয় ভক্ষক।** রক্ষকেররূপে চুরি করতে চায়। তাদের দৃষ্টি শুধু তোমাদের তেল সম্পদের ওপরই নয়, পবিত্র স্থানসমূহের ওপরও। সহজ কথায় এটা বুঝ, ওরা তোমাদের দুনিয়া লুণ্ঠনের সাথে সাথে দীনও ধ্বংস করছে। ***যরবে মুমিন*** দীর্ঘদিন ধরে তোমাদেরকে ঝাঁকি দিয়ে আসছে, আরব উপদ্বীপ ও তার আশপাশে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা মিলে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করছে। আরব ভূখণ্ডে ইসরাইলের বিষাক্ত বৃক্ষ চাষাবাদ ওদের পরিকল্পনার সমাপ্তি ছিল না বরং সূচনা ছিলমাত্র। তার সামনের স্তর হলো, ওরা **"গ্রান্ড ইসরাইল"** তথা বৃহত্তর ইসরাইল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের পবিত্র স্থানসমূহকে গ্রাস করে নেবে। এসকল সতর্কতা ও চিৎকার, আফসোস ও অভিযোগের পরিবর্তে কখনো তোমাদের নিকট উসামাকে উগ্রপন্থী মনে হয়, কখনো ***যরবে মুমিনের*** লেখা বাস্তবতা বিবর্জিত মনে হয়। অত্যন্ত জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্নরাও কখনো এই ভিনদেশী মুখলিস মুজাহিদকে সৌদি আরবের নিষ্পাপ শাসকদের সাথে অযথা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীর অপবাদ দেয় এবং কখনো ***যরবে মুমিনের*** চিৎকার ও অভিযোগকে অর্থহীন ও বেমানান আখ্যা দেয়।

নিরাপদে হজ-উমরা আদায় করতে পারাই হারামাইনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নয়

এ সকল অলসতা এবং সুধারণার বশবর্তীদের বছরে একটি উমরা কিংবা দু'চার বছর পরপর হজ করার সুযোগ তো রয়েছে। এটাকেই তাদের নির্ভয়তার আশ্রয় এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টি মনে করে বসে আছে।

কবির ভাষায় :

"মোল্লাদের যে রয়েছে হিন্দুস্তানে সেজদার অনুমতি,
মূর্খরা এটাকেই মনে করছে ইসলাম বুঝি স্বাধীন।"

আরে মূর্খরা! আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর জোড় দেওয়া ধোঁকাবাজেরা উপসাগরের আশপাশে আটটি যুদ্ধবিমান সজ্জিত নৌযান কেন দাঁড় করিয়ে রেখেছে? পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলিম দেশসমূহের ভবিষ্যতের অবৈধ আগ্রাসন বিলুপ্তির জন্য আলোচনার আয়োজন ক্ষ্যান্তকারী, ইরাককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এত অলসতা ও চালাকি কেনো দেখাচ্ছে? শান্তির আহ্বানকারী কাতারে এশিয়ার সবচেয়ে বড় সামরিক বিমান ঘাঁটি কার মনোরঞ্জনের জন্য নির্মাণ করছে? তালেবানদেরকে যুদ্ধ বন্ধের পরামর্শদানকারী দিন রাত B-52, F-18 পেন্ট্রম ও ট্রেন্ডোর মত অত্যাধুনিক বিমানের মাধ্যমে ভারী বোমা বর্ষণ কেন অব্যাহত রেখেছে?

মনে রেখো! তাদের উদ্দেশ্য ইরাককে কোন অবৈধ আগ্রাসন থেকে বিরত রাখা নয়, না সাদ্দামকে সবক শেখানো। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, তোমাদের সম্পদ দখল করা এবং ফিলিস্তিনের ন্যায় অবশিষ্ট পবিত্র স্থানসমূহ থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা। একটি মজলুম ও নিরীহ দেশের দ্বারা কার কী আশঙ্কা হতে পারে? যুদ্ধবিদ্ধস্ত এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রতায় জর্জরিত জাতির নেতা এতটা শক্তিশালী কীভাবে হতে পারে—সে আমেরিকাকে চক্ষু রাঙ্গাবে আর আমেরিকা তাকে রাস্তা থেকে সরাতে পারবেনা? সাদ্দামের সাথে প্রকাশ্যে এমন কঠিন শত্রুতা সত্ত্বেও আমেরিকা কেন তাকে সহ্য করে যাচ্ছে? উদ্বাস্তু এক উসামার ওপর প্রমাণবিহীন বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে তার গ্রেপ্তারে সহায়তার জন্য যে দেশ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে; ওরা কি সামান্য কয়েক হাজার ডলার খরচ করে এক সাদ্দামকে পরাজিত করতে পারে না? এ সকল নিদর্শনের ভিত্তিতে অভিজ্ঞজনদের মতামত হলো, কমিউনিস্ট সাদ্দাম এবং আমেরিকার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন গোপন বুঝাপড়া রয়েছে যে একটু একটু করে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল করা হবে। এর ওপর ধীরে-ধীরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা হবে। নিজেদের নিরাপত্তায় অপারগ কিন্তু উপায়-উপকরণের মালিক আমির ও আরব দেশসমূহকে সাদ্দামের যে ভয় দেখিয়ে লুণ্ঠন করা হচ্ছে, ঠিক একই বাহানায় উপসাগরে নিজেদের উপস্থিতির বৈধতা ঠিক রাখা যাবে।

মার্কিন হামলার উদ্দেশ্য

ইরাকের ওপর হামলার দ্বারা যেখানে এক দিকে আমেরিকা ও তার মিত্ররা এ সকল স্বার্থ হাসিল করছে সেখানে তাদের অন্য আরও একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে। আর তা হলো, উপসাগরে এমন কোন মুসলিম দেশ অবশিষ্ট না রাখা যারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এই অঞ্চলে ইরাকই ছিল উল্লেখযোগ্য শক্তি যাদের ওপর প্রথম ইসরায়েলী হামলা করে তাদের পারমাণবিক প্লানকে ধ্বংস করেছে। অবশিষ্ট শক্তির উপযুক্ত ঘাটতি আমেরিকা ও তার মিত্ররা উপসাগরের যুদ্ধে পুরা করে দিয়েছে। বর্তমানে তা পরিপূর্ণভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও পঙ্গু বানানোর জন্যে এই নতুন বিবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর, তারপরে...!

তারপরের অবস্থা চিন্তা করতেই অন্তর কেঁপে উঠে। যে সকল মুসলিম বাগদাদের পবিত্রতার আকিদায় তার দিকে ফিরে নামাজ পড়া, সালাতে বাগদাদিয়া পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে তা বাগদাদের ধ্বংসের কারণে একটু নড়াচড়াও করেনি। এদের জন্য কোন অসম্ভব নয় যে তাদের থেকে প্রথম কেবলা ছিনিয়ে নেওয়ার পরে (আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন) দ্বিতীয় কেবলার ওপরও যদি আক্রমণ হয় এবং এরা এমনই সুধারণা, অন্যায় অলসতা ও নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত থাকবে।

চূড়ান্ত লড়াই

সম্মানিত মুসলিমগণ! আমেরিকা ইরাকের ওপর বর্তমান হামলা করে শেষ যুদ্ধের নাকারা বাজিয়ে দিয়েছে। অনেক পূর্ব থেকে চলে আসা গোপন শীতল যুদ্ধের সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানের জন্য নাকারার ওপর আঘাত লেগেছে। বিশ্ব কুফরি শক্তি তোমাদের নির্জীবতা ও দুনিয়া পূজায় নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের অবৈধ ষড়যন্ত্রকে সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখনো সময় আছে সতর্ক হয়ে যাও। আজও সময় আছে জিহাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে নাও। এখনো সুযোগ আছে সুধারণার জগত থেকে বের হয়ে আস। অপব্যাখ্যা করা ছেড়ে দাও। কাফির তোমাদেরকে প্রথমে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। তাদের চ্যালেঞ্জের এমন উচিত জবাব দাও—তোমাদের সামনের ও পেছনের সকল দুর্বলতার কাফফারা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ইজ্জত ও সম্মান, অস্ত্রের মুহাব্বত ও শাহাদাতের আসক্তিতে নিহিত রেখেছেন। তোমরা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে অনেক লাঞ্ছিত হয়েছ। সুতরাং এখন জিহাদকে নিজের অজিফা বানিয়ে নাও। শাহাদাতের সাথে পুনরায় প্রেমের বন্ধন নির্মাণ

করে নাও। নিজেদের পরস্পরের মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও। আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুহাব্বত ও কিতালের ইলম নিয়ে দাঁড়াও এবং নাপাক কাফিরদের ও অপবিত্র মুশরিকদের থেকে আরবের পবিত্র ভূমিকে পাক করো। এসকল ধূর্ত ও ধোঁকাবাজদেরকে পদদলিত করে দাও। এসকল শৃগালের ন্যায় কাপুরুষদেরকে তছনছ করে দাও। মুসলিম উম্মাহ আজ এক সিদ্ধান্তের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে সিদ্ধান্ত আজ নেওয়া হবে এর ওপরই তারা ভবিষ্যতে অবরুদ্ধ হবে। এটা ইতিহাসের এমন একটি মুহূর্ত যার সম্পর্কে বলা হয়, **"মুহূর্তের সামান্য ভুল শত বছরের পথ পিছিয়ে দেয়"**।

কবির ভাষায়:

"এক মুহূর্ত গাফেল ছিলাম ফলে একশত বছর পিছিয়ে গেলাম।"

এখন আকাশ বাতাস অপেক্ষায় আছে, মুসলমান তার জীবনের গতি পরিবর্তন করে হারিয়ে যাওয়া ইজ্জত ও সম্মান পুনরায় অর্জন করে, নাকি এখনো অলসতা ও নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত থেকে শিক্ষণীয় পরিণাম ভোগ করে?

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের উপর অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতকে হিদায়াত দান করুন। হে আল্লাহ! মুজাহিদদের সর্দার ও গাজিদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আল ও আসহাব সকলের উপর রহমত নাযিল করুন।

বোমাবৃষ্টির মাঝে ইরাকি মুসলমানদের মৃত্যুর গোসল

এবারের[১০৬] রমজানের বরকতময় ও পবিত্র মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত বিস্ময়কর এক অবস্থা তার আস্তিনে নিয়ে উদয় হয়েছে। একদম সাহরির মুহূর্তে যখন মুসলমান ইবাদত-জিকির, তাহাজ্জুদ ও পবিত্র সিয়াম সাধনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তখনই বাগদাদের ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ও ধ্বংসাত্মক মিজাইল হামলা শুরু হয়। একাধারে চারদিন পর্যন্ত চলমান অগ্নি ও লৌহ বর্ষিত এই রক্ত বৃষ্টির সময় ৬ শত যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন করেছে। ৫ শতেরও বেশি মিজাইলের মাধ্যমে ১০০ লক্ষ্য-বস্তুকে নিশানা বানানো হয়েছে। হাজার হাজার রোজাদার মুসলিমকে হত্যা, অসংখ্য আহত ও অগণিত ঘর বাড়ি উজাড় করা এই ভয়াবহ আক্রমণ শেষ করে ঘোষণা করা

১০৬. ১৯৯৮ ঈসায়ীর

তারপক্ষ থেকে নামকাওয়াস্তেও কোন জবাবী আক্রমণ করা হয়নি। এর দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথমটি হলো যে, এসব কিছু ইরাকি কমিউনিস্ট নেতা এবং বিশ্ব ইহুদি শক্তিসমূহের উদ্দেশ্য উপসাগরে ইহুদি সৈন্যদের উপস্থিতির বৈধতা ও বৃদ্ধির অজুহাত বের করা। দ্বিতীয়টি হলো, সামরিক দিক দিয়ে ইরাক এতটাই দুর্বল এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে যে, এই হামলার জবাব দেওয়ার সামর্থ্য ইরাকের ছিলনা। কিন্তু প্রশ্ন তৈরি হয়, যদি বাস্তবে এমনই হয় তাহলে তারা যুদ্ধের সমাপ্তির পর তাদের জনগণকে বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে তদন্তকারীদের সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি ও জীবাণু অস্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণের হুমকি কেন দিল? স্বয়ং আমেরিকাও তাদের এই গরম হুমকির ওপর পুনরায় আক্রমণের ঘোষণা কেন দিল? উভয়টি থেকে কথা যেটাই হোক সর্বাবস্থায় এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাই সামনে আসে, যার দিকে মুসলিম মনীষীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছেন—এ সকল ঝামেলার মূল উদ্দেশ্য হলো স্পেন এবং ফিলিস্তিনের পরে সৌদি আরবকে ইহুদিদের দখলে নেওয়া এবং একে ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করা।

সাদ্দাম আজ পর্যন্ত কীভাবে জীবিত!

(২) এসকল হামলার সময় এবং তার পূর্বে সাদ্দামকে আক্রমণাত্মক এবং ঔদ্ধত্য ও শক্তিশালী নেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হামলা সমাপ্ত হওয়ার পরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছে, আমেরিকা ভবিষ্যতে আরো সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত। সাদ্দাম যতক্ষণ ক্ষমতায় আছে ততক্ষণ সে তার জনগণ, এলাকা ও পৃথিবীর জন্য আশঙ্কাজনক।[১০৮]

কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও আমেরিকা না পূর্বে সাদ্দামকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরানোর কোন চেষ্টা করেছে না বর্তমানে। বরং মার্কিন সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল হিগশেল্টন সামরিক ব্রিফিং কালে বলেন, সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য সাদ্দামকে ধ্বংস করা নয় এবং না তাকে লক্ষ্য বানানো হবে।[১০৯]

এই দুই বর্ণনাকে মিলিয়ে পড়লে সেই ভয়ঙ্কর আশঙ্কারই সত্যায়ন হয় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যে নির্বোধ মুসলিমদের বীর সাদ্দাম এবং তার

---

১০৮. ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৮-এর সংবাদপত্র

১০৯. রোজনামা জংগ, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮

কুফার শক্তির ক্রীড়নক, যাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন আঘাত থেকে নিরাপদ ও জীবিত রাখা হয়েছে।

পশ্চিমা শক্তির গোলাম

(৩) আন্তর্জাতিক পশ্চিমা মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী ইরাকে অস্ত্র অনুসন্ধানকারী টিমের এক কর্মকর্তার বরাতে প্রকাশ করা হয়েছে, ইরাক আক্রমণকে বৈধ করার জন্য জাতিসংঘের অনুসন্ধানী টিমের প্রধান মি. ব্রিটলারকে আমেরিকার পক্ষ থেকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যে তারা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ইরাককে উস্কানী দিয়ে এমন কোনো অজুহাত সৃষ্টি করবে যার ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ইরাকে হামলার প্রস্তাব অনুমোদন করা যায়।[১১০]

অতঃপর যখন ঐ ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যে সফল হয়ে গেছে তখন ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনেরও তোয়াক্কা করা হয়নি। তারা নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেলকে রিপোর্ট দেওয়ার পরিবর্তে সরাসরি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট দিয়েছে- ইরাক তার ধারণকৃত অস্ত্রভাণ্ডার অনুসন্ধান করতে পুরোপুরিভাবে সহযোগিতা করছে না। রিপোর্ট পেতে দেরি কিন্তু রাজত্ব ও ক্ষমতার নেশায় উন্মাদ এবং আরব উপদ্বীপে ইহুদি আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী আমেরিকা ইরাকের এই মারাত্মক অপরাধের শাস্তি দিতে তোপধ্বনি শুরু করতে দেরি করে নাই। কোথায় সে অপরাধ যা জাতিসংঘ ভারত ও ইসরাইলকে নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মতভাবে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করাতে পারেনি। আর কোথায় এই অন্যায় যে তাদের নিকট প্রস্তাব করা ও অনুমোদন নেওয়া ব্যতীত বহু বছর যাবৎ অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার একটি দেশের ওপর ভয়ঙ্কর মিজাইল এবং বোমা হামলা করে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং পশ্চিমা শক্তির এই গোলাম (জাতিসংঘ) তার কোন মামুলী প্রতিবাদও করেনি। হে জাতিসংঘকে শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টিদাতা মনে করা মুসলমানেরা! এসকল গোলক ধাঁধাঁ তোমাদেরকে দুর্বল করে রাখার জন্য করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো সকল কাফির ঐক্যবদ্ধ, সুতরাং তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও।

---

১১০. প্রাগুক্ত

কিছু হৃদয়বিদারক সংবাদ

(৪) হুবহু সেই দিনসমূহের মধ্যে যখন সাদ্দামের আশঙ্কা থেকে প্রতিবেশী দেশসমূহকে বাঁচাতে ইরাকের নিরপরাধ জনগণের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ চলছিল। নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলো সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তার ভয়াবহতার অনুমান ইরাকের কল্পিত অপরাধ থেকেই করা যায় এবং তারপর এটা দেখা যাক যে তাদের ভালো ব্যবহার করার ন্যূনতম চেষ্টাও যদি না হয় এবং ইরাকের ওপর প্রচুর এলোপাথারি হামলা হয়। যেখানে ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দিতে সৌদি আরব পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। সাদ্দামের দ্বারা সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা যাদের হতে পারে এবং এই খ্রিষ্টান দেশসমূহের সন্ত্রাসকে প্রতিহত করতে গোটা মুসলিম বিশ্বকে আহ্বান করছে। এ সকল বিষয় মাথায় রেখে একটুও যদি চিন্তা করা হয় তাহলে কুফরি শক্তির মূল ষড়যন্ত্রের অনুমান করা কঠিন কিছু না।

মানবতার লজ্জাজনক সংবাদগুলো হলো এই-

(ক) জাতিসংঘ, ন্যাটো ও আমেরিকার সব ধরনের দাবি ও হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও কসোভোতে নিরপরাধ আলবেনীয় গোত্রের মুসলিমদের গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শক্তি ও জাতিসংঘ সার্বীয় ও জুগোশ্লাভীয় সৈন্যদেরকে মুসলিম গণহত্যা থেকে বাধা দেয়নি। পূর্বে জুগোশ্লাভীয় সৈন্যরা সীমান্ত এলাকায় ৩০ জন মুসলমানকে গুলি করে শহিদ করে দিয়েছে। তারা কসোভোতে প্রবেশ করছিলেন।[১১১]

(খ) কসোভোর একটি হোটেলে খ্রিষ্টানরা ২ জন মুসলিমকে গুলি করে। তারা সে সময় হোটেলে খানা খাচ্ছিল। এ পর্যন্ত কসোভোর হাজারো নিরপরাধ মুসলিমকে শহিদ করা হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘ ও আমেরিকা সার্বীয় ও জুগোশ্লাভীয় সৈন্যদের এই সন্ত্রাসের কোন তদন্ত নেয়নি। এ হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তির স্বজনপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ।[১১২]

(গ) দুই ইসরাইলী যুদ্ধ বিমান দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর অবস্থানের ওপর বোমা বর্ষণ করে। ভয়েস অফ আমেরিকার সংবাদ অনুযায়ী হামলাকারী বিমান নিরাপদে ফিরে এসেছে। এক নারীসহ মোট ১২ জন শহিদ হয়েছেন।[১১৩]

---

১১১. রোজনামা জং ২২ ডিসেম্বর-১৯৯৮

১১২. রোজনামা উম্মত ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৮

১১৩ রোজনামা উম্মত- ২৩ ডিসেম্বর-১৯৯৮

একদিকে এ ভয়াবহ ঘটনাসমূহের কোন তদন্ত নেওয়া হয়নি, অন্যদিকে ইরাকের পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয়াবহ আশঙ্কার অজুহাতে তাদের ওপর এমন প্রচণ্ড হামলা করা হয়েছে যা হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংসের সময়ের অত্যাচারকেও লজ্জিত করেছে। এ সবকিছু মুসলিম উম্মাহকে অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করে। শর্ত হলো তার নিকট ইসলামের মুহাব্বতকারী অন্তর এবং চিন্তা করার উপযুক্ত বিবেক থাকা।

মুসলিমদের জন্য রমজানের উপহার

(৫) বিবিসির সংবাদ অনুযায়ী ইহুদি সৈন্যরা ইরাকের ওপর নিক্ষেপ করা গাইডেড মিজাইলের মধ্যে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে রেখেছে রমজানের উপহার। মার্কিন প্রশাসন এই গোপনীয় মুসলিম শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষকে ঢাকার জন্য বলছে, এটা সৈন্যদের ব্যক্তিগত বিষয় ছিল, মার্কিন প্রসাশনের পক্ষ থেকে এমন কোন দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু তার আগের দিনই সংবাদ মাধ্যমে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ইরাকে আক্রমণকারী বিমানে আনন্দে উল্লসিত ছবি প্রকাশ পেয়েছে। যা থেকে মার্কিন ব্যাখ্যার দ্বার খুলে গেছে এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কৃতকর্মের দ্বারা একথাই সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেছে— এই হামলা শুধু প্রতিরক্ষার আক্রমণই ছিল না বরং এর পেছনে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা ও হিংসার প্রেরণা কার্যকর ছিল। এসব কিছু মুসলিমদের সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

মুসলিম বিশ্বের নির্লিপ্ততা

(৬) হামলার সেই দিনগুলোতে যখন বাগদাদ, বসরা ও তুকরিত রক্তাক্ত হচ্ছিল। মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে দুঃখজনক নির্লিপ্ততা পরিলক্ষিত হয়েছে। না কোন রাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ করেছে, না স্বীয় ভাইদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই নগ্ন হামলার ব্যাপারে আশানুরূপ কোন প্রতিবাদের আওয়াজ উঠানো হয়েছে। গোটা মুসলিম বিশ্ব মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল। প্রতিবাদী কণ্ঠে কেউ যদি সামান্য কিছু বলেও থাকেন তাও শুধু মৌখিক জমা-খরচের চেয়ে বেশি কিছু না। মূলত ইহুদিরা মুসলিম বিশ্বকে এমন বিচিত্র সব সমস্যায় লিপ্ত করে রেখেছে, কারো এগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহসই হয়নি। কেউ অনেক কষ্টে প্রাপ্ত ভিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করছিল। কেউ নিজের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার ভয়ে কম্পমান ছিল। ক্ষমতার নেশায় মত্ত, ভীরু ও দুনিয়া পূজারী শাসকরা এতটুকুও করতে পারেনি যতটুকু রাশিয়া তার পুরাতন

এজেন্টদের জন্য করে দেখিয়েছে। তারা মার্কিন হামলার বিরোধিতা করে ইরাকের ওপর আরোপিত অবরোধকে একতরফাভাবে উঠিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রুশ পার্লামেন্টে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।[১১৪]

এই সংবাদ যেখানে মুসলিম বিশ্বের জন্য কষাঘাতের সমতুল্য সেখানে সেই মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণের সেই চিন্তাধারাকে আরো শক্তিশালী করেছে, সাদ্দামের ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণের সাথে দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। সে কুফরি শক্তির ক্রীড়নক যে তার উন্মাদনামূলক কাজের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে কঠিন সমস্যায় জর্জরিত করে রেখেছে।

এই আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদগুলো উল্লেখ করার পর আমরা এখন এগুলোর পেছনের সেই উদ্দেশ্যসমূহের ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করব- যেগুলো অর্জনের জন্য এই নাটক সাজানো হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শোকজ আন্দোলন অনুমোদন হওয়ার ৪ ঘণ্টা পরে ঘোষণা দিয়ে বলে, অপারেশন ডিজার্টবক্স প্ল্যান অনুযায়ী সমাপ্ত হয়েছে।[১১৫]

প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, সেই প্ল্যান কী ছিল যা সমাপ্ত করার জন্য চার রাত পর্যন্ত বাগদাদের পরিবেশ রমজানের পবিত্র মুহূর্তগুলো বোমার ঝিলিক এবং গর্জনে প্রকম্পিত হয়েছে? শুধু কি এতটুকু বিষয়ের জন্য যে ইরাক যেন তার প্রতিবেশী দেশসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ না করে। এসব কিছু করা হয়েছে যা প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ে করা আক্রমণের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়? ভূখা-নাঙ্গা ও খাদ্য সংকটের শিকার ইরাক কি এতই শক্তিশালী, যে ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ বিধ্বস্তের পরও কোন দেশের সীমান্তে আক্রমণ করতে পারে? যে দেশ কারো সাথে স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে না! নিজের ইচ্ছানুযায়ী তেল বিক্রি করতে পারে না। যারা তাদের শিশু-কিশোরদের ঔষধের ব্যবস্থা করতে পারে না! তাদেরকে কি পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছে, যে ওরা এমন কোন কাজ করবে যা তাদের জন্য পূর্ব থেকে দ্বিগুণ সমস্যার সৃষ্টি করবে? মেনে নেওয়া যাক যদি পবিত্র রমজান মাসে তাদের এমন কোন পরিকল্পনা থেকেও থাকে তাহলে তাদেরকে এই পরিকল্পনা থেকে বিরত রাখার চিন্তা তো সবার চেয়ে অধিক সৌদি আরবের

---

১১৪. রোজনামা জংগ, ২০ ডিসেম্বর-১৯৯৮ইং
১১৫. রোজনামা জংগ-২১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সৌদি আরব তাদের ওপর আক্রমণের জন্য নিজ ভূমি পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেয়নি। আমেরিকা ও বৃটেনকে স্পেনের বিমান ঘাঁটি এবং উপসাগরে বিদ্যমান বিমানসজ্জিত নৌযানের রানওয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে। এসবকিছু যে অন্য কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে তা বুঝার জন্য চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নাই। পরিস্থিতির ন্যূনতম জ্ঞান, সংবাদগুলোর সামান্য পর্যবেক্ষণ এবং মুসলিমদের সামান্য মুহাব্বত ও ব্যথাই যথেষ্ট।

নিম্নে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবের্ত সেদিনগুলোতে প্রকাশিত কিছু সংবাদ নকল করছি যা থেকে নিঃসংকোচে একথা বুঝে আসে, এই অপারেশনের মাধ্যমে ইহুদি-খ্রিষ্টান শক্তি ইরাককে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র থেকে পবিত্র করার মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করেনি বরং প্রচণ্ডভাবে মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহ দখলের পথ পরিষ্কার করেছে। এর মাধ্যমে ওরা পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের আশপাশে স্থাপিত তাদের অপবিত্র অবস্থান আরো সুদৃঢ় করে নিয়েছে। এবং এ সময়ে এই দুর্ভাগারা এখানে ছড়ানো ষড়যন্ত্রের খুঁটি আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোর সরবরাহকৃত সংবাদগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে আসে।

(১) সর্বপ্রথম তো প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করেছেন। কিছুদিন পূর্বে যখন তাকে জুড়িবোর্ডের মুখোমুখি করা হয়েছিল তখন সে সুদান ও আফগানিস্তানে মিজাইল হামলা করেছে। বর্তমানেও সে যখন কংগ্রেসের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে তখন বাগদাদে বোমাবৃষ্টি বর্ষণ করেছে।

(২) উপসাগরে মার্কিন সৈন্যদের নিকট আটটি বিমানসজ্জিত নৌযান ছিল। এখন আরো দুটি সেখানে পৌছে দিয়েছে। এই দুই বিমানসজ্জিত নৌযান উপসাগরে পৌছার পরে এখানে মার্কিন বিমানের পরিমাণ ২৫% বৃদ্ধি হয়ে যাবে। পৃথিবীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই পরামর্শ করা হয়েছে যে, নতুন বিমান ও বিমানসজ্জিত নৌযান এজন্য পাঠানো হচ্ছে- সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থানরত নৌযানগুলোর কর্মচারীদেরকে ক্রিসমাস ডে তথা বড়দিনের ছুটি কাটানোর জন্য বাড়িতে পাঠানো হবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট করা হয়নি, কর্মচারী যখন ছুটিতে যাবে তখন তার স্থানে অন্য কর্মচারী আসা উচিত। কিন্তু কর্মচারীর স্থানে, নতুন নৌযান কেনো পাঠানো হচ্ছে? পূর্বের নৌযান তো সেখানে বিদ্যমান রয়েছে; তা তো আর ছুটিতে যায়নি যে তার স্থলে নতুন নৌযান পাঠাতে হবে। নতুন নৌযানে করে আসা কর্মচারী তো সেই নৌযানেই ডিওটি করবে। পুরাতন কর্মচারীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া তো তাদের জন্য সম্ভব হবে না।

(৩) কুয়েতের সহায়তার জন্য মার্কিন সৈন্যদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এর চার হাজার সৈন্য কুয়েতে প্রেরণ করা হয়েছে।[১১৬]

(৪) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বৃটিশ জলযান। আনভিজিবেল আগামী মাসে উপসাগরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।[১১৭]

প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, এই বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কী? পূর্ব থেকে থাকা বিশাল জলযান, বিপুল পরিমাণ নৌ ও বিমান বাহিনী সাদ্দামের সাথে লড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না, যিনি ভেজা বিড়ালের ন্যায় মাটির নিচের আস্তানায় আত্মগোপন করেছিলেন? মূলত এসব কিছু সামনের পদক্ষেপসমূহের প্রস্তুতি। সেই পদক্ষেপ যা সম্পর্কে সতর্ক করার অপরাধে পবিত্র মসজিদে নববীর খতিব শাইখ আবদুর রহমান আল-হোজাইফীকে নববী মুসল্লা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যাদের সাথে লড়াই করার কারণে শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ- কে স্বীয় ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয়েছে এবং এক হিজরত থেকে দ্বিতীয় হিজরত করতে হয়েছে। সেই পদক্ষেপ যা পরিমাপ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিজেদের জীবনের পরওয়া না করে মুসলিম উম্মাহর নিকট পবিত্র হারামাইনকে রক্ষার আবেদন করে যাচ্ছেন।

পবিত্র হারামাইনের সংরক্ষণ কীভাবে সম্ভব?

হে মুসলমান! প্রথম কেবলা ছিনিয়ে নেওয়ায় ইহুদিদের ও তাদের নেতৃবৃন্দের যে ঋণ তোমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে এখনো তোমরা তা পরিশোধ না করতেই ওরা পবিত্র হারামাইনের ওপর দৃষ্টিপাত করে তোমাদেরকে আরও অধিক পরিমাণে ধ্বংস করতে চায়। এখন আর অলসতার কোন সুযোগ নাই। কাজের সময় খুব অল্পই বাকি আছে। পবিত্র হারামাইনের সংরক্ষণের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে যাও। লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড় এবং কুফরের শক্তিকে তাদের ধোঁকাবাজিসহ কোন অন্ধকার কূপে, কোন গভীর গর্তে, কোন অন্ধকার কবরে দাফন করে দাও। "মনে রেখ! এ সময়ে

১১৬. রোজনামা জংগ, ২০ ডিসেম্বর১৯৯৮
১১৭. রোজনামা জংগ, ২১ ডিসেম্বর১৯৯৮

বাইতুল্লাহর তোমাদের উমরাহ ও তাওয়াফের প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন উচ্ছল তারুণ্য এবং প্রবাহিত রক্তের।" এই যৌবন আল্লাহর ঘরের নিরাপত্তার জন্য লুটিয়ে দাও। এমন জীবন মিলবে যা মৃত্যুর ক্ষমতার বাহিরে। নিজের ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত কা'বাতুল্লাহর পবিত্রতার ওপর নিঃশেষ করে দাও। এমন সম্মান ও শান্তি মিলবে যা চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। কুফর তোমাদের অস্থায়ী অলসতাকে মনে করেছে যে এই ঈগল মনে হয় উড়ার উপযুক্ত নয়। এই সিংহ মনে হয় থাবা ভুলে গেছে। তাদের ভুল ধারণা দূর করতে বিলম্ব করনা। এখানে বিলম্বকারী কেয়ামতের দিন পেছনে থেকে যাবে। জলদি কর! আল্লাহর নাম নিয়ে সাহসে কোমড় বেঁধে নাও। এবং কবিতার আমলী ব্যাখ্যা হয়ে যাও-

"হে কা'বা তুমি ডেকেছো তো রক্ত উথলে উঠেছে,
তোমার সন্তান, তোমার জানবাজ চলে এসেছে।"

নিজের তন-মন-ধন তথা সর্বস্ব বাইতুল্লাহর জন্য কুরবান করে দাও। দুনিয়াতে ইজ্জত এবং আখেরাতে জান্নাত পেয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে যান, আমিন।

উপসাগরে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধ

ইরাকে ইহুদিদের এবং ক্রুসেডার খ্রিষ্টানদের ছড়িয়ে দেওয়া কেয়ামতের (যুদ্ধের) বিরতি হয়েছে কয়েকদিন হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্ব সেই ধাক্কা এখনো সামলে উঠেনি। অমনি মার্কিন বিমান পুনরায় ইরাকে বোমা বর্ষণ করছে। এবার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, ইরাক যেহেতু তদন্তকারী গোয়েন্দা বিমানকে উড্ডয়নের অনুমতি দেয়নি এজন্য এদেরকে শিক্ষা দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এই হামলায় যা ইরাকের মিজাইল নিক্ষেপকারী একটি চৌকিতে করা হয়েছে চারজন ইরাকি সৈন্য শহিদ এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ইবলিসের এই নৃত্যে বৃটেন যে আমেরিকার বিনয়ী অযাচিত অতিথি হয়ে আছে এবং বর্তমানে আমেরিকার ইশারায় নাচার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, নিয়মানুযায়ী আমেরিকার যথেষ্ট সঙ্গ দিয়েছে। প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, যখন চার দিনের হামলার সমাপ্তিতে বলা হয়েছিল- ইরাকের ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের শক্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে বর্তমানে তাদের ওপর হামলার উদ্দেশ্য কী? তাদের অর্থনৈতিক অবরোধ কোন অপরাধে অব্যাহত রয়েছে? যখন অস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এই তদন্তই বা কি উদ্দেশ্যে?

মুসলমানদের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তির ধ্বংস

পেছনের উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে সামনে এসেছে সে অনুযায়ী এ যুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর একশত কোটি ডলারেরও বেশি খরচ করানো হয়েছে। যার ফলে আজ সৌদি আরবের মতো এত ধনী দেশও ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে। বর্তমান চারদিনের যুদ্ধ সম্পর্কে আমেরিকাও বৃটেনের বক্তব্য হলো, ৮০ ঘন্টার হামলায় একশত লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানানো হয়েছে। বিমান উড্ডয়ন করেছে ৬ শত বার। ৪ শত ৪৫টি ক্রোজ মিজাইল নিক্ষেপ করা হয়। একটি মিজাইলের মূল্য সাড়ে সাত লাখ মার্কিন ডলার। এমনিভাবে দুই দেশ মিলে মাত্র চারদিনে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার মূল্যের শুধু মিজাইলই নিক্ষেপ করেছে। আর যে পরিমাণ বোমা বর্ষণ করা হয়েছে তার হিসাব না হয় বাদই দিলাম। সর্বমোট চারদিনের এই যুদ্ধের ব্যয় প্রায় ৬০ কোটি ডলার।

হে মুসলমান! তোমরা কি মনে করেছ তোমাদের এই হিতাকাঙ্ক্ষী ও তোমাদের জন্য বিনামূল্যে সেবাদানকারী রাষ্ট্র এই খরচ নিজের পকেট থেকে আদায় করবে? যখন এরা তোমাদের নিরাপত্তার জন্য এতটা প্রাণপণে লড়েছে তাহলে এই উদ্দেশ্যহীন চৌকিদারীর ভাতাও তোমাদের থেকেই আদায় করবে। হায় আফসোস! কেমন হাস্যকর নির্যাতন! এক ভাইকে ধ্বংস করার মূল্য অপর ভাই থেকে আদায় করা হচ্ছে। যা সর্বশেষ উভয়েরই ধ্বংস এবং গোলামীর ওপর সমাপ্ত হবে।

বর্তমান যুগের ফেরআউন

আমেরিকা বর্তমানে সুপার পাওয়ার হওয়ার নেশায় মত্ত। তার এই দাবি ফেরআউনের খোদায়ী দাবির মতো বড় খোদার সাথে মিল রয়েছে। ইতিহাস নিজেকে নিজে পুনরাবৃত্তি করছে। ক্ষমতা ও নেতৃত্বের যে নেশা ফেরআউনের মাথায় সওয়ার হয়েছিল এবং যা তাকে নীলনদে ডুবিয়ে ছেড়েছিল। আজ গোটা মার্কিনী জাতি সেই শয়তানী দাম্ভিকতার ধ্বংসে লিপ্ত দেখা যাচ্ছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত নিয়ম প্রকৃতি অনুযায়ীই মনে হয়- তার সকল দাজ্জাল ও ধোঁকাবাজ এবং জুলুম নির্যাতনসহ আটলান্টিক মহাসাগরে সমাধিস্থ হয়ে যাবে ইন শা' আল্লাহ।

আন্তর্জাতিক দ্বৈত নীতি

ইহুদিদের হাতে কাঠের পুতুলের ন্যায় নৃত্যকারী এই জাতি ধোঁকাবাজি ও চালবাজির আশ্চর্য আশ্চর্য পরিভাষা ও নিয়ম বানিয়ে রেখেছে। যার সাহায্যে ওরা বিশ্বের অন্যান্য জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে যখন ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারে। যেমন ইচ্ছা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাদেরকে তাদের বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। বৈধ ইচ্ছাসমূহ থেকেও ফিরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু নিজেরা যদি নিজেদের অসৎ ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য সরাসরি অন্যায় হস্তক্ষেপও করে তাহলে তাদেরকে প্রতিহতকারী কেউ নাই। কোন আইন ওদের হাত আটকাতে পারে না। কোন চারিত্রিক মূল্যায়নই ওদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে না। যেমন ধরুন, কিছু পরিভাষা : মানুষের মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক চারিত্রিক মূল্যায়ন, নারী অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহার করে কখনো ওরা জিহাদকে সন্ত্রাস আখ্যা দেয়। কখনো পর্দাকে ব্যক্তি ও নারী স্বাধীনতার বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। এগুলোর আড়ালে ওরা মুসলিম দেশগুলোর সহায়তা করাকে অসম্ভব শর্ত নির্ভর করে দেয়। মুসলিম মুজাহিদদেরকে সফল হতে দেখলে তাদেরকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু এসকল আইন-কানুন ও পরিভাষাসমূহকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপনকারী দেশ নিজে যদি কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেও আক্রমণ করে তাহলে উপরোক্ত বিষয়গুলো তাদের কোনপ্রকার অন্তরায় হয়না। আর যদি কোন কাফের রাষ্ট্র কোনো মুসলিম দেশকে প্রকাশ্যে বর্বরতা, পশুত্ব ও হিংস্রতার লক্ষ্যবস্তু বানায় তাহলে ওরা এসকল সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক বাণীসমূহকে কার্যকর করে তাদেরকে নিষেধ করে না।

উদারতার খোলসে মার্কিন জাতির দ্বৈতপনা

এই দ্বৈতপনা ও দ্বিমুখী আচরণকে একটি ঘটনা দিয়ে বুঝুন। গত বছর আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে একব্যক্তি এজন্য নিজের কুকুরকে আঘাত করেছে, কুকুরটি তার ছেলের গাল খামছে ধরেছে আর ছাড়তে চাচ্ছিল না। আঘাত কিছুটা এমন মারাত্মক ছিল, কুকুরের জীবন বিপন্নকারী প্রমাণিত হয়। উক্ত ব্যক্তির প্রতিবেশী এই পুরো ঘটনা দেখছিল। সে সাথে সাথে প্রশাসনকে ফোন করে দেয়। সে ব্যক্তি তখনও তার ছেলের জখম পরিষ্কার করছিল। অমনি পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির। ঘটনাস্থলের ছবি নিল। হত্যার নিদর্শন চিহ্নিত করল। হত্যাকারীর হাতের ছাপ সংগ্রহ করল এবং তাকে গ্রেপ্তার করে

জেলে পাঠিয়ে দিল। পরের দিন যখন এই ঘটনা সংবাদপত্রে ছেপে আসল তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠল। জনগণ রাস্তায় নেমে আসল এবং শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো তার প্রতিকারের জন্য উঠেপড়ে লাগল। প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলো মিছিল বের করল। জনগণ হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাল। সংবাদপত্রগুলো এই নির্মম ঘটনার ওপর সম্পাদকীয় লিখল। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবাদ এত বড় আন্দোলনের রূপ নেয় যে মার্কিন প্রশাসন সব কাজকর্ম ফেলে এই মামলা নিস্পত্তি করতে বাধ্য হয়। আদালতে অপরাধী (পুত্রের ভালোবাসায় অক্ষম পিতা) এবং নিহত কুকুরের আইনজীবীরা প্রমাণাদীর স্তূপ জমা করল। অপরাধীর মানসিক পরীক্ষা করানো হয়। মানসিক বিশেষজ্ঞদের থেকে মতামত নেওয়া হল। সাক্ষীদের দীর্ঘ বর্ণনা উপস্থাপনের পর জুড়িবোর্ড অপরাধীকে মানসিক রোগী আখ্যা দিয়ে তারপর ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং বাকি জীবন কুকুরের অধিকার সংরক্ষণের জন্য উৎসর্গ করার উপদেশ দেওয়া হয়। এ সময়ে এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে বলা হয়, অনেক মার্কিনী এমন রয়েছে যারা এই মামলার শোনানী অবস্থায় নিদ্রাহীনতার শিকার ছিলেন। তারা ঘুমের মধ্যে এই কুকুরের আঘাতপ্রাপ্ত মাথা স্বপ্নে দেখতেন। যারফলে তাদের নিদ্রা উড়ে যেত।

প্রাণীসমূহের অধিকার সংরক্ষণকারী ও বাকহীনদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পাকারী এই জাতির উদ্যম আপনারা অবলোকন করলেন। এখন আসুন তাদের দ্বীমুখী আচরণের একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। ইরাকের ওপর ১৯৯১ সালে অপারেশন ডিজার্ট স্টাম এর নামে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধে আমেরিকাসহ মোট ২৮টি দেশ ২ হাজার ৬ শত যুদ্ধ বিমানের মাধ্যমে ৮৮ হাজার ৫ শত টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করেছে। যাতে হাজারো মানুষ শহিদ হয়েছে, অসংখ্য বাড়ি-ঘর উজার হয়েছে। এই আক্রমণের সময় যে সকল অত্যাধুনিক অস্ত্র পরীক্ষা করা হয়েছে, যা এর পূর্বে কোন রণাঙ্গনে ব্যবহৃত হয়নি। কুয়েত থেকে ফিরে আসা সত্ত্বেও কুয়েত খালি করার সময় ইরাকি সৈন্যরা যে মরুভূমিতে অস্ত্রবিহীন ফিরছিলেন, তাদেরকেও আকাশ থেকে গুলি বর্ষণ করে পশুর মত নিশানা বানানো হয়েছে। অতঃপর এরপর থেকে আট বছর হয়ে গেছে ইরাক অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার। এই অবরোধের ফলে ইরাকের ১৫ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণা ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। হতভাগা মায়েরা কষ্টের প্রতিচ্ছবি হয়ে নিজেদের কলিজার টুকরো সন্তানকে জমিনের গভীরে পতিত হতে দেখে আফসোস ও কান্নাকাটির এমন

হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেছে যে তাতে আকাশও অশ্রু বর্ষণ করেছে। এ সকল বিপদের পরেও তাদের ওপর অপারেশন ডিজার্ট ফক্স নামে নতুন শাস্তির অবতারণা করা হয়েছে। ৮০ ঘণ্টায় ইরাকের ওপর ২ শত হামলা হয়েছে। বায়ান্নটি বিমান দিয়ে বাগদাদের ঘরবাড়ি ও হাসপাতালসমূহের ওপর দুই হাজার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। নৌযানগুলো থেকে মজলুম ও অসহায় শহরবাসীর ওপর ৪ শত এর অধিক ক্রোজ মিজাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে। লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করেছে। লাখ লাখ লোক আহত হয়েছে। কিন্তু সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত, ওয়াশিংটন থেকে জেনেভা পর্যন্ত লন্ডন থেকে হেগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন সমাবেশ করেনি। কোন সংগঠন সামান্য নিন্দা পর্যন্ত জানায়নি বরং উল্টো মুচকি মুচকি হেসে অপারেশনের সফলতা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর আরো অধিক হামলার ঘোষণা করা হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের প্রতি ইরাকি মুসলমানদের জিজ্ঞাসা

এ অবস্থায় ইরাকি মুসলিমদের ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ, জ্বলন্ত শরীর এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশগুলোর মুসলিম বিশ্বের নিকট জিজ্ঞাসা, আমাদের মর্যাদা কি তোমাদের নিকট এতটুকুও নেই যতটুকু মার্কিনীদের নিকট তাদের কুকুরের রয়েছে? সেখানে একটি কুকুরের মৃত্যুর জন্যে গোটা দেশ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। এসকল জনগণের নিদ্রা উড়ে যায়। আর এখানে আহতদের লাইন লেগে আছে, লাশের স্তূপ জমা হয়ে আছে। তাতেও না তোমাদের টনক নড়ে, না তোমাদের ঈমানী আত্মমর্যাদায় শিহরণ উঠে। না তোমাদের মজলুম মুসলিম ভাইদের জন্য কোন পেরেশানি আছে, না তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের কোন চিন্তা-ভাবনা আছে! মনে রেখ, আমেরিকার বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য-বস্তু কেবল আমরা নই, যদি এভাবে অলসতায় নিমগ্ন থাকো তাহলে এই লক্ষ্য-বস্তুর শিকারে একদিন তোমরাও পরিণত হবে।

মুসলিমদের আত্মমর্যাদার জন্য দুঃখজনক শিক্ষা

বিশ্ব কুফরের দুঃসাহস এ পর্যন্ত বেড়েছে যে এখন আর তারা তাদের প্রকৃত নিষিদ্ধ চেতনাকে লুকানোরও প্রয়োজন মনে করে না। এই তো সেদিন এক মার্কিন ব্লগার ইন্টারনেটে বিশ্ব মুসলিমের পবিত্র স্থানসমূহ বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে বলেছে, আমরা ইরাকিদেরকে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত

বানিয়েছি এবং এখন আমাদের মনোযোগ আমাদের অন্যান্য স্বার্থের দিকে।[১১৮]

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর মান্নত

আহ আফসোস! সেই সময় এসে গেছে, ইহুদিরা বোমার ওপর রমজানের উপহার লিখে মুসলমানদের বিদ্রূপ করছে। কখনো আমাদের পবিত্র স্থানসমূহ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। গোটা মুসলিম বিশ্বে সালাহুদ্দীন আইউবীর উত্তরসূরি কোনো যুবক নাই—যে তাদেরকে তাদের এই উপহারের জবাব দেবে। সেই হুমকির শাস্তি দেবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবীর যুগে যখন এক অভিশপ্ত খ্রিষ্টান এ ধরনের দৃষ্টতা দেখিয়েছিল তখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবী মান্নত করেছিলেন, যদি এই বেয়াদবকে হাতের কাছে পাই তাহলে আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করব। যখন সুলতান একের পর এক যুদ্ধাভিযানের পর তার ওপর বিজয় লাভ করলেন তখন তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন! শোন নরাধম! আমি তোকে হত্যা করার জন্য দুইবার কসম খেয়েছি। একবার যখন তুই মক্কা ও মদীনার পবিত্র শহরে আক্রমণ করতে চেয়েছিলি। দ্বিতীয়বার ওই সময় যখন তুই ধোঁকাবাজি ও বাটপারি করে হাজীদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিস। দেখ! এখন আমি তোর বেআদবী ও অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছি। এই বলে সুলতান তরবারী বের করলেন এবং যেমনটি ওয়াদা করেছিলেন, সেই দুষ্ট ও অভিশপ্ত 'এজিনাল'-কে হত্যা করলেন।[১১৯]

আফসোস! বর্তমানেও যদি কোন আইউবীর উত্তরসূরি তৈরি হয়ে যেত এবং এই অভিশপ্তগুলোকে তাদের শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌছে দিতো।

ধোঁকাবাজ ইহুদি

ইরাকে চলমান বর্তমান ঘটনার সাথে ইয়াহুদিদের বিশেষ ধোঁকাবাজি ও বাটপারি এবং ধারাবাহিক মুনাফেকি ও চালবাজি পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়। স্বয়ং আমেরিকা তার সংবিধানে সুস্পষ্ট বলেছে, অন্য কোন দেশের ওপর হামলা করতে হলে বিশেষ অবস্থায় করা যেতে পারে। তবুও এর জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন জরুরি মনে করা হয়। এমনিভাবে ইউএন চার্টার, ও

---

১১৮. রোজনামা জংগ-৯ম সপ্তাহ-১৯৯৯

১১৯. তারিখে দাওয়াত ও আজিমত, মাওলানা আলী মিয়া নদভী, ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা

নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্বশীলদের বিশ্ব সংস্থার অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এসকল কার্যক্রমের পরেই কেবল অন্য কোন দেশের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ইরাকের ওপর করা বর্তমান আক্রমণে এ সকল নিয়ম নীতিকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলা হয়েছে। না এমন কোন বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল যার ওপর ভিত্তি করে ইরাকের ওপর হামলা করা যেতে পারে। না মার্কিন কংগ্রেসের কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। যা হয়েছে তা হলো ধংসাত্মক রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান যে ছিল একজন চূড়ান্ত বিতর্কিত ব্যক্তি। তার রিপোর্ট জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দেওয়ার দুই দিন পূর্বে রবিবার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে পাঠিয়ে দেয় এবং তাকে এটাও বলে দেয় যে জাতিসংঘে এই রিপোর্ট কখন উপস্থাপন হবে। ক্লিনটন ঐ সময়ে ইসরাইল সফরে ছিলেন। তখনই হামলার সকল প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করেন এবং যে রিপোর্টই জাতিসংঘে পৌছাক সে ইসরাইল থেকে আমেরিকা ফেরত আসার সময় বিমান থেকেই হামলার নির্দেশ দিয়ে দেয়। এবং এ সকল আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুনের অনুগত সংস্থাগুলোর নাকের ডগায় ইরাকি মুসলমানদেরকে রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। না নাম-মাত্র মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলেছে, না শান্তি ও নিরাপত্তার ধ্বজাধারী পশ্চিমা দেশগুলো এর বিরুদ্ধে কোন নিন্দা জানিয়েছে।

জিহাদ ত্যাগের অশুভ পরিণতি

উসমানী খেলাফতের পতনের পরে মুসলিমদের রক্ত সস্তা হয়ে আসছে। খেলাফতের ছায়া হতে বঞ্চিত এবং জিহাদ ত্যাগ করার পরিণতিতে কাফেররা মুসলমানদের ওপর ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে মুসলমানদের রক্ত দিয়ে হুলি খেলা হচ্ছে এবং যেভাবে মুসলমান অসহায়ভাবে তামাশা দেখছে তা একেবারেই উপমাহীন। যুগ কেয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর আমরা এখনো জিহাদ ফরজে আইন নাকি ফরজে কেফায়া সেই আলোচনায় ব্যস্ত আছি। কাফের তাদের ওপর হিংস্রপ্রাণীর ন্যায় ধেয়ে আসছে আর এদের এখনো ইকদামী ও দিফায়ী তথা আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের কলহই শেষ হয়নি। ঝড় মাথার ওপর পৌঁছে গেছে আর এরা এখনো রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য মাতা-পিতাকেই রাজি করাতে পারেনি।

পশ্চিমা জাতিগুলোর দ্বিমুখী নীতি

হে মুসলমান, তোমাদেরকে কে বুঝাবে? কাফেররা তোমাদের সাথে লেনদেনের জন্য দুই ধরনের নীতি তৈরি করে রেখেছে। এই জাতিসংঘকেই যখন কোন মুসলমানের সাথে করা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন ওরা আইনের চাহিদা পূরণের ওপর জোড় প্রদান করে। এই শক্তিগুলোই যারা ইরাক ও ফিলিস্তিনীদের থেকে নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা বানানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আক্রমণ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপে প্রধান ভূমিকা রাখে। নিজেদের অবৈধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তাদের ওপর নিয়মিত সৈন্যসমাবেশ করা হয়। তাদেরকেই যখন ভারত ও ইসরাইলের নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তাদের বিরোধিতার অভিযোগ করা হয় তখন তাদের অজুহাত হয়- ওরা স্বাধীন রাষ্ট্র। সুতরাং জাতিসংঘ তাদের ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত জোড় করে চাপিয়ে দিতে পারেনা। এই আমেরিকা যে ইরাককে তার অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য সকল নিয়ম-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। তাদের নয়নের তারকা ইসরাইল যখন সরাসরি জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের ভূমিতে ছুঁড়ে মারে তখন তাদের দিকে চোখ তুলেও দেখেনা। ওরা দিন দুপুরে পশ্চিম তীর, গাজা ও দক্ষিণ লেবাননে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু তাদেরকে কোন বাধা দেওয়া হয় না। চুক্তি লঙ্ঘন করে মুসলিম ভূমিতে ইহুদিদের আবাসন নির্মাণ করে। পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার জমা করা হয়, কিন্তু তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড আমেরিকা ও তার মিত্রদের নিকট মনোরঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক মনে হয়। চরিত্রের এই দ্বিমুখী নীতি, মুনাফেকীর এই নিকৃষ্ট উদাহরণ, ধোঁকাবাজি ও চালবাজি, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার এই হাতকড়া দেখে মুসলমানদের অনেক কিছু ভাবার ও অনেক কিছু করার জন্য তৈরি হওয়া উচিত।

কথা যখন দ্বিমুখী নীতি নিয়েই হচ্ছে, তাহলে আরেকটু শুনুন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী, নারী-পশু-গাছ-পরিবেশ সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় দাবিদার আমেরিকার কাশ্মীরে সংগঠিত কেয়ামতে ছুগরার কোন ঝলক দৃষ্টিগোচর হয়না। বসনিয়া এবং কসোভোর মজলুমদের আর্তচিৎকার তাদের বধির কান অতিক্রম না করে অনর্থক হিসেবে ফিরে আসে। ইসরাইলের ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনের মুহাজির ক্যাম্পে বর্বর বোমা বর্ষণের সংবাদের ওপর তাদের প্রথাগত নিন্দা জ্ঞাপন ও কষ্টকর মনে হয়, কিন্তু ইরাকের বিরুদ্ধে যেই পারঙ্গমতা ও শিক্ষণীয় নির্লজ্জ নির্মমতার সাথে আক্রমণ করা হলো তা দেখে

এমন মনে হয়, যেন গোটা পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা ইরাককে দমিয়ে রাখার ওপরই নির্ভর। যদি বাগদাদকে পরাজিত না করা যায় তাহলে ওরা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। ইরাকের না করা অপরাধের ওপর তাদেরকে শাস্তি দিতে মার্কিন শাসকরা বাথরুমের বাইরে দাঁড়ানো অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণকারী ব্যক্তির ন্যায় যার প্রয়োজনের অধিক পূর্ণপেট এবং সুযোগের অতিরিক্ত খাদ্যনালী খালি করা প্রয়োজন। পেটের ব্যথায় অস্থির, তাই পেট খালি করা ব্যতীত থাকতে পারছে না।

অসাবধানতার অপরাধ

হে মুসলমান, এখন পর্যন্ত যা হওয়ার হয়ে গেছে। যে পরিমাণ শৈথিল্যের অপরাধ করার করেছ। এখনও তো অন্তত সতর্ক হও। কুফরের যাদু মাথার ওপর এসে ডাকছে। পশ্চিমা শক্তি মরু ঝড়ের ন্যায় ধেয়ে আসছে। সেই যাদুর কারিশমা চূর্ণ করতে সেই ঝড়ের গতি ফেরাতে প্রস্তুত হয়ে যাও। অসন্তুষ্ট প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নাও এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সাথে নিয়ে কুফরের স্রোতের সামনে বাধ দিয়ে দাও। তার আক্রমণের সামনে নিজেকে সঁপে দাও।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

গায়েবের ইলম তথা অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর। তবে আমেরিকার বিগত কর্মকাণ্ড দেখে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অনুমান করা কোন কঠিন নয়। ঈদের পরে ইরাকের ওপর নতুন করে আক্রমণের হুমকি তো ওরা পূর্ব থেকেই দিয়ে আসছে।[১২০]

কিন্তু আমেরিকার কর্মপদ্ধতি বুঝার মতো মুসলিম পর্যবেক্ষকরা অন্য কোন দিকেও ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আমেরিকার কর্মপদ্ধতি হলো, কোন হামলার পূর্বে প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত তৈরি করে। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং ইরাকের বিরুদ্ধে আরো বৃহৎ আক্রমণের জন্য যে পরিমাণ সামরিক শক্তি প্রয়োজন ছিল তা বিভিন্ন ছাউনিতে পৌছানোর জন্য ওরা নিয়মিত এই প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে দিয়েছে—মার্কিন দূতাবাস ও অন্যান্য স্বার্থের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের আশঙ্কা অনেক বেড়ে গেছে।

---

১২০. দেখুন-২১ ও ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং সংবাদপত্র

অনেক সেনা ছাউনির বিরুদ্ধে হামলার আশঙ্কার মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডাও ছড়ানো হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার অজুহাতে জনবল ও সামরিক সরঞ্জামাদি একত্র করা হয়েছে। এখন ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরে আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষ থেকে চিৎকার করা হচ্ছে, উসামা বিন লাদেন প্রতিশোধ নেবে এবং তখন এটা বলা হচ্ছে, উসামার আক্রমণ আরব দেশসমূহে আমেরিকা ও বৃটেনের দূতাবাসসমূহের বিরুদ্ধে হবে। এই সংবাদের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, আমেরিকার বিশ্বাস, যে আরব দেশসমূহে মার্কিন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সুযোগ পায় না, সেখানে প্রচণ্ড ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমেরিকার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক গুপ্ত হামলার মাধ্যমেই হবে। যদি এমন হয় তাহলে এসকল হামলাও উসামা বিন লাদেনের খাতায় জমা করা হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এসকল সংবাদের দ্বারা বুঝা যায়, তা হলো আমেরিকা এখন উসামার বিরুদ্ধে হামলার অজুহাতে পুনরায় আফগানিস্তানে মিজাইল নিক্ষেপের পরিকল্পনা করছে। এই হামলা দ্বারা একটি উদ্দেশ্য হলো উসামার দ্বারা সন্ত্রস্ত আরব শাসকদের একথা বিশ্বাস করানো, আমরা ভেতরেরও বাইরের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত আছি। বরং শুধু আমরাই তোমাদেরকে নিরাপত্তা সক্ষম। এজন্য আমাদের সৈন্যদের উপস্থিতি প্রয়োজন ও অত্যাবশ্যক।

কুদরতের নিয়ম

মার্কিনী ইহুদিদের এবং বৃটেনের খ্রিষ্টানদের পরিকল্পনা যাই হোক, তবে কিছু সিদ্ধান্ত কুদরতেরও হয়ে থাকে এবং সেটাই বিজয়ী থাকে। কুদরতের অটল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি কিংবা দেশ বা জাতিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই ছাড় দেয়া হয়। ক্ষমতার নেশা ও নেতৃত্বের অহংকার যখন সীমা অতিক্রম করে ফেলে তখন কুদরতের কাজ শুরু হয়ে যায়। বিশ্বের ইতিহাস সাক্ষী, যখন কোন ব্যক্তি কিংবা জাতি সীমা অতিক্রম করে, প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে পদদলিত করে, আল্লাহর সৃষ্টির জন্য শাস্তির কারণ হয়ে যায়—তখন গায়েব তথা অদৃশ্যের পক্ষ হতে প্রচণ্ড এক ঝড় চলে আসে, যা ফেরআউন নমরুদদের বস্তি এবং গর্বও অহংকারের প্রাসাদসমূহকে খড়কুটার ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। স্বেচ্ছাচারী জনতা ও স্বৈরাচারী শাসকদেরকে উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেয়। আমেরিকা গোয়ার্তুমি, ধোঁকাবাজি, মুনাফেকি ও স্বেচ্ছাচারিতার যে নীতির ওপর চলছে তা খুব শীঘ্রই সেই চূড়ান্ত পরিণতি

পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যা জমিনের ওপর প্রভু হওয়া এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য দুঃখ ও কষ্টের কারণ হওয়া লোকদের জন্য কুদরত কর্তৃক নির্ধারিত। বৃটিশদের রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যেত না। আজ ওরা যে উপদ্বীপে জড়সড় হয়ে বাস করছে সেখানে সূর্য উদয় হয় না। আজ থেকে মাত্র দশ বছর পূর্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হওয়ার ধারণা করাটা কেমন ছিল? আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শোচনীয় পরাজয়ের শিকার তা দেখেই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বের দৃঢ় বিশ্বাস চলে আসে। অর্ধ পৃথিবীর ওপর রাজত্বকারী এবং গোটা পৃথিবী দখলের স্বপ্ন লালনকারী অত্যাচারী জাতি আজ তাদের শত্রু প্রদত্ত খয়রাত খাচ্ছে। সেখানের প্রেসিডেন্ট নিজের ভাতা চালু না হওয়ায় ক্রন্দনরত। আফগানিস্তানে পঙ্গু হওয়া সৈন্যরা মহা সড়কের পাশে একত্র হয়ে ভিক্ষা করছে। তাদের মধ্যে উচ্চ র‍্যাংকধারী অফিসারও রয়েছে। মোটেও আশ্চর্যের কিছু নয় যে আমেরিকাও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খুব শীঘ্রই সেই পরিণতিতে পৌঁছে যাবে যেই পরিণতিতে তাদের পূর্ববর্তীরা পৌঁছেছে। যদি রাশিয়ার অস্ত্রাগার তাদের কাজে না এসে থাকে তাহলে আমেরিকার ধোঁকা ও ছলচাতুরীও বেশি দিন ওদের সঙ্গ দেবে না ইন শা'আল্লাহ।

হে মুসলমান! সুন্নাতে এলাহী পূর্ণ হওয়ার সময় খুবই সন্নিকটে। কুদরতের প্রসারিত রশি গুটিয়েই নেওয়া হবে। ইহুদিদের ওপর বখতে নসর-এর আক্রমণের দৃষ্টান্ত পুনরায় স্থাপন হবেই। তাদের ওপর খাইবারের ন্যায় জ্বালানো পোড়ানোর দিন নিকটবর্তী, সুতরাং তোমাদের সামান্য ঈমানী বীরত্ব আর একটুখানি পুরুষদীপ্ত আত্মমর্যাদাবোধের প্রয়োজন। আরামপ্রিয়তা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার মুহাব্বত ও জান্নাতের আগ্রহের মাঝে পার্থক্যই আর কতটুকু? একটি নারায়ে তাকবিরের ধ্বনি। একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তের। দুনিয়ার জীবনের শৃঙ্খলকে ছুঁড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে নাও। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করো না, আল্লাহ তা'আলার রহমত ও ক্ষমা এবং তাঁর সৃষ্ট জান্নাতকে তোমরা অপেক্ষায় পাবে।

হে মুসলিম যুবকেরা! পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে লাঞ্ছিত জাতি বিতাড়িত ইহুদিরা তোমাদের মা-কে গালি দিচ্ছে আর তোমরা তাদের তৈরি বার্গার খাচ্ছ এবং 'কোমলপানীয়' পান করছ? ধিক! তোমাদের আত্মমর্যাদার ওপর। তোমরা এখনো তাদের সামনে ভিক্ষার থলি বিছিয়ে ভিক্ষা চাও এবং লাইন ধরে ভিসা প্রার্থনা কর? শত আফসোস তোমাদের পৌরুষত্বের ওপর। মনে রেখ! এই গালির জবাব দিতে হলে তোমাদেরকে নবীওয়ালা জীবনের

ওপর আসতে হবে। যদি নিজেদের আবিষ্কার করা পদ্ধতি অবলম্বন কর, তাহলে গালির এই দাগ ধোয়ার তোমাদের জন্য সাত সমুদ্রের পানিও যথেষ্ট নয়। আর যদি কুরআনের নির্দেশিত কর্মপন্থার ওপর আমল কর তাহলে কিছু যুবকও লাগবে না, পাথর এবং গাছ ডেকে ডেকে বলবে, এসো হে মুমিন! এই ইহুদি এখানে লুকিয়ে আছে, এসো তাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দাও। আল্লাহর দুশমন এখানে রয়েছে, তাকে তার পরিণতি চিরস্থায়ী জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দাও। কি চিন্তা করছ, আর কোনদিকে তাকাচ্ছ? উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ যদি নিজের পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন ছাড়তে পারে। বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ, কোটি টাকার সম্পত্তি বাইতুল্লাহর হেফাজত ও হারামাইনের পবিত্রতার জন্যে লুটিয়ে দিতে পারে। তাহলে তোমরা তোমাদের এই সাধারণ জীবন, এই স্বাদহীন দুনিয়া ছাড়তে পারবে না!

হে আল্লাহর বান্দারা! উঠো দাঁড়িয়ে যাও। হতে পারে এবার কুদরতে ইলাহীর লটারিতে তোমাদের নাম চলে আসবে। আল্লাহ তা'আলা এবার আবাবীলের হামলার কাজ তোমাদের দ্বারা নেবেন। আজ থেকে তেরোশত বছর পূর্বে তোমাদের এক কন্যার আর্তনাদে সাড়া দিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম আরব থেকে এসে তোমাদের প্রতিশোধ নিয়েছিল। আজ তোমাদের সেই ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। বিলম্ব করোনা। সওদা সস্তা নয়। ইহুদিদের গালির জবাব এবং বিন কাসিমের অনুগ্রহের প্রতিদান উভয়টা একসাথে আদায়ের এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না। জিহাদি প্রশিক্ষণের ক্যাম্প তোমাদের থেকে দূরে নয়। বীরত্বও সাহসিকতা প্রদর্শনের রণাঙ্গন তোমাদের জানাশোনার বাইরে নয়। তারপরেও অপেক্ষা কিসের? উঠো! সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। **"হয়তো সৌভাগ্যের জীবন নয়তো শাহাদাতের মৃত্যু। হয়তো ইজ্জতের দুনিয়া নয়তো চির সুখের জান্নাতময় আখেরাত।"**

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চুরি

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠনের লোমহর্ষক বিবরণ।

শরিয়তের নির্দেশনা অমান্যকারীর দীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস

মুসলমান যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মানা এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আদর্শের ওপর চলা ছেড়ে দেয় তখন তাদের পরকাল তো ধ্বংস হয়ই, ইহকালও ধ্বংস হয়ে যায়। এর একটি উপমা উপসাগরে আমেরিকা ও তার মিত্র সৈন্যদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া এবং মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা। আরবের ভূমি যা রুহানি বরকতসমূহের পাশাপাশি জাগতিক ও প্রাকৃতিক সবধরনের উপকরণ ও সম্পদে ভরপুর। তাতে প্রেট্রোল ও অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে ইহুদি খ্রিষ্টানরা ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিনা দাওয়াতে নোংরা অনাহূত অতিথির ন্যায় এখানে থাকা অগণিত ধন-সম্পদের ওপর লালা ঝরাতে লাগল। এখন শরয়ী নির্দেশনা ও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের দাবি তো ছিল, যখন অমুসলিম কোম্পানিগুলো তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ উত্তোলন, শোধন ও প্রেরণের চুক্তির চেষ্টা করছিল, তখন তাদের সাথে লেনদেনের পরিবর্তে নিজেদের ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশগুলোকে তাদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অন্যান্য কাজে এতটা উন্নত না হলেও; আকিদা ও আমল এবং নিয়ত ও ইচ্ছার দিক থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার এবং ইসলামের অটুট বন্ধনে জড়িয়ে থাকার কারণে ভ্রাতৃত্বের মূল্যবান প্রেরণায় উজ্জীবিত। এই আকিদা, আমল, নিয়ত, ইচ্ছা- ভ্রাতৃত্ব এমন বস্তু যার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করা যায়। যদি এমনটি করা হতো, মুসলিমদের সম্পদ দ্বারা মুসলিমদের উপকার হত এবং মুসলিম বিশ্ব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মজবুত হতো। এই অনুগ্রহ ও কল্যাণকামিতার ফলে সৌদি সরকার সারা পৃথিবীর মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। আধ্যাত্মিকভাবে তো আকিদা ও মুহাব্বতের কেন্দ্রবিন্দু পূর্ব থেকেই রয়েছে। বস্তুগতভাবেও পথ প্রদর্শক ও নেতা মেনে নেওয়া হত। এর যে উপকারিতা মুসলিম বিশ্বের এবং স্বয়ং সৌদি আরবের হত তাকি চিন্তা করা যায়?

শরয়ী নির্দেশনার বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি

তবে কৃতকর্মের মাশুল তো এই, শরিয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে অপবিত্র ও দুষ্ট ইহুদি খ্রিষ্টানদেরকে (আমেরিকা ও বৃটেন) এই মহামূল্যবান খনিজ ভাণ্ডারকে দীর্ঘ মেয়াদী ঠিকাদারী দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে সকল ফিকহী গ্রন্থে অমুসলিমদের দারুল ইসলাম তথা মুসলিম দেশে বসবাসের বিধান উল্লেখ রয়েছে—কোন অমুসলিমকে মুসলিম দেশে দীর্ঘদিন থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না। যদি অমুসলিমরা থাকার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তাদেরকে বলে দেওয়া হবে, যদি তোমরা এক বছরের অধিক সময় থাক তাহলে আমরা তোমাদের ওপর কর আরোপ করব।[১২১] এই নির্দেশ সাধারণ মুসলিম দেশসমূহের জন্য। আরব দেশসমূহের বিধান এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এরচেয়ে আরো কঠিন নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ফিকহ ও ফতোয়ার খুবই প্রসিদ্ধ কিতাব আদ্দুররুল মুখতারের তৃতীয় খণ্ডের ২০৮ পৃষ্ঠায় কিতাবুল জিহাদে উল্লেখ আছে, কাফেরদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে- তারা যেন পবিত্র হারামাইন শরিফাইনকে স্থায়ী নিবাস বানাতে না পারে। কেননা এই দুটো পবিত্র শহর আরব দেশের মধ্যে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ–**"আরব ভূমিতে দুটি দীন একত্র হতে পারবে না।"** যদি কাফেররা এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আসতে চায় তাহলে জায়েজ আছে তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। আল্লামা শামী রহ. তার ব্যাখ্যায় বলেন, এই হুকুম শুধু পবিত্র হারামাইনের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা আরব উপদ্বীপের জন্য একই হুকুম এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই নির্দেশ **"আরব উপদ্বীপে দুটি দীন একত্র হতে পারবে না"**। এটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িতাবস্থায় এরশাদ করেছেন এবং এই বর্ণনা মুয়াত্তায়ও রয়েছে যেমনটি মুহাক্কিক আল্লামা ইবনুল হুমাম ফাতহুল কাদিরে বর্ণনা করেছেন।[১২২]

পশ্চিমা জাতি ময়লার স্তূপে উদ্গত দুর্গন্ধময় উদ্ভিদ

এটা তো ছিল শরয়ী নির্দেশনা, কিন্তু যদি তা থেকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করা হয় এবং বিবেক ও দুনিয়াবী বিবেচনায়ও দেখা হয়, তাহলেও মার্কিনী ও বৃটিশরা কোনভাবেই এর যোগ্য ছিল না–নিজেদের সকল উপকরণ

---

১২১. হেদায়া ও ফাতহুল কাদির, নিরাপত্তা অধ্যায়, কিতাবুস সিয়ার, ২/২৭০

১২২. আদদুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, ৩/২৭০

ও সম্পদের ওপর এই বিষাক্ত সাপগুলোকে এনে বসানো হবে। লোভ লালসায় ভরপুর এবং ধোঁকাবাজি ও চালবাজিতে পরিপূর্ণ এই সংকীর্ণমনা ও নির্লজ্জ চরিত্রের ইহুদি-খ্রিষ্টানরা উত্তম চরিত্র থেকে তো শূন্যই এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনও অপবিত্র কর্মকাণ্ডে ভরপুরই থাকে। এছাড়াও মুসলমানদের সাথে তাদের চির শত্রুতা, তাদের পক্ষপাতিত্ব, সংকীর্ণমনা, বন্ধুবেশে শত্রুতার স্বভাব, মুসলমানদের সাথে তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবাদ- মোটকথা সর্বদিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেওয়া হবে এবং কেবল ব্যবসায়িক দিকটি সামনে রাখলেও এই অপবিত্র জাতির অতীত কোনপ্রকার ঈর্ষণীয় মনে হয়না। এর উপমা পাকিস্তানের আমেরিকা থেকে এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ক্রয়ের ঘটনা। আমেরিকা এত উচ্চমূল্য আদায়ের পরেও উপযুক্ত কোন কারণ ছাড়াই না পণ্য পরিশোধ করছে না মূল্য ফেরত দিচ্ছে। কষ্টের ওপর কষ্ট হলো, বিমান যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানের ভাড়াও পাকিস্তানের খাতায় লেখা হচ্ছে। এতগুলো বছরের শুধু ভাড়াও যদি হিসাব করা হয়, তাহলেও তা মূল্যের চেয়ে অধিক হয়। বর্তমানে নতুন এক সমাধান এই ঈমানদার ব্যবসায়ীরা এটা বের করেছে- বিমান তৃতীয় কোন দেশের নিকট বিক্রি করে মূল্য পাকিস্তানকে আদায় করে দেওয়া হবে। ইহুদিবাদী চিন্তা দেখুন। অর্থাৎ এই বিমানের মালিকানা যদি পাকিস্তানেরই হয় তাহলে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়না কেনো? এবং পাকিস্তানের অনুমতি ব্যতীত অন্য দেশের নিকট বিক্রি করে কীভাবে? আর যদি মালিকানা পাকিস্তানের না হয় তাহলে পার্কিংয়ের ভাড়া কেনো পাকিস্তানের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে? মোটকথা, ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের দিক থেকেও যদি দেখা হয় তাহলেও এই জাতি আবর্জনার স্তূপে জমা হওয়া দুর্গন্ধময় উদ্ভিদের ন্যায়।

পশ্চিমাদের সকল উন্নতি মুসলিম বিশ্বের সম্পদের স্তূপের ওপর

শত আফসোস! যে শরয়ী বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং সকল যুক্তি ও বিবেচনাকে ডিঙ্গিয়ে পরিণামের চিন্তা না করার প্রমাণ দিয়ে তাদের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করা হয়েছে এবং এখানে এই দুর্গন্ধময় জাতির এই সুযোগ মিলেছে, ওরা মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান এবং সর্বদা উজ্জ্বল খনিজ ভাণ্ডারে জোঁকের ন্যায় ঝেঁকে বসেছে এবং মুসলমানদের সম্পদ চুষে-চুষে এবং তাদের উপকরণ লুটে-লুটে নিজেদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। অতঃপর এই লুণ্ঠনকরা অর্থ থেকে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোকে ঋণ দিয়ে তাদেরকে ওদের অনেক শর্ত মানতে বাধ্য করা হয়। লুণ্ঠন শব্দটি

এখানে এজন্য বলা হয়েছে, প্রথম প্রথম শহীদ বাদশাহ ফয়সাল রাহিমাহুল্লাহ- এর সময় আমেরিকার আরামকো কোম্পানি সৌদি আরবকে রয়ালিটি প্রদান করত—যা প্রতি ব্যারেলে সত্তর সেন্ট থেকে সামান্য বেশি হয়, অর্থাৎ এক ডলারেরও কম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা- ৭৩ ঈসায়ী সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধ লেগে গেল। আরব দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং তেলের দাম বেড়ে প্রতি ব্যারেল ৩২ ডলার থেকে ৪০ ডলারে পৌঁছে যায়। এর ওপর মার্কিন ও ইউরোপীয় দেশগুলো যার অধিকাংশে একবিন্দু তেলও উৎপন্ন হয় না, নিজেদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। এবং নিজেদের সকল বাহ্যিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ভোগ-বিলাস মুসলমানদের পদতলে হারিয়ে যেতে দেখল। তখন ওরা এর কোন ভবিষ্যৎ সমাধান খুঁজতে শুরু করল এবং এখান থেকেই এই ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব, যার পরিণামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চুরি এবং সবচেয়ে বড় ডাকাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যা আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এবং এত বৃহৎ পরিমাণ-যার কোনো দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বিনাশ্রমে সম্পদ, নির্দয় অন্তর

এ কারণেই আমেরিকা সব ধরনের ধোঁকাবাজি করে এই চুরির বাস্তবতা প্রকাশ হতে দেয় না এবং কোনভাবেই এই আওয়াজ উঠতে দেয়না, যা তাদের লুণ্ঠনের পথে প্রতিবন্ধক হবে। ধোঁকা ও প্রতারণা, লোভ-লালসা ও হত্যার হুমকি- ধমকি, মোটকথা এমন কোনো যুদ্ধাস্ত্র নাই যা এ উদ্দেশ্যের জন্য ওরা ব্যবহার করতে পিছপা হয়। তাদের ভালো করেই জানা আছে, তাদের গোটা অর্থনীতি ও সকল ব্যবসা বাণিজ্য, পরাশক্তির দাবি, উন্নতির রং ঢং সবকিছু মুসলিম বিশ্বের সেই সম্পদের ওপর নির্ভর যা মুসলমানদের সরলতা ও অলসতা থেকে ফায়দা উঠিয়ে বিনাশ্রমে অর্জিত সম্পদ হেতু নির্দয় অন্তরে লুণ্ঠন করা হচ্ছে এবং এই লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতাকে সংরক্ষণের জন্য ওরা এতটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ে নিয়মিত বিভিন্ন আঘাত এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য স্বতন্ত্র সৈন্য এবং পরিপূর্ণ সেনাছাউনি প্রতিষ্ঠা করেছে। আরব দেশসমূহে কর্মরত পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলোর শেয়ার তো ইহুদিদের নিকটই এবং সেখানের কর্মচারীদের কলোনিগুলোর আবাসন ব্যবস্থাপনা কাফের আমেরিকা ও বৃটেনের ওপর তো ন্যাস্ত আছেই, এখন আবার তাদের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র বাহিনীও অমুসলিম

দেশ থেকে আবেদন করে আনা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন, এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুসলমানদের বিস্ময়কর-অবোধগম্য নির্জীবতার কেমন ভয়াবহ দিন জানি দেখতে হয়!

অবগতির পর অলসতার ক্ষমা নেই

বাস্তবতা হলো, এই ইতিহাস মুসলমানদের সরলতা এবং কাফেরদের ধোঁকাবাজির সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য গভীর ভাবনার বিষয়। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং এ পর্যন্ত লুটকরা সম্পদ উসুল করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর এমনভাবেই ফরজ মনে করতে হবে যেমনভাবে তাদের ব্যক্তিগত বস্তুর হেফাজত ও ফিরিয়ে আনাকে জরুরি মনে করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ডাকাতির ব্যাপারে জানা ছিল না। ততক্ষণ তো তাদের না জানার ওজর ছিল। কিন্তু অবগত হওয়ার পরে বড় আশ্চর্যের এবং আফসোসের বিষয় হলো, তারা নিজেদের সামান্য মূল্যের বস্তুর জন্য মৃত্যুবরণকে তো শহিদ মনে করে কিন্তু এত মূল্যবান ও অধিক পরিমাণ সম্পদ জোড়পূর্বক প্রকাশ্যে লুট হওয়ার ফলে না তাদের কোন ব্যথা-বেদনা আছে, না তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কোন চিন্তা-ভাবনা ও কষ্ট আছে। এটা ঈমানী আত্মমর্যাদা ও মুমিনের মর্যাদা পরিপন্থি। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চুরি। আসুন এ বিষয়ে আলোচনা করি- এই চুরি কীভাবে সম্ভব হলো এবং এর প্রতিকার কীভাবে করা যায়?

মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় ডাকাতি

১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ে সংঘটিত আরবের মুসলিম দেশগুলো যখন আমেরিকা ও ইউরোপের ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে আরব ইসরাইল যুদ্ধের (যাকে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম-ইহুদি যুদ্ধ বলা উচিত) পরে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তখন মার্কিনীরা একটি নতুন চাল চালে। তারা সর্বপ্রথম বাদশাহ ফয়সাল শহীদকে পথ থেকে সরিয়ে দিল। অতঃপর তেল উত্তোলনকারী দেশসমূহের একটি সংগঠন বানিয়ে দিল। তার মাধ্যমে তারা তেলের উত্তোলন ও সাপ্লাইয়ের কোটা নির্ধারণ করে আমদানি রপ্তানির আইনকে ব্যবহার করে তেলের মূল্যের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই নিয়ন্ত্রণ এমন ইজারাদারীর রূপ ধারণ করে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা নিজেদের মনমতো এমন মূল্যই নির্ধারণ করে আসছে-এটাকে যদি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য আখ্যা দেওয়া হয় তাহলেও

অতিরঞ্জন হবে না। ১৯৮০ সালের পরে দুই দশকে প্রতিটি বস্তুর দাম বেড়েছে। কিন্তু মুসলিম আরব দেশগুলোর পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির পরিবর্তে উল্টো আরো তিনগুণ কমে প্রতি ব্যারেলে নয় ডলারে চলে এসেছে। যখন পেট্রোল হলো ঐ বস্তু যার ওপর আজকের যান্ত্রিক পৃথিবীর সকল শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ও উদ্যান, আমদানি ও রপ্তানি মোটকথা- গোটা অর্থনীতি এর ওপর নির্ভরশীল। মূল্য হ্রাসের এই উল্টো গতির অন্যতম একটি কারণ, এই সম্পদের মালিক মুসলমানরা যারা নিজেরাই নিজেদের শাহরগ (স্কন্ধ শিরা) কাফেরদের আঙ্গুলির নিচে দিয়ে রেখেছে এবং ক্রেতা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা, যারা মুসলমানদের শত্রুতার কোনপ্রকার সুযোগ হাতছাড়া করে না। এরা এই লুটের মাল হাতিয়ে নিতে কোন প্রকার অলসতা সহ্য করে না। যেহেতু এ সময়ে পেট্রোলের দাম কমে গিয়েছে এবং যে সব বস্তু এই তেলের সাহায্যে তৈরি হয় তার মূল্য চারগুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়। এখন যদি ধরুন, আমরা পেট্রোলের দাম চারগুণ বাড়িয়ে দেই যখন তার প্রকৃত মূল্য সেই প্রতি ব্যারেলে ৩৬ ডলারই রাখা হয় যা শুরুতে ছিল, তাহলে প্রতি ব্যারেল ১৪৪ ডলার হবে। আমেরিকা ও তার মিত্র চোর ও আত্মসাৎকারী দেশগুলো বর্তমানে প্রতি ব্যারেল ৯ ডলার দিয়ে ক্রয় করছে। ১৪৪ ডলার থেকে ৯ বিয়োগ করলে চুরি ও লোকসানের পরিমাণ প্রতি ব্যারেলে ১৩৫ ডলার হয়। তেল উত্তোলনকারী দেশগুলোর সংগঠন 'উইপিক' এর অন্তর্ভুক্ত মুসলিম দেশগুলো দৈনিক ২৫ মিলিয়ন ব্যারেল উত্তোলন করে। আর উইপিক-এর বাহিরের দেশগুলো দৈনিক ৫ মিলিয়ন ব্যারেল উত্তোলন করে। এই নিয়মানুযায়ী মুসলিম দেশগুলোর দৈনিক মোট উত্তোলনের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন ব্যারেল। এই পরিমাণকে যদি দৈনিক লোকসানের পরিমাণ ১৩৫ ডলার দিয়ে গুণ দেওয়া হয় তাহলে তার পরিমাণ হয় দৈনিক ৪০৫০ ডলার। এটা এত বড় চুরি যে গোটা মানব ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন নজির নাই। এই চুরির পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধিকে এভাবে বুঝুন, সুদানের ৩০ মিলিয়ন জনগণের চার বছরের ব্যয়ের জন্য এই সংখ্যা যথেষ্ট। এবং উত্তর ও দক্ষিণ, ইয়েমেনের দুই বছরের বাজেট এর দ্বারা পূর্ণ হতে পারে। এখন আসুন আরেকটু সামনে আগাই। দৈনিক চুরির এই পরিমাণকে সামনে রেখে যদি আমরা বাৎসরিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে চাই তাহলে ৪০৫০ মিলিয়ন ডলারকে বৎসরের ৩৬৫ দিন দিয়ে গুণ দিলে যার পরিমাণ দাড়ায় ১৪৭৮২৫০ বিলিয়ন ডলার। আর এই লুটতরাজের ধারাবাহিকতা যেহেতু আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দী থেকে চলে আসছে তাহলে দীর্ঘ ২৫ বছরের হিসাব

করলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৯৫৬২৫০ ট্রিলিয়নেরও অধিক। অতঃপর এটাও স্মরণ রাখতে হবে, এই দুঃখজনক ডাকাতি ও নিষ্ঠুর লুটতরাজের বিবরণ শুধু পেট্রোলের হিসাব। অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থের হিসাব কিন্তু এখানে আনা হয়নি।[১২৩]

প্রতিটি মুসলমানের নিকট আমেরিকার ঋণের পরিমাণ

এই বিশাল অঙ্ককে যদি গোটা পৃথিবীতে বিদ্যমান ১৬০০ মিলিয়ন মুসলমানের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের চাই সে ছোট হোক কিংবা বড় হোক পুরুষ হোক অথবা নারী, আমেরিকা ও তার দোসরদের জিম্মায় ৩০ হাজার ডলার করে পড়ে। সুবহানাল্লাহ! অর্থাৎ এ অবস্থায় যখন বিশ্বের মুসলিমরা দরিদ্রতা, রোগ ও ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত। আমেরিকা তাদের প্রত্যেকের নিকট আনুমানিক ২৪ লক্ষ বাংলাদেশী টাকার সমপরিমাণ ঋণী। এর থেকে আশ্চর্যজনক ও দুঃখজনক কথা আর কী হতে পারে? যদি এই জঘন্য চুরির একদিনের পরিমাণ বাংলাদেশের বন্যাকবলিত ও খরাপীড়িত ভাইদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, যারা প্রতি বছর প্লাবনের শিকার হয়ে ঘর-বাড়িহারা ও মংগলার কারণে ফসলহারা হয়ে যায়, তাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে। যদি তার অর্ধেক পরিমাণ সোমালিয়ার কৃষিখাতে লাগানো হয় তাহলে সেখানের দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে যাবে। যদি তার এক চথুর্তাংশ বার্মার মুহাজির ও বসনিয়ার অসহায় মুসলমানদের নিকট পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে ওরা তাদের দেহ ও প্রাণের সম্পর্ক ঠিক রাখতে সক্ষম হয়।

আরব দেশগুলোর অর্থনৈতিক দৈন্যদশা

শত আফসোস! মহান সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার ফলে এই দুর্দিন দেখতে হচ্ছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণীর বিরুদ্ধাচরণ উভয় জাহানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন শরয়ী বিধানাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে নাপাক মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপের পবিত্র ভূমিতে অনুপ্রবেশের অনুমতি ও বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যেখানে গোটা বিশ্বের মুসলিমরা ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে উপকৃত হওয়া

১২৩. উপরোক্ত হিসাবও কিন্তু আজ থেকে আরও দেড় যুগ আগের। অর্থাত এই গ্রন্থ রচনার সময়ের। বর্তমানে যার পরিমান ৫৭৬৫১৭৫০ ট্রিলিয়নেরও বেশি। অনুবাদক

থেকে বঞ্চিত সেখানে সৌদি আরবও এতটুকু সুখী নয়। আমেরিকা তাদেরকে ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশসমূহকে বিস্ময়কর এক দুরভিসন্ধির মাধ্যমে ঋণ শেষ না হওয়ার ধারাবাহিকতায় আটকিয়ে রেখেছে। তেলের বাজার দর সর্বনিম্ন রাখার পাশাপাশি আমেরিকা তাদের সামনে বিভিন্ন আশঙ্কার হাওয়া প্রবাহিত করে ওদের নিজেদের বানানো অস্ত্র ক্রয় করতে বাধ্য করছে। এমন অস্ত্র যা তাদের আদৌ প্রয়োজন নেই। আমেরিকা তাদের পুরাতন এবং অকেজু পরিত্যক্ত ও অপরিচিত অস্ত্র এই দেশগুলোর ওপর বিভিন্ন বাহানা ও নিষেধাজ্ঞা ব্যবহার করে বিক্রয় করছে। যখন এই অতি সস্তা অস্ত্রের মূল্য নগদ আদায় করা সম্ভব না হয় তখন ওরা এগুলো বাকিতে বিক্রি করে। আরব উপদ্বীপে কর্মরত নির্ভরযোগ্য একটি সামাজিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ড. আবদুল আজিজ আদ-দাখিলের করা এক গবেষণা রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই মুহূর্তে সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ ঋণ আছে ১৫০ কোটি ডলার। তার সাথে বাহিরের ঋণসহ যদি হিসাব করা হয় তাহলে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ২০০ কোটি ডলার। যদি এই ঋণের শতকরা ১০ পয়সা করেও সুদ ধরা হয় তাহলে সৌদি আরবের শুধু সুদ পরিশোধের জন্যই বৎসরে ২০ কোটি ডলার প্রয়োজন। কুয়েতের অবস্থাও এরচেয়ে ভিন্ন নয়। পেট্রোল দ্বারা ওদের বাৎসরিক যে আয় হয় তা থেকে উত্তোলন ও আগত তেলের কারিগরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে দিলে তখন আর অবশিষ্ট থাকে ১২ কোটি ডলার। যেখানে তাদের ঋণ আছে ২০ কোটি ডলার। এ অবস্থা হলো সেই দুই দেশের যাদেরকে সবচেয়ে ধনী দেশ গণ্য করা হয়। এমনিভাবে আমেরিকা তাদের থেকে বেহিসাব সম্পদ লুটে নেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে ঋণের এমন যাতাকলে আটকে রেখেছে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী হওয়া ব্যতীত মুক্তির আর অন্য কোন পথ নেই।

এই সমস্যার সমাধান কী?

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ঐ সত্তা যিনি পূর্বেও অভাব অনটনকে দূর করে প্রাচুর্য দান করেছেন এবং এখনো যদি তাকে সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সকল বিপদাপদ দূর হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি শুধু তাঁর আনুগত্যে এবং নিষেধাজ্ঞাকে বর্জনের মধ্যেই নিহিত। বর্তমানে মুসলমান যে ইবাদতটি সবচেয়ে বেশি ছেড়ে দিয়েছে তাহল, **'ইকামাতে ফরিযায়ে জিহাদ'** তথা জিহাদের ফরিজাকে প্রতিষ্ঠা এবং

সচেয়ে বেশি যে গোনাহে লিপ্ত তাহল,'**দুনিয়ার মুহাব্বত ও এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহর মেহনতের প্রতি গাফলত**।, বিশেষ করে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপের ব্যাপারে মুসলমান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আখেরী ওসিয়ত তথা জীবনের শেষ ওসিয়্যত ও আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে যে জঘন্য অপরাধের শিকার হয়েছে বর্তমানের এ সকল বিপদ তারই পরিণতি এবং এই দুর্দিন এই অবাধ্যতার কারণেই দেখতে হচ্ছে।

হে মুসলমান! একটু ভাবুন তো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র আত্মার ওপর কি অবস্থাই না অতিবাহিত হচ্ছে, যখন হারামাইনের পবিত্র ভূমিতে তাকে কষ্টদানকারী হিংসুক খ্রিষ্টানরা আনন্দচিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার অনুসারীরা রওজায়ে আকদাসে উপস্থিতি এবং সালামের সৌভাগ্য অর্জনকেই যথেষ্ট মনে করে পৃথিবী ও তার অন্যান্য বস্তু থেকে বেখবর হয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। না তাদের হেজাজের পবিত্র ভূমিতে অনুপ্রবেশকারী নাপাক ও অপবিত্র মার্কিনী ও ইংরেজ সৈন্য দৃষ্টিগোচর হয়। না এই অপবিত্রদেরকে এখান থেকে প্রতিহত করার তাদের কোন ফিকির আছে, না তাদের এই বেফিকিরির ভয়াবহ পরিণাম ও ফলাফলের কোন অনুভূতি আছে। হে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারীবৃন্দ! আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের সাথে জিহাদকে ছেড়ে দিয়ে এবং ইহুদি খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে অসন্তুষ্টি অর্জন করেছ এবং এই অসন্তুষ্টির শাস্তিরূপে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ধ্বংস ও পরাজয়ের গহব্বরে পৌছেছ। এখন তা থেকে বাঁচার একটাই পথ। আর তা হলো, প্রত্যেক মুসলমান নিজের সংশোধন করা এবং জিহাদ ও কিতালের পবিত্র পথ অবলম্বনের পাশাপাশি উম্মতকে জাগ্রত করার এবং এই আমলের ওপর উঠানোর মেহেনত শুরু করে দেওয়া; যে আমল ছেড়ে দেওয়ার ফলে আজ আল্লাহর দুশমনরা তাদের ওপর ঝেঁকে বসেছে। মুখের দ্বারা হোক কিংবা কলমের দ্বারা, জীবন দিয়ে হোক অথবা সম্পদ দিয়ে, একাকী হোক অথবা দলবদ্ধভাবে যার যেভাবে সম্ভব আন্তরিকভাবে এই পবিত্র মেহনতের সাথে লেগে যাও। এটাকে নিজের ব্যক্তিগত কাজ বানিয়ে নাও। অতঃপর এই কাজে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লেগে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ কর। ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না আসমানের ওপর মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের ফায়সালা হয়ে যায়, অতঃপর এর ডাক এসে যায়।

আমেরিকা ও উসামার দ্বন্দ্বের মূল কারণ

এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীতে আমেরিকার আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। সংবাদপত্র এই আলোচনায় ভরপুর। মাহফিল ও মজলিসগুলোতেও এর ওপর গরম গরম বক্তৃতা হচ্ছে এবং দিন দিন খবর ছড়িয়ে পড়ছে—আমেরিকা যেকোন সময় আফগানে হামলা করতে পারে। এই হামলাকে ইসলাম ও কুফর এবং হেলাল ও ক্রুশের যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা স্বভাবসুলভই এই হামলার পূর্বে জোড়েশোরে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডায় ব্যস্ত। কোথাও রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে হুমকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করছে। কোথাও নিজেদের শহরবাসীকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিয়ে এবং দূতাবাসগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে উসামাকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া দেখায়। যেন আফগানিস্তানে আক্রমণের বৈধতা প্রমাণ করতে পারে। তাদের পত্র-পত্রিকায় সকাল বিকাল উসামা এবং মুজাহিদদের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী হামলার হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে যখন ওরা অসহায় ও মজলুম মুহাজিরদেরকে বর্বর আক্রমণের নিশানা বানাবে তখন যেন ওদের এই কর্মকাণ্ডের নিন্দা করার মত কেউ না থাকে। আমেরিকার পক্ষ থেকে এসবকিছু হচ্ছে কিন্তু মুসলিম বিশ্বেরও কি এই আক্রমণের প্রকৃত রহস্য ও মূল কারণ জানা আছে? তাদের কি খবর আছে, আমেরিকার সাথে উসামা ও আফগানিস্তানের মূল দ্বন্দ্বটা কী নিয়ে? উসামা তার ব্যক্তিগত যুদ্ধ লড়ে যাচ্ছেন নাকি গোটা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা একাই করে যাচ্ছেন? তালেবানরা কি শুধু তাদের দেশকেই স্বাধীন করছে নাকি প্রকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পৃথিবীকে দেখাচ্ছেন। যার পরিণতিতে তাদেরকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে?

এ কেমন উদাসীনতা!

মুসলিম উম্মাহর শিক্ষিত ও সচেতন লোকদেরকেও যদি এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে বুঝা যায়, ওরা কতটা দুঃখজনক উদাসীনতা ও ভয়ঙ্কর অজ্ঞতার শিকার। তাদের না আমেরিকার আসল উদ্দেশ্যের খবর আছে, না উসামার অবস্থান সম্পর্কে জানা আছে। উসামাকে মুসলিম বিশ্বের হিরো জ্ঞানকারী এবং রাজপথে উসামা জিন্দাবাদ-এর শ্লোগান প্রদানকারীরাও উসামার মিশন ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র যা তত্ত্ব উপাত্ত সংগ্রহ ও ঘটনার রহস্য

মূলোৎপাটনের ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ তারাও এখন পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ খুঁজে বের করতে এবং তা মুসলিম জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করতে নিজেদের নৈপুণ্যের হক আদায় করেনি। বেশি থেকে বেশি বলে দেওয়া হয়, উসামা মার্কিনীদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক, কিন্তু কী সেই স্বার্থ ও উদ্দেশ্য? এবং তাতে প্রতিবন্ধক হওয়া কর্তব্য নাকি অপরাধ? এর কোন আলোচনা করা হয়না। এটা কত বড় মারাত্মক অজ্ঞতা।

সর্বশেষ ঘটনা কী?

সম্মানিত পাঠক! বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়ার সুযোগ নাই। আর ব্যাখ্যা কখনো কখনো উদ্দেশ্য বুঝতে প্রতিবন্ধকও হয়ে দাঁড়ায়। তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ওপরই ক্ষ্যান্ত করব। উসামা আমেরিকার যে উদ্দেশ্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তা দুই প্রকার।

(১) প্রথম কারণ হল দুনিয়াবী জুলুম-অত্যাচার অর্থাৎ আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং এই লুটতরাজ ধারাবাহিক চালিয়ে যাওয়া। আমেরিকা এবং ইউরোপে তেলের ভাণ্ডার এই পরিমাণ নেই যা তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে। যেখানে আরব উপসাগরে পৃথিবীর শতকরা ৭৫% তেল পাওয়া যায়। আমেরিকা তেল উৎপাদন, তার মূল্য ও বিপণন পদ্ধতির ওপর পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আরব উপসাগরের মুখের হরমুজ প্রণালী নামক সরল রেখা থেকে দৈনন্দিন তেলভর্তি পশ্চিমা দেশগুলোর বিশাল এবং দৈত্যসদৃশ্য ট্যাঙ্কার চলাচল করে। যা মূল্য পরিশোধ করে নয়, চুরি করে নিয়ে যায়। চুরিও নয় বরং ডাকাতি! চুরি তো গোপনে গোপনে হয়। মুসলিমদের এই সম্পদ দিন-দুপুরে লুটে নিয়ে যাচ্ছে। যে জিনিসের মূল্য জিনিসের মালিকের পরিবর্তে জিনিস নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি নির্ধারণ করে তাহলে এই বেচাকেনাকে সওদা কে বলবে? এটাতো সুস্পষ্ট লুটতরাজ। আমেরিকা এই তরল স্বর্ণের ঐ মূল্য প্রদান করে যা আজ থেকে দুই দশক পূর্বে স্বয়ং তারা নিজেরাই নির্ধারণ করেছিল। অতঃপর এই সামান্য মূল্যও ওরা সৌদি আরবকে সরাসরি আদায় করেনা। ইরাকের সম্ভাব্য হামলা থেকে রক্ষা করার প্রতিদানস্বরূপ রেখে দেয়। এর চেয়ে বড় জুলুম কি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কারও ওপর হয়েছে? আজ আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলোর মধ্যে সম্পদের যে প্রাচুর্য এবং উন্নতির যে ঝলক দৃষ্টিগোচর হয়, একক সত্তার কসম! এটা মুসলিমদের লুণ্ঠিত সম্পদের কৃতজ্ঞতা। উসামা সেই লুটতরাজ থেকে মুসলিম বিশ্বকে সচেতন করা এবং এই ডাকাতির

উৎখাতের চেষ্টা করার কারণেই আমেরিকার দাজ্জালি চোখে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হয়েছেন। এর উপমা হলো, এই সম্পদ কেবল আরব দেশসমূহেরই নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বের। তা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রথম হকদার হলো পিছিয়ে থাকা মুসলিম দেশগুলো। উসামা যেমনিভাবে তার ব্যক্তিগত সম্পদ আফগান জিহাদে নিঃসংকোচে বিলিয়েছেন। এমনিভাবে তিনি এই কুদরতি ধনভাণ্ডার থেকেও মুসলিম বিশ্বের দরিদ্রতা দূর করতে চেয়েছেন; কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা হলো, না তারা তাদের অনুগ্রহকারীর চেষ্টা প্রচেষ্টার খবর রাখে, না শত্রুদের পক্ষ থেকে সংগঠিত জুলুম-নির্যাতনের অনুভূতি আছে। ওরা বড় জোর রাজপথে উসামা জিন্দাবাদ, আমেরিকা মুর্দাবাদ শ্লোগান দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়ে যায় কিন্তু উসামার সহযোগিতা এবং আমেরিকার শক্তিমত্তাকে চূর্ণ করার সফল এবং কার্যকরি পদ্ধতি থেকে তারা একেবারেই উদাসীন। হে সরলমনা মুসলমান! লোহা দিয়েই লোহা কাটতে হয়। জিহাদের বরকতময় সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত তোমরা আমেরিকার নিকট এমনভাবে ভিক্ষা চাইতেই থাকবে এবং এই ধোঁকাবাজ চৌধুরীরা তোমাদের লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে তোমাদেরকে খয়রাতের কিছু টাকা দিয়ে তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং তাদের ইচ্ছানুযায়ী শর্ত মানতে বাধ্য করতে থাকবে।

(২) দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণ থেকে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়বিদারক। এর সম্পর্ক আমাদের দীন ও শরীয়ত এবং পবিত্র স্থানসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। কে না জানে যে মুসলিম বিশ্বের বুকে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রথমে বৃটেনের তত্ত্বাবধানে হয়েছে তারপর আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিষ বৃক্ষকে পূর্ণতা দেওয়া হচ্ছে। যার ফলাফল হলো, দুর্গন্ধময় বাতাসে ভরপুর মোলায়েম ধূলিকনার ন্যায় ভীরু ও নির্লজ্জ ইহুদিরা আজ আমাদের প্রথম কিবলা জবর-দখল করে আছে। একথা তো সকলেরই জানা আছে, কিন্তু ইহুদিদের আসল উদ্দেশ্যের খবর অধিকাংশ মুসলমানেরই জানা নাই। বর্তমান ইসরাইল ইহুদিদের আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্যের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সামনের পদক্ষেপ হলো, গ্রান্ড ইসরাইল তথা বৃহৎ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। যা ফুরাত ও নীল নদের মধ্যবর্তী এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইসরাইলের পতাকায় বিদ্যমান দুটি নীল রেখা সেই নদীগুলোরই প্রতিবিম্ব। এখন একটু অন্তরে হাত রেখে আরবের মানচিত্রটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। তাহলে আপনি জানতে পারবেন, বিশ্বমুসলিমের সবচেয়ে পবিত্র স্থানসমূহ তথা পবিত্র মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারা এই ভূমিতেই

অবস্থিত এবং নাপাক ইহুদিরা একেই গ্রান্ড ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত করার পাঁয়তারা করছে। সেই ষড়যন্ত্রের একটি অংশ ইহুদি শেকলের অংশ হওয়াকে প্রতিহত করতেই উসামা লড়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ পবিত্র হারামাইনের ভূমিতে মার্কিন সৈন্যদের অনুপ্রবেশ। আমেরিকা ইরাক থেকে নিরাপত্তার অজুহাতে সৌদি আরবে এসেছিল। ইরাককে তারা এমন বিদীর্ণ করেছে যে সৌদি আরবে হামলা করবে তো দূরের কথা নিজেদের ঘর সামলানোর মতো শক্তিও আর তাদের বাকী নেই। কিন্তু মার্কিন সৈন্যরা দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও (বর্তমানে প্রায় ত্রিশ বছর) এখান থেকে যাওয়ার নাম নিচ্ছে না। মজার কথা হলো, তাদের মোর্চা ইরাক সীমান্তের নিকটে নয়; হাজার মাইল দূরে মুসলিমদের পবিত্র স্থানসমূহের সন্নিকটে। আর এটা কোন অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প নয় বরং স্থায়ী সেনাক্যাম্পরূপেই জায়গায় জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে। এই সৈন্যরা স্থায়ী ও পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন এবং সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞামুক্ত। তাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, উপযুক্ত সময় আসলে বৃহত্তর ইসরাইলের স্বপ্ন পূরণে ইহুদিদের কাজে আসবে এবং মুসলিমদের সেই আঘাত করা যা দুনিয়া পূজারী ও জিহাদ তরককারী জাতিসমূহকে তাদের শত্রুরা করে থাকে।

এটা কি শুধু উসামারই ব্যাপার?

বন্ধুরা আমার! এই হলো সেই তিক্ত বাস্তবতা যারফলে, আমেরিকা শিকারী কুকুরের ন্যায় উসামা ও তার সাথীদের ঘ্রাণ শুকে বেড়াচ্ছে। এখন ভাবনার বিষয় হলো, এটাকি শুধু উসামারই ব্যাপার নাকি গোটা মুসলিম বিশ্বের ব্যাপার? আমেরিকা কি শুধু আরব শাসকদের ব্যক্তিগত ধনভাণ্ডারই লুট করছে- যে আমরা তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখব, নাকি গোটা পৃথিবীর সকল মুসলমানদের সম্মিলিত সম্পদ দ্বারা নিজেদের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করছে? আমরা কি তাদের হাত ধরার কিংবা ভাঙ্গার চেষ্টা করব না? পবিত্র হারামাইন শরিফাইন কি শুধু সৌদি আরবের জন্যই পবিত্র- যে আমরা এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করে আরামে বসে থাকব নাকি তা গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মুসলমানের জন্যই তাদের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান ও সম্মানিত, যারফলে প্রত্যেকেই তার নিরাপত্তার জন্য উসামার সঙ্গ দেবে?

আমেরিকা আমাদের দীন-দুনিয়া উভয়েরই শত্রু

হে আল্লাহকে মান্যকারীগণ! তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমিকগণ! আমেরিকা যে শুধু তোমাদের দুনিয়াই ধ্বংস করছে তা নয় বরং তোমাদের মহান পালনকর্তার পবিত্র ঘর এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র রওজা মুবারকেও তাদের অশুভ দৃষ্টি দিয়ে বসে আছে। তাদের এই রক্তচক্ষুগুলোকে উপড়ে ফেলা, ভিনদেশী ও পরবাসী উসামারই দায়িত্ব নাকি আমাদের নিজেদেরও তাতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন? এর উত্তর ভাবার জন্য, সক্রেটিসের জ্ঞান কিংবা আইনস্টাইনের দর্শনের প্রয়োজন নাই। সামান্য ঈমান আর কিঞ্চিৎ আত্মমর্যাদাবোধই যথেষ্ট। জমিনের বাসিন্দা হতে আকাশের ফেরেশতা পর্যন্ত সকলের এই বিশ্বাস রয়েছে, বর্তমানে তুমি এতটুকু ঈমান ও এতটুকু আত্মমর্যাদাবোধ থেকে বঞ্চিত নও। সুতরাং নিজের দায়িত্ব বুঝতে এবং সামর্থ্যকে ব্যবহার করতে কেন বিলম্ব করছ?

নিজের দায়িত্বকে বুঝো এবং খুব দ্রুত জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ইসলামের জানবাজ সেবকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কোথাও যেন মার্কিনী ক্রুজ মিজাইল লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়ে যায়, অতঃপর আফসোস করতে হয়—কী হাতে এল?

আমেরিকার আক্রমণ এই দিনগুলোতেই কেন?

এ বিষয়ে আলোচনার সমাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে সাধারণ মুসলমানদের মনযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই যে একদম এই সময়ে তালেবানদের লড়াইয়ের শেষ দিকে এসে মার্কিনী হামলায় হঠাৎ এমন ক্ষিপ্রতা এসে গেল কেনো? বর্তমান সময়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণও হয়নি তারপরও আমেরিকা বাহাদুর এই দিনগুলোতে এত উৎসাহী হয়ে গেল কেন? এর উত্তর হলো, আমেরিকা এক তীরে দুটি শিকার করতে চায়। এ ব্যাপারে সামনের কোন সংখ্যায় আলোচনা করব। শর্ত হলো, সামনের সংখ্যা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত মুসলমান নিজের হারানো ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকার যোগ্য থাকা। হে পরকালের সুপারিশকারী! আপনার উম্মতের ওপর বড় দুঃসময় এসে গেছে।

আমেরিকা ও উসামার শত্রুতার মূল কারণ (অতীত-বর্তমান)

উসামা এবং আমেরিকার শত্রুতার প্রকৃত কারণ কী? উভয়ের মাঝে মূল দ্বন্দ্বটা কোন বিষয়ের ওপর? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরাশক্তি একজন ভিনদেশী মুহাজির ব্যক্তির পেছনে কেনো এমন উঠেপড়ে লেগেছে? একজন শরণার্থী ব্যক্তির নিকট কি এমন প্রেরণা ও শক্তি রয়েছে যার জোড়ে সে যুগের ফেরআউনে আজম তথা সবচেয়ে বড় অত্যাচারীর সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো? তার দৃষ্টিভঙ্গি কী? যার মধ্যে এমন শক্তি বিদ্যমান যে সে একাই ইহুদিবাদের এই তুফানকে প্রতিহত করে বিশ্ব মুসলিমকে তার সঙ্গ দেওয়ার জন্য হৃদয় বিদারক চিৎকার করে যাচ্ছেন? এ সকল বিষয়ে বিগত সংখ্যায় লেখা হয়েছে এবং এখন বিষয়বস্তু হওয়ার প্রয়োজন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকার তীব্র আক্রমণের অজুহাত। যেমনটি বিগত সংখ্যায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু উসামার অবস্থান ও আমেরিকার পক্ষ থেকে ছড়ানো মিথ্যাচারকে দুনিয়াবাসীর সামনে নিয়ে আসার জন্য সেই সামান্য প্রবন্ধ যথেষ্ট নয় যা বিগত সংখ্যায় লেখা হয়েছিল। এতটুকু দুঃখের বিবরণ শোনানো নির্জীবতার এই বরফকে গলানোর জন্য যথেষ্ট নয় যা মুসলিম বিশ্বের অন্তরে ও বিবেকে জমাট বেধে আছে। না এতটুকু অশ্রু বিসর্জন অলসতার সেই ধুলা ঝেরে ফেলতে সক্ষম, যার মোটা আস্তরে মুসলিমদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। এজন্য এ বিষয়ে অধিক আলো ছড়ানো প্রয়োজন।

মুসলিম বিশ্বের জন্য এই দ্বন্দ্বের কারণ জানা অত্যন্ত জরুরি

বাস্তবতা হলো, এই দ্বন্দ্বের গভীরতা ও প্রতিক্রিয়া জানা, যাচাই করা, বুঝা এবং হকদারের সঙ্গ দেওয়া বর্তমান মুসলমানদের জন্য তেমন জরুরি নামাজের সময় কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করা যেমন জরুরি। যেমনিভাবে কিবলামুখী হওয়া জরুরি ঠিক তেমনিভাবে সেই কিবলার নিরাপত্তা বিধান করা তারচেয়েও অধিক জরুরি এবং এই কিবলা যেহেতু শুধু উসামার একার নয় দুইশত কোটি মুসলমানেরও, আরব উপসাগরে কুদরতের পক্ষ থেকে আমানতপ্রাপ্ত সম্পদ শুধু আরব শাসকদের নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বেরও তাতে হক রয়েছে। তাই কাফির সৈন্যদেরকে এখান থেকে বের করা, তাদের ছড়ানো লুটতরাজের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করা এবং পবিত্র হারামাইন শরিফাইনকে ঘিরে তাদের পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত সকল আশঙ্কার মূলোৎপাটন করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ।

আমেরিকা আসল বিষয়টি কেন লুকাতে চাচ্ছে?

এ বিষয়টি আমেরিকার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে তাদের আগ্রহ কত অধিক তার কিছুটা অনুমান করা যায়—আমেরিকা তার সমস্ত উপায়-উপকরণ এই আওয়াজকে দমানোর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে যা তাদের আসল উদ্দেশ্য ও লুটতরাজকে উন্মুক্ত করতে চায়। তারা কোনোভাবেই এটা সহ্য করে না, কোন ব্যক্তি পৃথিবীকে এ বিষয়ে আসল বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করুক। কেননা বাস্তবতা জনসম্মুখে আসলে যেখানে ইহুদিদের বিশাল পছন্দনীয় উদ্দেশ্যের পূর্ণতা এবং বৃহৎ ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে সেখানে আমেরিকার উন্নতি, ঐশ্বর্য ও বিত্তশালী হওয়ার রহস্যও প্রকাশ হয়ে যাবে। তাদের পরাশক্তি হওয়ার ঘুনেধরা প্রাসাদ ধ্বসে পড়ার আওয়াজ সপ্ত জমিনের নিচে এসে পতিত হবে। তাদের খুব ভালো করেই জানা আছে, তাদের সকল সাজসজ্জা সকল প্রতিপত্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামরিক পরিকল্পনা, সবকিছু মুসলমানদের থেকে লুট করা তেল সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এজন্যই ওরা আসল বিষয়টি লুকাতে চায়। মুসলিমদের নিকট বাস্তবতা প্রকাশের পূর্বে ওরা উসামাকে বশীভূত করতে চায়। কেননা যদি এই রহস্য সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিম অবহিত হয়ে যায় এবং কেউ ইহুদিবাদের এই ধোঁকা ও প্রতারণার জালকে তাদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে তাদেরকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অবহিত করে দেয় এবং তারা ঈমানী শক্তি ও আত্মমর্যাদাবোধের বলে বলিয়ান হয়ে নিজেদের পাওনা আদায়ের জন্য উঠে দাঁড়ায় এবং ইহুদি ভূমি আমেরিকায় প্রবেশ করা জীবন ধারণের রগ (তেলের পাইপলাইন) নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়: যেমনটি তাদের করা উচিত তাহলে আল্লাহর কসম! আমেরিকা মুসলমানদের নিকট পরাজিত হতে এতটুকুও বিলম্ব হবে না যতটুকু সময় সিংহের গর্জন শুনে বনের গাঁধার জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড় দিতে লাগে।

সত্য এটাই

একথা যখন মুসলমানদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা আশ্চর্য হয়ে ভাবে—বাস্তবেই কি পরিস্থিতি এটাই? এমনটাও কি সম্ভব যে আমাদের ওপর প্রভাবশালী আমেরিকা আমাদের সম্পদের ওপর নিজেদের সম্মান ধরে রেখেছে? আমরা তো তাদের থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য হাত পেতে থাকি। ঋণ মঞ্জুর করানোর জন্য কতো দৌড়ঝাঁপ করি। আমরা

তাদের মুখাপেক্ষী নাকি ওরা আমাদের? ওরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী রাষ্ট্র। এত ক্ষমতা রাখে যে চাঁদে পর্যন্ত পদার্পণ করেছে। ওরা আমাদের থেকে কী ছিনিয়ে নেবে এবং কেন কী লুটপাট করবে?

হে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে নির্বোধ মুসলমানেরা! সর্ববিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার কসম! প্রকৃত ব্যাপার এটাই, বাস্তবতা এমনই। আমেরিকা যে ভিক্ষা কাউকে দেয় তা তোমাদেরই লুণ্ঠিত সম্পদ। আমেরিকা দানবীর নয় ডাকাত, সাহায্যকারী নয় লুটেরা, তোমাদের থেকে লুণ্ঠিত সম্পদই তোমাদেরকে ঋণ দিয়ে তোমাদের ওপর চৌধুরীপনা ফলায়।

এসো, তোমাদের সামনে এই ডাকাতির প্রমাণ এবং এই চুরির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করি। হয়ত তোমাদের মধ্য হতে এমন কিছু লোক বের হয়ে আসবে যারা তোমাদের ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের হেফাজত এবং এই নেয়ামতের ওপর অন্যদের ডাকাতির মূলোৎপাটনের জন্য তৈরি হবে। নামাজ রোজার পাশাপাশি জিহাদ-কিতালকেও আঁকড়ে ধরবে। হজ ও উমরার সৌভাগ্য অর্জনের পাশাপাশি যুদ্ধ ও লড়াইকেও আঞ্জাম দেবে। নিজেদের দান খয়রাতের মধ্যে মুজাহিদদের জন্যও বিশেষ একটি অংশ রাখবে। নিজেদের দু'আ সমূহের মধ্যে মুজাহিদদেরকেও স্মরণ রাখবে। এটাই একমাত্র সেই কার্যকরি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে তাদের থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। মুসলমানদেরকে কুদরতের পক্ষ থেকে দান করা সম্পদের লুটতরাজ বন্ধ করে আমেরিকাকে তাদের ঘরে পাঠানো যেতে পারে।

চোরের মা'র বড় গলা

আফসোস! মুসলমানদের নিকট আজ সবকিছু থেকেও কিছুই নাই। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধন ভাণ্ডারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও হতদরিদ্র ও রিক্ত হস্ত। এখন এটা কি নিজেদের সরলতা বলব নাকি দুশমনের ধোঁকাবাজি বলব। মুসলমানদের উদাসীনতা নাম দেবো নাকি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের প্রতারণা। সেই বাস্তবতা যা আরবের মরু ভূমির পশু-পাখিও এটা জানে, আমেরিকা তার পশ্চিমা মিত্র দেশগুলোর সাথে মিলে দুই হাতে মুসলিম বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। অত্যন্ত নির্বিঘ্নে এবং বেপরোয়াভাবে। অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও চতুরতার সাথে। আর উল্টো "চোরের মা'র বড় গলা" এই প্রবাদের মত নিজেদের এই ডাকাতির বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলনকারীদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে। পৃথিবীর সামনে

তাদেরকে জালেম এবং আমেরিকাকে নিষ্পাপ এবং নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপন করছে। কিন্তু অবশেষে কতক্ষণ?

কুদরতের নিকট ছাড় আছে তবে ছেড়ে দেওয়া নাই। কুদরত সবাইকে ছাড় দেন তবে কাওকেই ছেড়ে দেন না। জালেমকে সুযোগ অবশ্যই দেন তবে সেটা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত। সে নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়ে গেলে যখন কুদরতের বিধান কার্যকর হতে শুরু হয় এবং ছেড়ে দেওয়া রশি যখন টেনে নেওয়া হয় তখন ফেরআউনী দাম্ভিকতা ও কারুনী স্বেচ্ছাচারিতা মাটির সাথে মিশতে সময় লাগে না। আমেরিকা, দুনিয়াকে যত ধোঁকা দেওয়ার দিয়ে নাও। অসহায় মুজাহিদদের ওপর যত ইচ্ছা জুলুম করে নাও। উসামা ও তার সাথীদের ওপর যত ইচ্ছা মিথ্যা অপবাদ লাগাতে থাক। লক্ষণে বুঝা যাচ্ছে, সময় ঘনিয়ে এসেছে। নাকে লাগাম লাগানো হবে। আলহামদুলিল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের সেই জোয়ার সৃষ্টি হচ্ছে যা হোয়াইট হাউজকে ব্ল্যাক আউট তথা ধ্বংস করে ছাড়বে ইন শা'আল্লাহ। প্রয়োজন শুধু এই জোয়ারকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বিধানসমূহের এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুগামী রাখা। পুরোপুরি দীনকে আঁকড়ে ধরা অর্থাৎ দীনের চার ইবাদত (নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত) এর সাথে এই আমলগুলোর সংরক্ষক পঞ্চম ইবাদতকেও (জিহাদ ও কিতাল) অবলম্বন করা। আকাশের ফেরেশতা ও আবাবীলের বাহিনী মুসলমানদের সাহায্যে অবতরণ করতে অস্থির হয়ে আছে। কেবল মুসলমানদের নিজেদের অবস্থার সামান্য সংশোধন করতে যা বিলম্ব।

আলোকিত ভোর

হে মুসলমান, সময় অত্যন্ত ভয়াবহ, নিজের রবকে দ্রুত রাজি করে নাও। শুধু এতটুকু করা শর্ত। আমেরিকাকে নাপাক ময়লা ভর্তি বোতলে বন্দি করতে এতটুকু সময়ও লাগবে না সুবহে কাজেব থেকে সুবহে সাদেক হতে যতটুকু সময় লাগে। হতাশার অন্ধকারে রক্তের চেরাগ প্রজ্জ্বলনকারীদের সাথে শামিল হয়ে যাও। ভোরের আলো ফুটবেই, ইন শা'আল্লাহ। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অতি নিকটে। ইন শা'আল্লাহ।

এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রদত্ত চিত্র নং ১৪ ও ১৫ দ্রষ্টব্য।

উপসাগরীয় সমস্যা সম্পর্কে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া

ইসলামি বিশ্বের নির্বাচিত ইলমী বিদ্যাপীঠ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য মুফতিয়ানে কেরামের ফতোয়াসমষ্টি; যাতে পবিত্র ভূমি আরব উপদ্বীপে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থানের শরয়ী বিধান কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাব ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি এবং ফুকাহায়ে উম্মাতের বাণীসমৃদ্ধ এই ফতোয়াগুলোর মাধ্যমে বিষয়টির শরয়ী গুরুত্ব তথা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুসলমানদের ওপর বর্তানো দায়িত্বসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ই তাওফিকদাতা ও সাহায্যকারী।

বরাবর
জনাব চিফ এডিটর, *যরবে মুমিন*।
আসসালামু আলাইকুম।

দীনে হকের প্রচার-প্রসারের কার্য পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা আঞ্জাম দিচ্ছেন। আল্লাহ পাক *সাপ্তাহিক যরবে মুমিন*-কে অধিক গ্রহণযোগ্যতা দান করুন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মোবারকবাদ।

আপনি পবিত্র হারামাইন শরিফাইন রক্ষায় শেখ হোজাইফীর ভাষণের প্রচারের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা বাস্তবে এমন কাজ ছিল, যা ঘুমন্ত উম্মতকে জাগ্রত করে। আল্লাহ পাক আপনার সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের কাছে গত বৎসর ফতোয়া চাওয়া হয়েছে। যার দলিলভিত্তিক উত্তর আমি নিজেই পাঠিয়েছি। যার ওপর সত্যায়ন রয়েছে আমাদের মুহতামিম শায়খুল হাদিস মাওলানা মুফতি গোলাম কাদের সাহেবের, যিনি মাদানী রাহিমাহুল্লা-এর শিষ্যও বটে। এখন সে ফতোয়ার কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি, যেন এ মহান কর্মে আপনারও কিছু অংশীদারিত্ব থাকে।

ওয়াস্‌সালাম
মুহাম্মাদ মাযহার আসআদী
মুফতি, জামিআ খাইরুল উলুম
খায়রপুর, নামিওয়ালী, ভাওয়ালপুর

ফতোয়া নং-০১

জামিআ খাইরুল উলুম

প্রশ্ন : উলামা-মাশায়েখগণ এ ব্যাপারে কী বলেন, আরব উপদ্বীপে মার্কিন মিত্র শক্তির সৈন্যদল ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের বাহানায় ছয় বছর (বর্তমান সময়ের হিসেবে যা ২৯ বছর) পূর্বে এসেছে। তাদেরকে অন্যান্য আরব উপসাগরীয় অঞ্চলকে রক্ষা করতে বলা হয়েছিল। এখন ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে ছয় বছর (বর্তমান সময়ের হিসেবে যা ২৯ বছর) হতে চলল, এখনো এ সৈন্যদল শুধু রয়েছে, তা-ই নয়; বরং মার্কিন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এসকল সৈন্য মার্কিনীদের ব্যাপক স্বার্থরক্ষার্থে এখানেই অবস্থান করতে থাকবে এবং কখনো ফেরত যাবে না। তা ছাড়াও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাইল ফিলিস্তিন ও বায়তুল মোকাদ্দাসের ওপর অন্যায় দখলদায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করছে এবং এখন তাদের পক্ষ থেকে "গ্রান্ড ইসরাইল" তথা বৃহৎ ইসরাইলের ম্যাপ পেশ করা হয়েছে; যাতে অন্যান্য দেশের সাথে মক্কা-মদীনাকেও বৃহৎ ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। ইসরাইল মক্কা-মদীনার পাক ভূমিতে দখলদারির স্বপ্ন দেখে। এ প্রেক্ষাপটে উপসাগরে মার্কিন সৈন্যদের দীর্ঘ ধারাবাহিক অবস্থান ইসরাইলী শক্তির সম্পূরক। অথচ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ বাণী বিবৃত হয়েছে—"আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের তাড়িয়ে দাও"[১২৪]

আর উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকান সৈন্যদের অবস্থান এ হাদীস শরীফের পুরো পরিপন্থী। এমতাবস্থায় উপসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তির সামরিক মহড়া ও অবস্থানের শরয়ী হুকুম কোরআন-হাদিস মোতাবেক জানাবেন। সাথে এ-ও জানাবেন, উম্মতে মুসলিমা এ পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হুকুম পালনার্থে কী করতে পারে?

প্রশ্নকারী-
আহমাদ অসায়া কাশেম
সমন্বয়ক, আন্তর্জাতিক হারামাইন সংরক্ষণ কমিটি

---

১২৪. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী মোতাবেক মুশরিক ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না; যা এসকল বাণী দ্বারা স্পষ্ট হয়—

"মুমিনরা যেন মুমিনদের ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে-কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো ভয়ের আশঙ্কা করে সতর্কতা অবলম্বন করো, তাহলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।"[১২৫]

"সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী; কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।"[১২৬]

এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আরব থেকে ইহুদি-খ্রিস্টান ও (মুশরিকদের) বের করে দাও।"[১২৭] বিশেষভাবে তখন, যখন তাদের ঘৃণ্য অবস্থান উম্মতে মুসলিমাকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল করার নিমিত্তে হয়। তখন সেখানে তাদের অস্থায়ী অবস্থানেরও শরয়ী কিংবা দেশীয় আইনে কোনোভাবেই অবকাশ নেই। তো কীভাবে তাদের স্বতন্ত্র সামরিক ঘাঁটি গড়ার অনুমতি দিতে পারে? বিস্ময়ের ব্যাপার বটে! উল্লিখিত কারণেই ওলামায়ে কেরাম ও ফুকাহাদের ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) রয়েছে, ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে তিারিত করা আরব শাসকদের জন্য ফরজ (মহান কর্তব্য)।

নিম্নবর্ণিত রেফারেন্সগুলো দেখুন :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসিয়ত মোতাবেক ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে বিতাড়নের নির্দেশ।

১."আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় অসিয়ত করছি। (তন্মধ্যে অন্যতম হলো,) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বের করে দাও।"[১২৮]

২.হজরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "তিনি তাদেরকে তিনটি অসিয়ত করেছেন। (তন্মধ্যে অন্যতম হলো,) আরব থেকে মুশরিকদের (ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে) তাড়িয়ে দাও"।[১২৯]

[১২৫]. আলে ইমরান : ২৮

[১২৬]. বাকারা : ১২

[১২৭]. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

[১২৮]. সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে বিতাড়নের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত।

হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "অবশ্যই আমি ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে বিতারিত করব; এমনকি মুসলমান ছাড়া আর কাউকে রাখব না।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী—দু'টি ধর্ম একত্রে আরব উপদ্বীপে সহাবস্থান পাবে না।"[১৩০]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উল্লিখিত বাণীসমূহের আলোকে নবীজীর হুকুম, আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়নে হজরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে এ বিষয়ে পূর্ণ কর্মব্যস্ত হয়ে কাজ করেন, যার প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো—

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হজরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আরব থেকে ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করেছেন।[১৩১]

এ সিদ্ধান্ত সাহাবায়ে কেরামগণের উপস্থিতিতেই হয়েছে। কেউ তা অস্বীকার করেননি বা তাতে বাধা প্রদান করেননি। সুতরাং এ ফয়সালা সাহাবিদের ইজমা বা ঐকমত্য হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়। এ কারণেই সকল ইসলামি জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একমত, ইহুদি-খ্রিস্টানদের বিতাড়িতকরণ কর্মসূচি আরব অঞ্চলের শাসকদের ওপর ফরজ। এমনকি যদি গোপনেও কোনো কাফের আরবে প্রবেশ করে আর সেখানে সে মারা যায় এবং তাকে সমাধিস্থও করা হয়; তবে যেন তার লাশকেও সে পবিত্র ভূমি থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, যদি তার লাশ গলে যায় তাহলে ভিন্ন কথা। আর আরব উপদ্বীপের সীমারেখার বিবরণ হলো, ভাষাবিদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট লম্বা-লম্বিভাবে ইডেন (ইয়ামান) থেকে শাম (সিরিয়া) পর্যন্ত এবং পাশাপাশি জিদ্দা-সৌদি আরব থেকে ইরাক পর্যন্ত।[১৩২]

[১২৯]. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

[১৩০]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ. ৬৯৮

[১৩১]. সহিহ বুখারী : ১/৩১৫

[১৩২]. নববী, হাশিয়া মুসলিম শরিফ : ২/৪৩

সুতরাং এ বিশদ বর্ণনার পর আরব উপদ্বীপের উল্লিখিত চতুর্সীমার ভেতর কোনো ইহুদি-খ্রিষ্টান স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি নেই। যে সকল আরব দেশ এ চতুর্সীমায় অবস্থিত, সে সকল দেশের সরকারের ওপর ফরজ, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকে আরব ভূমিকে পবিত্র রাখা। এমনিভাবে এসকল দেশের মুসলিম জ্ঞানীদের জন্য জরুরি, সরকার প্রধানদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত, আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে অবহিত করা। যদি সরকাররা তা কার্যকর না করে, তবে ভিন্নভাবে মুসলিম মিল্লাতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষতির দিকগুলোর ব্যাপারে যেন জনসাধারণকে সচেতন করে; যাতে করে ব্যাপক জনমত-গণসচেতনতার ভিত্তিতে তাদের বিতাড়িতকরণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

উত্তর প্রদানে-
সাইয়েদ মো. মাজহার আসআদী
দারুল ইফতা, খায়রপুর নামওয়ালী, ভাওয়ালপুর
২ রা রবিউল আউয়াল ১৪১৮ হিজরি
জামিয়া উসমানিয়া শোরকোট।

ফতোয়া নং-২

এখান থেকে শেষ পর্যন্ত কলেবরের দীর্ঘতা বর্জনে প্রশ্ন উল্লেখ করা হলো না। প্রশ্নগুলোর ভাষ্য প্রথম প্রশ্নের কাছাকাছি। মূল জিজ্ঞাসা একটাই।

উত্তর : হামদ-সালাতের পর। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।”[১৩৩]

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা (নিকৃষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের কারণে) নাপাক। সুতরাং (ওই নাপাকির কারণে যে সকল শরয়ী বিধান এসেছে, তন্মধ্যে একটি হলো) এসকল লোক এ বছরের পর মসজিদে হারামের (হারামে মক্কী) কাছেও আসতে পারবে না। অর্থাৎ হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। যদি তোমাদের এ হুকুম জারি করার কারণে দারিদ্র্যতার আশঙ্কা হয়—যেহেতু বেশির ভাগ লেনদেনই তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি

১৩৩. তাওবা : ২৮

তারাই না থাকে, তাহলে ব্যবসার কী হবে।—তবে তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। আল্লাহ যদি চান, নিজ অনুগ্রহে তাদের মুখাপেক্ষী রাখবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিধি-বিধানের মঙ্গলতর দিকটি ভালোই জানেন এবং সে সকল মঙ্গলের পূর্ণতার বিষয়ে তিনিই অধিক প্রজ্ঞাময়। (তাই তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর আশা করা যায় যে, তিনি তোমাদের দারিদ্রতার উপকরণগুলো দূর করে দেবেন।[১৩৪]

এমনিভাবে আরেকটি বাণী :

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”[১৩৫]

ঈমানদারগণ, তোমরা (মুনাফিকদের মতো) ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে (নিজেদের) বন্ধু বানিয়ো না। তারা একে অপরের বন্ধু অর্থাৎ ইহুদি-ইহুদি পরস্পর খ্রিষ্টান-খ্রিষ্টান পরস্পর বন্ধু। অর্থাৎ বন্ধুত্ব হয় নির্ভরযোগ্যদের সাথে। সুতরাং তাদের পারস্পরিক সমতা রয়েছে, কিন্তু তোমাদের সাথে তাদের কী সামঞ্জস্যতা? আর যখন উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা বোঝা গেল যে, বন্ধুত্ব হয় সমতার ভিত্তিতে, সুতরাং তোমাদের যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিঃসন্দেহে সে বিশেষ কোনো কারণে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারও বটে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ের বুঝই তাদের দেন না, যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিজের ক্ষতি করছে।

১. হাদিস শরিফে হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, “একদা আমরা মসজিদে বসা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিরে তাশরিফ আনলেন এবং বললেন, ইহুদিদের কাছে চলো। সুতরাং আমরা নবীজীর সাথে রওয়ানা করলাম। এমনকি আমরা তাদের আবাসস্থলে পৌঁছলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে ইহুদির দল! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, যাতে করে দুনিয়ার পেরেশানি এবং আখেরাতের আজাব থেকে রক্ষা পাও। ভালো করে শুনে রাখো, এ পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আমি তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড (আরব উপদ্বীপ) থেকে

১৩৪. প্রাগুক্ত
১৩৫. মায়িদা : ৫১

বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাদের কারও কাছে যদি এমন কোনো জিনিস থাকে, যা সাথে নেওয়া সম্ভব নয় তবে সে যেন তা বিক্রি করে দেয়।"[১৩৬]

২. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সময় তিনটি ওসিয়্যত করেছেন, "মুশরিকদেরকে আরব দ্বীপ থেকে বের করে দেবে। দূতদের সাথে সেই আচরণ করবে, যা আমি করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, তৃতীয় কথাটি নবীজী বলেননি বা আমি ভুলে গেছি।[১৩৭]

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, মুশরিক শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ইহুদি-খ্রিস্টান'।[১৩৮]

৩. হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আমাকে হজরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "আমি যে করেই হোক ইহুদি-খ্রিস্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বিতারিত করবই এবং সেখানে মুসলিম ব্যতীত কাউকে থাকতে দেবো না।" অপর বর্ণনায় রয়েছে, "যদি জীবিত থাকি তবে আরব উপদ্বীপ থেকে অবশ্যই ইহুদি-খ্রিস্টনদের বের করবই ইন শা' আল্লাহ"।[১৩৯]

৪. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "হজরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ইহুদি-নাসারাদের হেজাজ ভূমি থেকে দেশান্তর করে দিয়েছেন এবং তার পূর্বে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার উপত্যকায় বিজয়ী হন তখন তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কেননা যে ভূখণ্ডেই দীনে হক বিজয়ী হতো, সেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মুসলমানদের হয়ে যেত। কিন্তু ইহুদিরা নবীজীর কাছে দরখাস্ত করল, আপনি এই শর্তে আমাদের এখানে থাকতে দিন যে, আমরা শ্রম দেবো এবং চাষাবাদের অর্ধেক আমরা রাখব। তখন নবীজী বলেন যে, আমরা তোমাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে থাকতে

---

১৩৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত : ৩৫৫

১৩৭. প্রাগুক্ত

১৩৮. মিরকাত শরহে মেশকাত

১৩৯. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

দেবো, যতক্ষণ আমাদের ইচ্ছা হয়। তবেই তাদের সেখানে থাকতে দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত হজরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে তাইসা এবং আরীবা অঞ্চলে দেশান্তর করে দিলেন। উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস এবং আগত ফিকহি ভাষ্যের আলোকে আমেরিকা এবং তার মিত্রশক্তির আরব উপদ্বীপে অবস্থান কোনোভাবেই বৈধ নয়। তাদের উপস্থিতি আরব উপদ্বীপে আধিপত্য বিস্তারের মজবুত শঙ্কা রয়েছে। সকলেই অবগত আছে, এ সৈন্যদলের দীর্ঘ উপস্থিতি পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের ওপর নিজেদের দখলদারিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বটে। তাই আরব শাসক এবং অন্যান্য ইসলামি প্রজাতন্ত্রগুলোর গুরু-দায়িত্ব হলো তারা প্রথম পদক্ষেপেই পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্লাটফর্ম সৃষ্টি করুক, যা গোটা আরব উপদ্বীপ এবং পবিত্র হারামাইন শরিফাইনকে সুরক্ষা প্রধান করবে। এবং এতদাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে এবং নিজেদের সাহায্য-সহযোগীতা নিজেদের নিয়ম-নীতির অধীনে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করবে। অতিসত্বর অমুসলিম সৈন্যদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতারিত করে তা মুসলমানদের ন্যস্ত করবে। এবং ভবিষ্যতে কখনো কোনো ইহুদি সৈন্যকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি সৌদি বা অন্য কোনো আরব দেশ এ মহান দায়িত্ব পালনে অলসতা দেখায়, যেমনিভাবে এখনো পর্যন্ত তারা এ অন্যায় শিথিলতাকে গ্রহণ করে আছে, তবে সকল মুসলিমদের উচিত, এ মহান উদ্দেশ্য সাধনে ওই সংগঠন ও দলকে বুদ্ধি-পরামর্শ, আর্থিক ও জণবল দিয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা, যারা ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর দীন বিজয়ের জন্য আরব ভূমিতে দখলদার ইহুদি-খ্রিষ্টান পরাশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের মতো মর্যাদাপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

ফিকহী মাসআলা হলো এই

বাদায়েউস সানায়ে : "মুশরিকদেরকে আরবভূমিতে স্থায়ী-অস্থায়ী কোনপ্রকার বসতি স্থাপন করতে দেওয়া যাবে না, যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব ভূমির মর্যাদা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে বলেছেন, দ্বৈত ধর্মবিশ্বাস আরবে থাকবে না।"[১৪০]

---

১৪০. বাদায়েউস সানায়ে ৭/১৪

ফাতহুল কাদীরে আছে : "জাজিরাতুল আরব মানে হলো লম্বালম্বিতে ইডেন (ইয়ামান) থেকে ইরাক পর্যন্ত এবং পাশাপাশিতে জিদ্দার উপকূল থেকে সিরিয়া পর্যন্ত।"[১৪১]

দুররে মুখতারে আছে : তাদেরকে মক্কা-মদীনায় বসতি স্থাপনে বারণ করা হবে। কেননা উভয়স্থল আরব স্থলভূমি। নবীজী বলেছেন, আরবে দুটি ধর্মের সহাবস্থান থাকবে না। হ্যাঁ, যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে থাকতে পারবে; তবে তা-ও দীর্ঘ সময় নয়।"

রদ্দুল মুহতারে আছে : "কেননা উভয়টি আরব ভূমির ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উভয়টিকে আরব ভূমি বলা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শুধু এতদুভয় স্থানই নয়; বরং পুরো আরব ভূমিই এর দ্বারা উদ্দেশ্য, যেমনটি ফাতহুল কাদীর ও অন্যান্য কিতাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।" এতে আরও আছে, "সেখানে সুদীর্ঘ অবস্থান না করলে অসুবিধা নেই"-এর ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, সুতরাং সেখানে তাদের দীর্ঘকাল অবস্থান নিষিদ্ধ, যদ্দরুন সেখানে তাদের বাড়িঘর করার প্রয়োজন পড়ে। কেননা তারা থাকবে আরবে কর প্রদানের মাধ্যমে, যেমন অন্যথায় থাকতে পারে করবিহীন। আর সেখানে তাদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়; বরং দীর্ঘ সময় অবস্থান নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে আরব ভূমিতেও অনুরূপ। শরহুস সিয়ারে দীর্ঘ অবস্থানের সীমা এক বৎসর নির্ধারিত করা হয়েছে।"[১৪২]

উত্তর সত্যায়ন করেছেন-
মুহাম্মাদ হাসান
উত্তর প্রদানে
মুহাম্মাদ হানিফ খালিদ
দারুল ইফতা, জামিয়া উসমানিয়া শুরকোর্ট জংগ

---

১৪১. **ফাতহুল কাদীর ৪/৩৭৯**
১৪২. **রদ্দুল মুহতার ৪/২০৮**

ফতোয়া নং ৩

ফতোয়া জামিয়া ফারুকিয়া, করাচী

উত্তর : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা অবর্ণনীয়। কুফরির অমানবিক অন্ধকার তাদেরকে ঢেকে ফেলেছে। সব ক্ষেত্রেই কুফরি শক্তি মুসলমানদের তুলনায় অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু একটি অমার্জনীয় এবং দুঃখজনক-হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা এটা, তাগুতি সৈন্যদল ইসলামের পবিত্রতম স্থানসমূহে প্রবেশ করে ফেলেছে এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনায় জোরপূর্বক নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকি তাদের অপবিত্র পদচারননা থেকে পবিত্র হারামাইন তথা মক্কা-মদীনাও সুরক্ষিত নয়। বাস্তবে তার সবচে বড় কারণ হলো, মুসলিমদের অন্তরে দুনিয়াপ্রেম সীমাহীনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তারা মৃত্যুকে ভয় পেতে শুরু করেছে। পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালাম এ কথাটি প্রথমেই পরিষ্কার করেছেন, যদি তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসো এবং মৃত্যুকে ভয় পাও, তবে কাফেররা তোমাদের ওপর এভাবে হামলা করবে, যেমনিভাবে পেটুক লোকেরা খাবার পাত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে লুটতরাজ ও ছিনতাই-রাহাজানির অব্যাহত ধারা চলছে। তাদের ইজ্জত-আব্রুকে ধূলিস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিশ্ব পালনকর্তা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কাফেরদের ওপর লাঞ্ছনার খড়গ বইয়ে দিই এবং তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কর দিতে সম্মত না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা আল্লাহ তা'আলা এবং কেয়ামত দিনের ওপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারামকৃত বস্তুকে হারাম মানে না, সত্য ধর্মের অনুসরণ করে না, (অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান ও অন্যান্য কাফেররা) তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখো ততক্ষণ, যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে লাঞ্ছনার সহিত কর আদায় করে।"[১৪৩]

এটা আল্লাহ তা'আলার কথা—যার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের হুকুম দিচ্ছেন আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) সাথে অনবরত যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে। কখনো তাদের মাথা থেকে তরবারি না সরাতে। তবে যদি তারা লাঞ্ছনা-বঞ্চনার সহিত নিজেদের রক্ষা করতে

---

১৪৩. তাওবা : ২৯

জিযিয়া বা কর আদায় করে। মুসলমানদের জন্য কোনো কাফেরকে সম্মান প্রদর্শন করা বৈধ নয়। তাদেরকে সদা লাঞ্ছনায় নিমজ্জিত রাখা জরুরি। দুররে মুখতারে আছে, "যদি কেউ তার প্রতিনিধি দ্বারা কর পাঠায় তবে যেন তা গ্রহণ না করা হয়, বরং তাকে বাধ্য করা হবে, সে যেন এসে লাইনে দাঁড়িয়ে কর আদায় করে আর গ্রহীতা (মুসলিম শাসক) তাকে চাপ দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর দুশমন, জলদি আদায় কর।"[১৪৪]

আফসোস, এখন তো আমাদের পবিত্র ফয়সালাগুলোতেই কাফেরদের বেশি সম্মানিত করা হয়েছে। এখন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতেও তাদের মোড়লগিরিতে বাধা দেবার কেউ নেই। এটা আমাদের আত্মমর্যাদার কথা আর আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের জন্য শোকবার্তা-সংবলিত শিক্ষা। আরব উপদ্বীপে ইহুদি সশস্ত্র সৈন্যদের উপস্থিতি একটি জঘণ্য নাপাক। যা পরিষ্কার করা মুসলিমদের দায়িত্ব এবং এই আবর্জনার বিতাড়ন ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।"[১৪৫]

মুসলমানদের অবস্থানস্থলে অনুপ্রবেশ, তাদের এলাকা দখল এবং তাদের জীবনাচারে অবৈধ অনুপ্রবেশ বরদাশত করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কাফেরদের মুসলমানদের ওপর কোনো স্বাধীনতা নেই।"[১৪৬]

এখানে দুটি মাসআলা রয়েছে,

১. আরব উপকূলে কাফেরদের সমাগম এবং স্থায়ী ব্যবস্থা।

২. মুসলিম বিশ্বের খনিজ সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর এলাকায় সৈন্য সমারোহ এবং নিয়ন্ত্রণের দুঃসাহস।

প্রথম মাসআলা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মৃত্যুশয্যায় বলেছেন, "জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ (ইয়ামান হতে ইরাক, জেদ্দা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত) থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।"[১৪৭]

---

১৪৪. দুররে মুখতার ৪/২০১

১৪৫. তাওবা : ২৮

১৪৬. নিসা : ১৪১

১৪৭. সহিহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৭

এমনকি তিনি আরও বলেন, "আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম থাকতে পারে না।"[১৪৮]

খলিফায়ে রাশেদ হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু এ সকল নির্দেশনা কার্যকর করতে গিয়ে বলেছেন, 'আরব উপদ্বীপে মুশরিকদের থাকার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না।'

হেদায়ার গ্রন্থকার লেখেন, 'অমুসলিমদেরকে আরবের শহর ও গ্রামাঞ্চলে আবাস গ্রহণ করতে নিষেধ করা হবে।'[১৪৯]

দুররে মুখতারের গ্রন্থকার বলেন, 'আরবের গ্রামাঞ্চলেও তাদের থাকতে নিষেধ করা হবে।'[১৫০]

যখন এসকল আরব মুশরিক—যারা কয়েক পুরুষ পূর্ব থেকে আরবে বসবাসরত—তাদের বের করে দেওয়াটাই জরুরি হয়ে দাঁড়াল তাহলে অনারব কাফেরদের জন্যে কীভাবে সম্ভব হতে পারে, তারা সেখানে বসবাস করতে আসবে? বিশেষভাবে পবিত্র হেরেমের সন্নিকটে। এসকল কাফেরের উপস্থিতি যদি হেরেমের হেফাজতের জন্য হয়ে থাকে, তবে তো এটা আরও ভয়াবহ বিপজ্জনক বিষয় হয়ে গেল। তবে কি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের ঘরের সুরক্ষা তার দুশমনেরা করত? মুসলিম বিশ্বে কি তাহলে এমন বড় কলিজার পুরুষ নেই, যারা হেরেমের হেফাজত করতে পারে? তবে কি মুসলিম মায়েরা ওই সব বাহাদুর বীর সন্তান জন্ম দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর হেফাজত করবে এবং তার পবিত্রতা রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করবে?

দ্বিতীয় মাসআলা

কাফেরদের সৈন্যঘাঁটি—এটা তো প্রকারান্তরে ইসলামি রাজ্য দখলেরই নামান্তর। মুসলিমদের জন্য আবশ্যক, যেন তারা তাদেরকে এখান থেকে বিতারণ করে। যদি তারা না সরে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ততদিন অব্যাহত রাখবে, যতদিন তারা মুসলিম বিশ্ব ছেড়ে পুরোপুরি পালিয়ে না যায়। আর আল্লাহ তা'আলার একান্ত দীন (ইসলাম) পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হয়।

---

১৪৮. মুয়াত্তা মালেক : ৬৯৮

১৪৯. ফাতহুল কাদীর : ২/৭০

১৫০. দুররে মুখতার ৭/২০২

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে : "ওইসব লোকেদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাও যেন কোনো ফিতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং দীন সামগ্রিকভাবে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য না হয়।"[১৫১]

উম্মতের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত, আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। যদি কুফুরি শক্তি কোনো মুসলিম এলাকা ঘেরাও করে আর সেখানকার অধিবাসীরা সে দখলদারিকে নিঃশেষ করতে না পারে তাহলে তাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী মুসলমানদের ওপর কিতাল ফরজ হয়ে যায়, এরপর তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর, এভাবে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের ওপর ফরজ হয়ে যায়।[১৫২]

মুসলিম সীমানায় যদি কাফেররা সৈন্য সমাবেশ করে তবে যারা সে স্থানের নিকটবর্তী, তাদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যারা তাদের থেকে সামান্য দূরে যদি তাদের প্রয়োজন না হয় তবে তাদের ওপর ফরজে কিফায়াহ। যদি তাদের শক্তির প্রয়োজন এ জন্য পড়ে যে, নিকটবর্তীরা অক্ষম হয়ে গেছে বা সক্ষম নয়; দুর্বল বা অলস হয়ে যায় এবং মোকাবিলা ছেড়ে দেয়, তাহলে তৎপার্শ্ববর্তীদের ওপর ফরজে আইন হয়ে যায়। যেমন, নামাজ রোজা ও ফরজে আইন; যা ছাড়ার কোনো অবকাশ নেই। এভাবেই পাশাপাশি ফরজ হতে থাকে। একপর্যায়ে ধীরে ধীরে পুরো মুসলিম বিশ্বের ওপর ফরজ হয়ে যায়। ইমাম নাসাফী কানযুদ্দাকায়েকে বলেন,'শত্রুর আক্রমণ উস্কানির ফলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়; এমনকি স্ত্রীদের ওপরও। তারা প্রয়োজনে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে এবং দাসদের মনিবের বিনা অনুমতিতে বের হতে হবে।' ইবনে নুজাইম বাহরুর রায়েকে লিখেন, 'যখন উদ্দেশ্য (আক্রমণ এবং শত্রুর মোকাবিলা) সমগ্র মুসলিম ছাড়া অর্জিত হয় না, তখন সকল মুসলিমের ওপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। সারকথা হলো, কুরআন-হাদিস ও উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুসলিম শাসকদের জন্য আবশ্যক, তারা যেন মুসলিম এলাকগুলো থেকে কাফেরদের তাড়িয়ে দেয়। যদি প্রশাসন এমনটি না করে, বরং অলসতা দেখায় তবে মুসলমানদের ওপর ফরজ হয়ে যে, তারা দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা। এমতাবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতে প্রত্যেক ওই

---

[১৫১]. আনফাল : ৩৯

[১৫২]. ফতোয়ায়ে শামি : ৪/৪২১

মুসলমানের জন্য জরুরি—যারা আরব উপদ্বীপে রয়েছে—তাদের জন্য জরুরি যে, সৌদি প্রশাসনের কাছে আমেরিকা ও তার মিত্র শক্তিকে ভাগিয়ে দেওয়ার দাবি জানাবে এবং এটাও যে, প্রশাসন যেন নিজের পূর্ণশক্তি প্রকাশ্যে ইহুদি সৈন্য তাড়াতে ব্যয় করে। তাদের নিকট মুসলিমদের যে সকল অধিকৃত অঞ্চল রয়েছে, তা পুনরোদ্ধারের চিন্তা করবে এবং আরব উপদ্বীপকে পরিপূর্ণভাবে এ নাপাক থেকে পবিত্র করার চেষ্টা চালাবে।

যদি প্রশাসন না করে অথবা করতে না পারে তবে আরবের বাসিন্দাদের জন্য জরুরি, তারা স্বপ্রণোদিত হয়েই এ দায়িত্ব যেন আদায় করে। তাদের অক্ষমতার দরুন তাদের পার্শ্ববর্তীদের ওপর এ গুরুদায়িত্ব বর্তাবে। এরপর তৎপার্শ্ববর্তী যারা। তারপর তৎপার্শ্ববর্তীদের ওপর। এভাবেই গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়; যাতে করে মুসলিম এলাকা এবং সেখানে বিদ্যমান খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক নেয়ামতের ওপর জবর-দখলের কুফুরি স্বপ্ন-সাধ বাস্তবায়িত না হয়। এবং মুসলমানকে রুখে নিজেদের অপবিত্র ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মুষড়ে যায়; যেন তাদের স্রোতের বিপরীতে একটি মজবুত বাঁধ তৈরি করা যায়, যাতে করে কাফেরদের মাথা অবনত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার দীন ইসলাম সমুন্নত থাকে।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে শরীয়তের এ নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পালনের তাওফিক দেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করেন।

উত্তর প্রদানে-
সাঈদ আহমদ হাসান
শিক্ষানবিশ : দারুল ইফতা
জামিয়া ফারুকিয়্যা করাচী

ফতোয়া নং ৫

দারুল উলূম করাচী

অমুসলিমদের থেকে প্রয়োজন মোতাবেক যুদ্ধকৌশল অর্জন করার শরয়ী অবকাশ রয়েছে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো, তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণে মুসলমানদের কোনো কল্যাণ নিহিত থাকতে হবে এবং তাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা মুসলমানদের অধীনেই থাকতে হবে। সাথে সাথে ওই সকল অমুসলিমদের থেকে এ আশঙ্কা না থাকতে হবে যে, তারা কোনোপ্রকার ফিতনা ছড়াবে অথবা যেকোনো পন্থায় মুসলমানদের ক্ষতি করবে। যদি অমুসলিম সৈন্যবহর মুসলিম এলাকাসমূহে এভাবে স্বতন্ত্র স্থায়ী অবস্থান করে, যার কারণে তাদের প্রভাব বিস্তারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অথবা তারা শুধুই কাফেরদের কল্যাণকামী হয় কিংবা স্বয়ং মুসলমানদের আর তাদের প্রয়োজন না পড়ে—এসকল পরিস্থিতিতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে কাফের সেনাদলকে অবস্থান করতে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। এমতাবস্থায় মুসলমান শাসকদের জন্য জরুরি, তারা সেই কাফের সেনাবহরকে মুসলিম এলাকা থেকে বিতারিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদাররা, তোমরা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, যারা নিজেদের ধর্ম-কর্মকে খেল-তামাশা মনে করে।" ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'মুসলমানদের জন্য অন্য মুশরিকদের সাথে সংঘটিত লড়াইয়ে অমুসলিম সৈন্যদের থেকে সাহায্য নেওয়া দোষের কিছু নয়; যখন তারা বুঝতে পারবে যে, ইসলাম বিজয়ী হবে। আর যখন দেখবে মুশরিকরা বিজয়ী হবে তখন মুসলমানদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।[১৫৩]

সব রেওয়ায়াতের সারাংশ—অমুসলিমদের থেকে সাহায্য গ্রহণ এটি ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যদি তাদের 'ত্রাস' থেকে নিরাপদ এবং তাদের সহযোগিতায় কল্যাণ থাকে তবে কোন অসুবিধা নেই। ইন শা'আল্লাহ এমন একদিন আসবে যখন মুসলিমরা হবেন পরিচালক আর কাফেররা হবে তাদের আওতাধীন। আর যদি মুসলিমগণের তাদের প্রয়োজন না হয়। অথবা নেতৃত্বে কাফেররা হয় আর মুসলিমরা

---

১৫৩. আহকামুল কুরআন, ২/৪৪৭

তাদের অধীনস্থ হয় অথবা তাদের 'ত্রাস' থেকে মুক্ত না হয়; তবে কুফুরি শক্তির সাহায্য গ্রহণ জায়েজ নেই।[১৫৪]

উত্তর সত্যায়ন করেছেন
আসগর আলী রাব্বানী
দারল ইফতা দারুল উলূম করাচী
১৫ জুমাদাল উখরা ১৪১৭ হিজরি
এবং
মাহমুদ আশরাফ উসমানী
২০ জুমাদাল উখরা ১৪১৭ হিজরি
উত্তর প্রদানে
বান্দা লোকমান হাকিম
দারুল ইফতা, দারুল উলূমকরাচী
১৫ জুমাদাল উখরা ১৪১৭ হিজরি
ফতোয়া রেজিস্টার নং-৩১/২৪৬

১৫৪. তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম,৩/৭৭৯

ফতোয়া নং ৬

জামিআ কাসেমূল উলূম মুলতান

কুরআনুল কারীমে রয়েছে "তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ধর্মানুরাগী না হবে, তারা কখনোই তোমার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না। আপনি বলে দিন, যে পথ আল্লাহ দেখান, সেটাই সত্য পথ। আর যদি আপনি আপনার নিকট আকাট্য ইলম (ওহি) আসার পর তাদের অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী নেই।"[১৫৫]

এ অকাট্য দলিল ছাড়াও ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলমানদের শত্রু হওয়াটা সুস্পষ্ট। অন্য আয়াতে ইসলামের শত্রু শক্তিকে ফেতনা আখ্যায়িত করে তা ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "ততক্ষণ জিহাদ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না ফেতনা নির্মূল হয় এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহ তা'আলার হয়। (অর্থাৎ কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অবশিষ্ট না থাকে)।"[১৫৬]

সুতরাং জিহাদের একটি উদ্দেশ্য এটাও যে, কুফরি শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি যেন চুর্ণ হয়ে যায়, রাজত্ব শুধু আল্লাহরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্য দীন অন্য সব দীনের ওপর বিজয়ী হয়। সুতরাং বৃহত্তর ইসরাইলের নকশা অনুযায়ী মক্কা-মদীনার পবিত্র হেরেমের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের সংকল্পকারী ইসরাইলের মদদপুষ্ট ও সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরজ। আর জিহাদবিহীন অন্য কোনো অস্ত্রও এ ক্ষেত্রে সফল হতে পারে না। অতএব, মার্কিন সৈন্যবহরকে আরব উপদ্বীপ থেকে তাড়ানো অত্যাবশ্যকীয়।

উত্তর প্রদানে
মঞ্জুর আহমদ
খাদেম, দারুল ইফতা
জামিয়া কাসেমুল উলূম মুলতান।

সমাপ্ত

১৫৫. তাওবা : ১২০
১৫৬. সূরা আনফাল : ৩৯

হযরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: "অচিরেই তোমাদের ওপর এমন একটা সময় আসবে, যখন বিশ্ব কুফরি শক্তিগুলো একে অপরকে আহ্বান করে তোমাদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমনটা খাবারের পাত্রে একে অপরকে আহ্বান করে করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তখন কি আমাদের সংখ্যা খুব কম হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। বরং তোমাদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি হবে। তবে তোমরা হবে সাগরের ফেনার মতো। তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' ঢেলে দেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াহান কী? নবীজী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুর ব্যাপারে অনিহা। অপর এক বর্ণনায় আছে, দুনিয়ার ভালোবাসা ও কিতালের ব্যাপারে অনিহা।

[মুসনাদে আহমাদঃ হাদীস নং ২২৩৯৭]

এই চিত্রটির দ্বারা মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহ, প্রাকৃতিক ও খনিজসম্পদের ভান্ডারসমূহ এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রসমূহের উপর ইহুদি-খ্রিস্টানদের জোড়পূর্বক দখলদারিত্বকে বুঝানো হয়েছে। এই চিত্রটিতে সামুদ্রিক ঘাঁটিগুলোতে তাদের সামুদ্রিক নৌ-যানগুলোর টহল। বিমান ঘাঁটিগুলোতে বিমান এবং গোলাকার কালো বৃত্তসমূহ দিয়ে তাদের স্থলঘাঁটিসমূহ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘাঁটির সাথে সেই কাফির দেশটির পতাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে দেশটি এই জোড়পূর্বক দখলদারিত্বে অংশ নিয়েছে। চিত্রটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখুন, যার মাঝখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী ও দৃঢ়সংকল্প উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর সেসকল চিহ্নগুলোও দেখুন, যা এই বরকতময় বাণী ও দৃঢ়সংকল্পের সুস্পষ্ট বিরুধীতাকে প্রকাশ করছে এবং নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন যে, জিহাদ এখনও ফরজ হয়েছে কিনা? উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে জিহাদ ও মুজাহিদদের সঙ্গী হয়ে স্বীয় ফরজ আদায়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। তা না হলে কিয়ামতের দিন কোন উজরই গ্রহণযোগ্য হবে না।

সারা বিশ্বের ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন

ফিলিস্তিনের দিকে ইহুদিদের স্থানান্তর
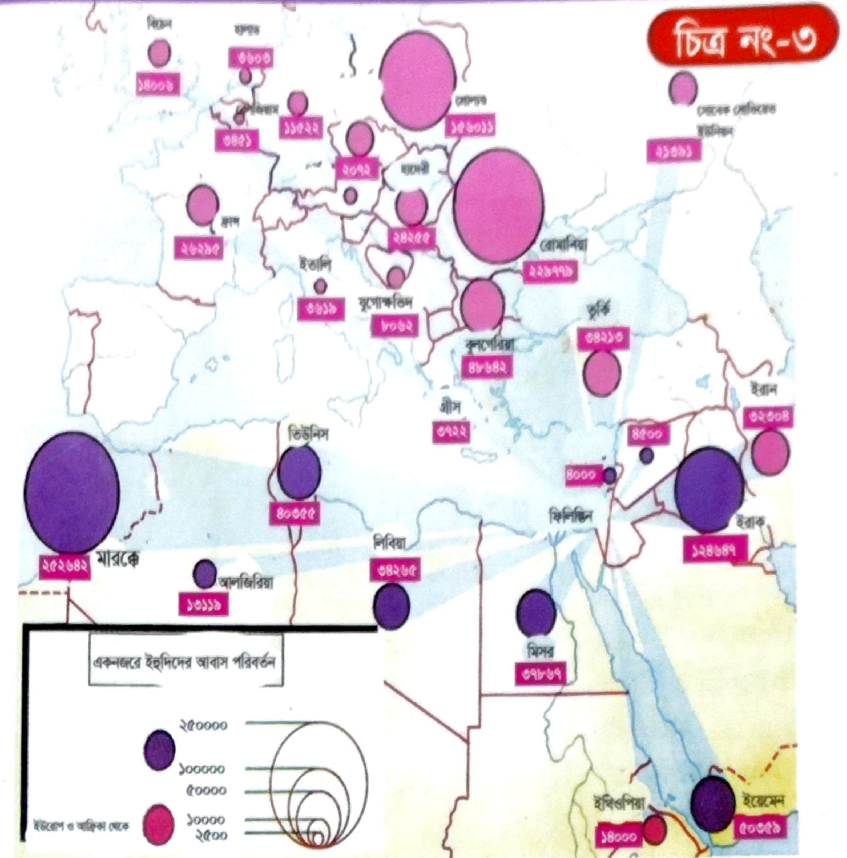
পশ্চিমা দেশসমূহের যৌথ পরিকল্পনা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে যখন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলো তখন সারা পৃথিবীর দূর-দূরান্তের দেশসমূহ থেকে ইহুদিদেরকে এনে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করানো হলো। এই ধারা আজও চলমান। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন ইহুদি বসতি স্থাপনের সংবাদ প্রচার হচ্ছে। এই চিত্রটিতে বিশ্বেরে বিভিন্ন দেশ আগত ইহুদিদের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু ইহুদিদের আঘমণের ধারা সর্বদাই অব্যাহত, তাই উপরোক্ত গণনা এবং সংখ্যাও চূড়ান্ত নয়।
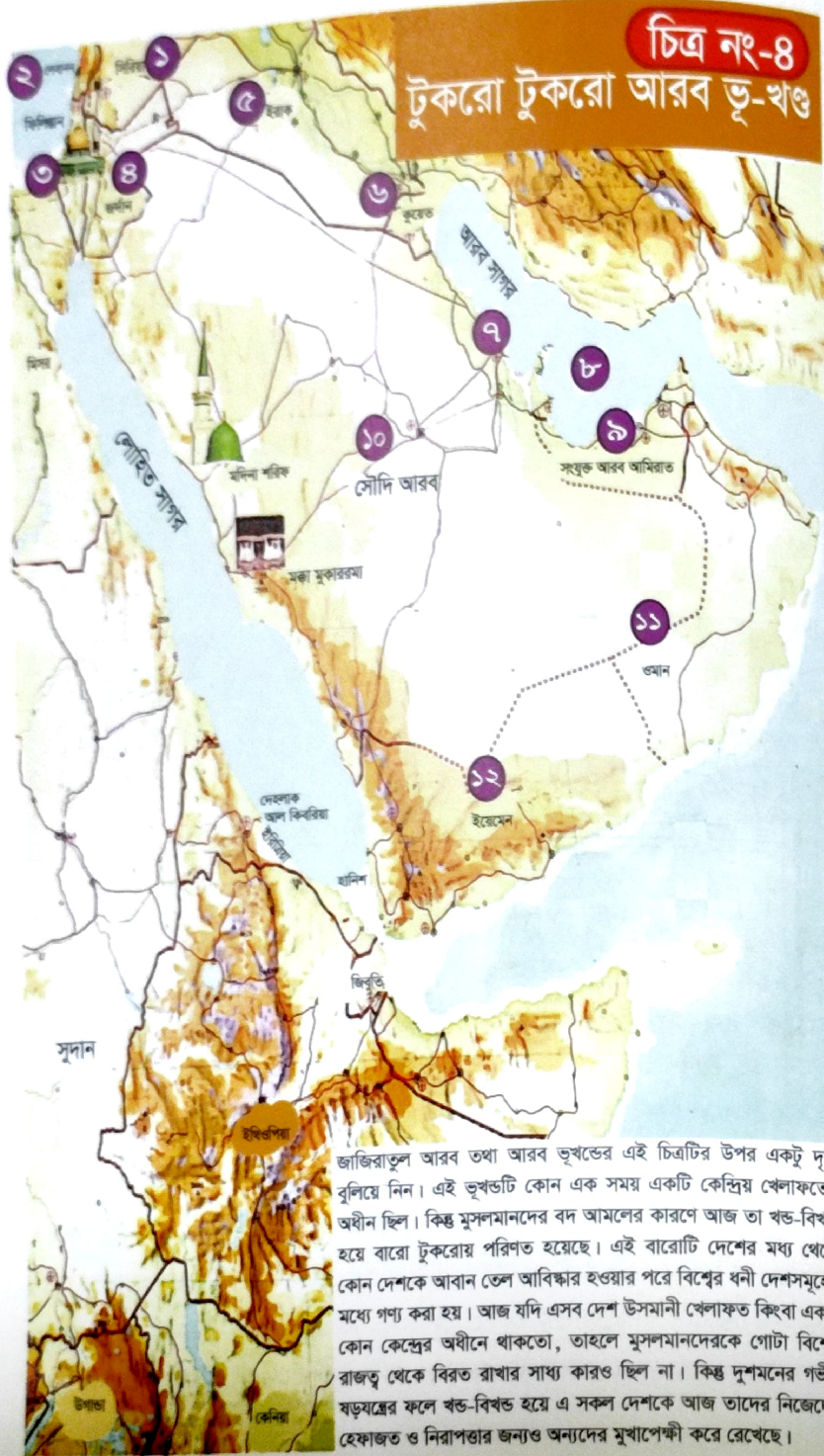
জাজিরাতুল আরব তথা আরব ভূখন্ডের এই চিত্রটির উপর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নিন। এই ভূখন্ডটি কোন এক সময় একটি কেন্দ্রিয় খেলাফতের অধীন ছিল। কিন্তু মুসলমানদের বদ আমলের কারণে আজ তা খন্ড-বিখন্ড হয়ে বারো টুকরোয় পরিণত হয়েছে। এই বারোটি দেশের মধ্য থেকে কোন দেশকে আবান তেল আবিস্কার হওয়ার পরে বিশ্বের ধনী দেশসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়। আজ যদি এসব দেশ উসমানী খেলাফত কিংবা একক কোন কেন্দ্রের অধীনে থাকতো, তাহলে মুসলমানদেরকে গোটা বিশ্বের রাজত্ব থেকে বিরত রাখার সাধ্য কারও ছিল না। কিন্তু দুশমনের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে খন্ড-বিখন্ড হয়ে এ সকল দেশকে আজ তাদের নিজেদের হেফাজত ও নিরাপত্তার জন্যও অন্যদের মুখাপেক্ষী করে রেখেছে।

চিত্র নং-৫

ইসরাইলের মোকাবিলায় হারামাইন শরীফাইনের রক্ষকদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলো.	জনসংখ্যা	বার্ষিক আয় (বিলিয়ন ডলার)	সশস্ত্র সৈন্য	ট্যাঙ্ক	সৈন্যদের গাড়ি	রকেট লাঞ্চার	যুদ্ধ বিমান	যুদ্ধ হেলিকপ্টার	সাবমেরিন	ডেস্ট্রয়ার	সৈন্যদের জন্য বাজেট
সৌদি আরব	২২৪০০০০	১৮৬১৩০০০	১২৮	১০৫৫০০	১০৫৫	৩৮৭৫	৪৯৮	২৩৪	১৩৭	০	৩৭	১৩.২
কুয়েত	১৭৮১৮	১৫০৫০০	২৩.৫	১৬৬০০	২২০	৩২৯	৫৬	৭৬	১৬	০	২	২.৯
বাহরাইন	৬৯৫	৫৭২০০০	৪.৬	১০৭০০	১০৫	২৩৫	৫৮	২৪	১০	০	১১	০.২৫৩
কাতার	১১৪৩৭	৫৪৪০০০	৭.৮৫	১১১০০	২৪	২১২	৪৪	১২	২০	০	৯	০.৩২৫
আমিরাত	৭৭৭০০	১৮৩০০০০	৩৬.৭২	৭০০০০	১৩৩	৭২৮	২২০	৯৭	৪২	০	২০	১.৮৮
ওমান	২১২৪৫৭	১৮৮১০০	১১.৯৬	৪৩৫০০	৯১	৩৯	১০২	৪৬	০		১২	১.৫৯
সর্বমোট	২৫৬০১০৭	১২৯৪৫০০	২১২.৬৩	২৫৭৪০০	১৩২৯	৫৪১৮	৯৭৮	৪৮৯	২২৫	০০০০০	৯১	২০.১৯
ইসরাইল	২১৯৪৬	৪৮০০০০০	৭১	৬০২০০০	৪০৯৫	৮৪৮০	১৭৮৪	৯৬৬	১১৬	৩	১৩টি	১০

এই তালিকায় ইসরাইলের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের মোকাবেলায় পবিত্র হারামাই শরিফাইনের রক্ষকদের সামরিক প্রস্তুতির তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এটি দেখার পর কোন মুসলমান কি তাদের পুণ্যভূমিসমূহের সংরক্ষণের ব্যাপারে নিজ ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে? বিশেষ করে যখন "গ্রান্ড ইসরাইল তথা বৃহত্তর ইসরাইল" প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছে। আর আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং জাতিসংঘ ধীরে-ধীরে ইসরাইলের সকল আশা-আকাংঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনাসমূহকে বাস্তবায়ন করে চলেছে। মুসলিম উম্মাহ আরব বিশ্বের নিকট এটা জিজ্ঞেস করার অধিকার রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা কি সর্বপ্রকারের অধিক থেকে অধিক যুদ্ধপ্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করেননি? আরব দেশসমূহ এবং মুসলিম উম্মাহর নিকট কি ধন-সম্পদের অভাব রয়েছে? যাকে সৈন্য স্বল্পতা ও সামরিক সরঞ্জাম স্বল্পতার অজুহাত হতে পারে?

এখানে অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ছয়টি দেশের সামরিক বাজেট ইসরাইলের দ্বিগুণ তাদের অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ইসরাইলের সরঞ্জমের তুলনায় একেবারেই স্বল্প, বরং একদমই না থাকার মতো। আরব শাসকগণ কি এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মুসলিম উম্মাহকে আশ্বস্ত করতে পারবেন?
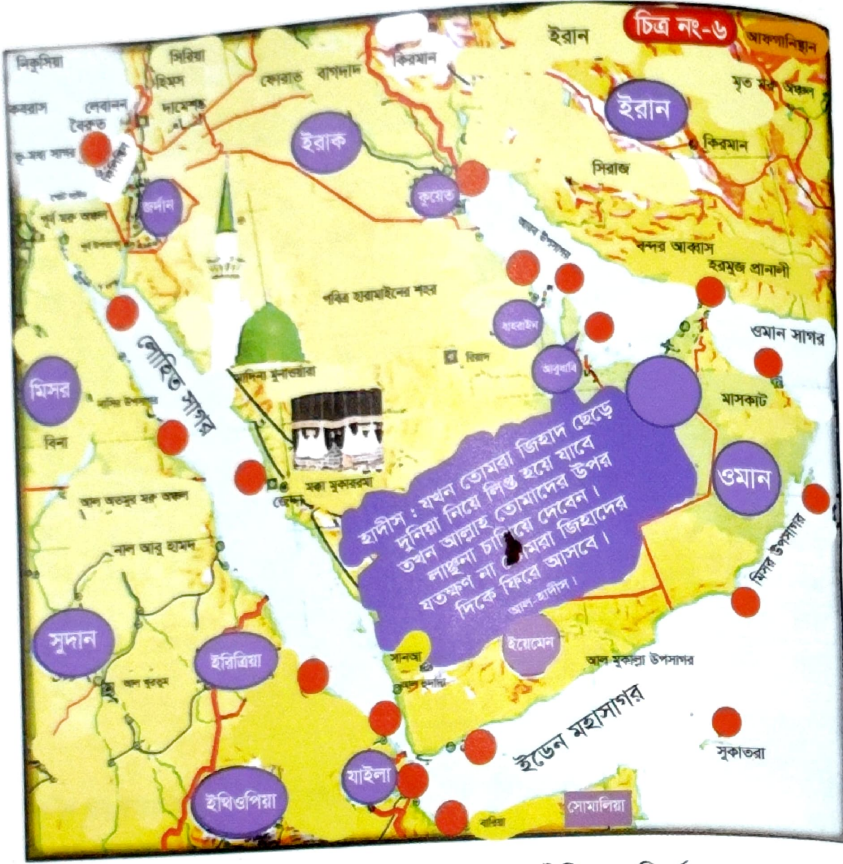
এই চিত্রের লাল চিহ্নগুলো ইহুদি-খ্রিস্টানদের সেসকল ঘাঁটিসমূহ নির্দেশ করছে যেগুলো "গ্রান্ড ইসরাইল তথা বৃহত্তর ইসরাইল"- এর পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপকে অবরুদ্ধ করার লক্ষ্যে স্থাপন করে রেখেছে। ১৮৯৮ সালে সুইজারল্যান্ডের শহর "বাসেলে" ইহুদিদের একটি সম্মেলন হয়েছিল।উক্ত সম্মেলনে ইহুদিদের এক নেতা দাবি করেছিল যে, আমি যদি আজকের এই সম্মেলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে এক কথায় সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই, তাহলে আমি বলবো: বিশ্ব আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর পৃথিবীর মানচিত্রে একটি ইহুদি রাষ্ট্র দেখতে পাবে।

[মুযাক্কিরাতে হারতাজাল: খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৫৮১]

অতঃপর ঠিক পঞ্চাশ বছর পর ১৯৪৮সালে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। তবে কি মুসলমান পূর্বের ন্যায় এখনো উদাসীনতার শিকারই থেকে যাবে? এ কথা চিন্তা করলে কলিজা মুখে চলে আসে এবং বিবেক লোপ পেয়ে যায়।

চিত্র নং-৭

উপসাগরে আমেরিকার দু'টি বিমানবাহী সমুদ্রতরী "ইন্ডিপেন্ডেন্ট ও জন সি এজেন্সি?

বিমানবাহী সমুদ্রতরীর উপর যুদ্ধ বিমানের দীর্ঘ রানওয়ে।

মার্কিন রনতরী থেকে উড্ডয়নরত গোয়েন্দা বিমান

ইসলামী সমুদ্রের উপর উড়ন্ত মার্কিন জঙ্গিবিমান।
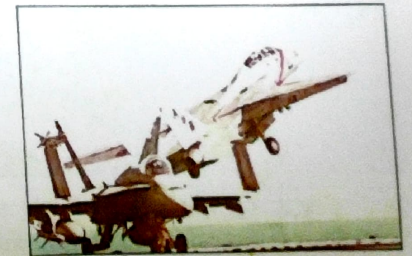
জর্জওয়াশিংটন থেকে উড্ডয়নরত জঙ্গিবিমান
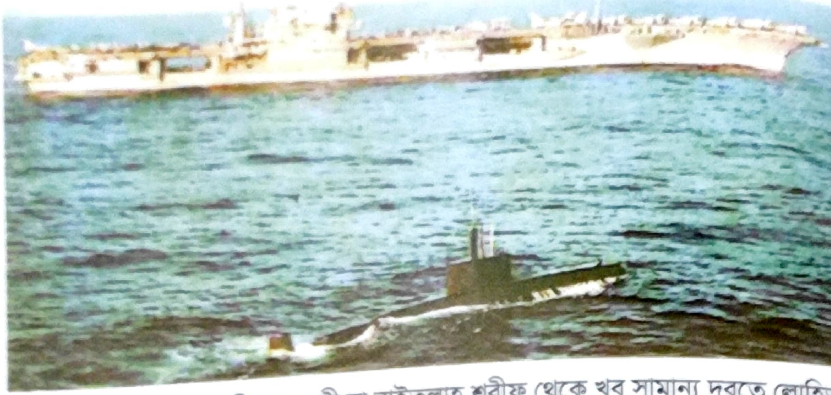
দুনিয়ার সর্ববৃহৎ বিমানবাহী সমুদ্রতরী যা বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে খুব সামান্য দূরত্বে লোহিত সাগর এবং (আরবীয়) উপসাগরের বুক চিড়ে স্বাধীন ও সগৌরবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা এটির মাধ্যমেই সুদান, আফগানিস্তান এবং ইরাকের উপর হামলা চালিয়েছিল।

এই বিমানবাহী জাহাজটিতে যুদ্ধ সরঞ্জামের প্রায় নব্বইটি যুদ্ধ জাহাজ এবং পাঁচ হাজারের অধিক কর্মচারী কর্মরত। অর্ধ ডজনের চেয়ে বেশি এমন বিমানবাহী সমুদ্রতরী আরব ভূ-খণ্ডের চারপাশে ইসলামী সমুদ্রসীমাগুলোর মধ্যে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বৃহত্তর ইসরাইলের ইহুদি প্লানকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ভয়ঙ্কর ভিত্তিস্থাপন করে রেখেছে। এখন মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয হলো নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মুছে ফেলে ঐক্যবদ্ধভাবে কুফরের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হওয়া। জাহাজটির অদূরেই সমুদ্র হতে ভেসে উঠা একটি সাবমেরিণও দেখা যাচ্ছে।

আধুনিক অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত একটি রণতরী আরব সাগরে টহল দিচ্ছে। ইসলামী দেশগুলোর নিয়ন্ত্রনাধীন সমুদ্রে কুফরশক্তির রণতরীগুলোর অবাধ বিচরণ ও টহল আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য খুবই ভাবনার বিষয়।

মার্কিন নেভির প্রতীক উপরে বাঁদিকে আরব ভূ-খণ্ডকে দেখানো হয়েছে। মুসলমানদের ভাবার বিষয় যে, তাদের প্রবিত্রতম স্থানগুলোর আশপাশে ইহুদিদের বিশ্ব বিজয়ের সচেষ্ট এই নিশানাবাহী সামুদ্রিক শক্তি ব্যাপক আকারে উপস্থিত। আর মুসলমানরা ওদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে বুঝা এবং তার তদারকি করার চেষ্টায়ও নেই। আর যারা চেষ্টায়ও থাকবে না আল্লাহ তাদের সাহায্য কিভাবে করবেন?

মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর সঙ্গে আরব ভূ-খণ্ডকে অবরোধে অংশীদার ব্রিটিশ বিমানবাহী রণতরী।
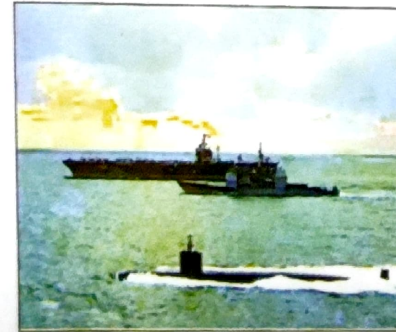
১. আরব সাগরে মার্কিনবিমানবাহী সমুদ্রতরীর সঙ্গে মার্কিন সাবমেরিন এবং একটি সমুদ্র যুদ্ধজাহাজ।

২. আরব সাগরে হেলিকপ্টারবাহী একটি মার্কিন সমুদ্রজাহাজ।

চিত্র নং-১০

ইসরাইলি নৌ বন্দরে নোঙ্গর করতে যাওয়া মার্কিন বিমানবাহী "এন্টারপ্রাইজ' নামের বিশাল রণতরী যাতে একই সময়ে ৯০টি যুদ্ধ বিমান এবং সাড়ে পাঁচ হাজারের অধিক আমলা ও কর্মচারী থাকে যার দৈর্ঘ্য- ১১০২ ফুট, প্রস্থ-২৫২ফুট এবং গভীরতা ১৩৩ ফুট।

জাপানের নৌবন্দর "ইয়োকাসোকা' তে নোঙ্গর করা মার্কিন বিমানবাহী রণতরী "ইন্ডিপেন্ডেন্ট" যার হেলিপেডে মার্কিন হেলিকপ্টর অবতরণ করছে। হেলিকপ্টারে মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব ইউলিয়াম রণতরীকে (এডেন) সাগর অভিমূকে রওনা করার নির্দেশ দিতে আসছে। (ছবি : ২১ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং)
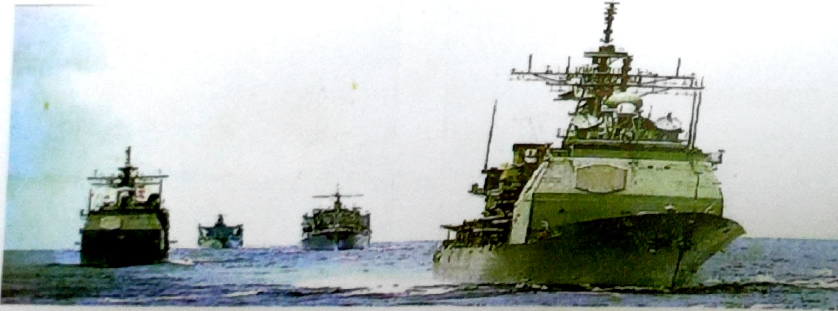
মার্কিন রণতরী যা আজকাল আরব ভূ-খণ্ডের চারপাশে ইসলামী সমুদ্রগুলোতে নিয়মিত টহল দিতে থাকে।

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা

চিত্র নং-১১
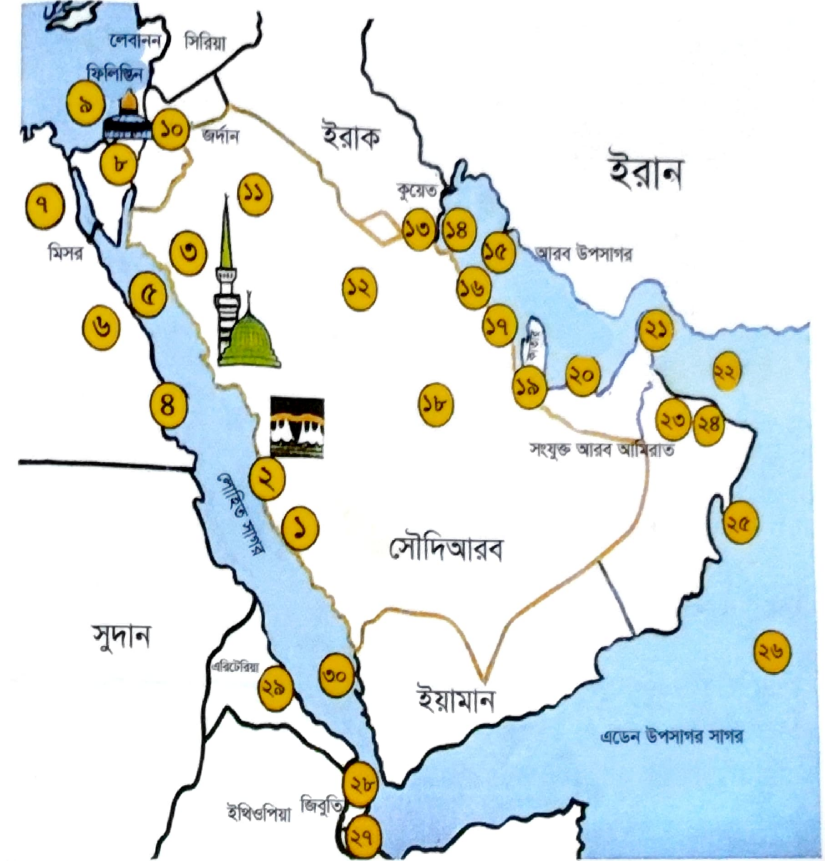
পবিত্র হারামাইন শরিফাইন সংরক্ষণের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদের প্রেরণা জাগ্রত করার লক্ষ্যে জামিয়াতুল ইলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউনের শাইখুল হাদিস হযরতে আকদাস মুফতি নিযামুদ্দীন শামযায়ী সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত "ইসলামী সাহায্য সংস্থা" কর্তৃক বিন্যস্ত চিত্র। এই চিত্রে প্রদত্ত নাম্বারসমুহ দ্বারা সে সকল স্থানসমূহকে নির্দেশ করা হয়েছে যেগুলোতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

ইসলামি বিশ্বে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রবাহের প্রনালীগুলো কাফেরদের নিয়ন্ত্রনে
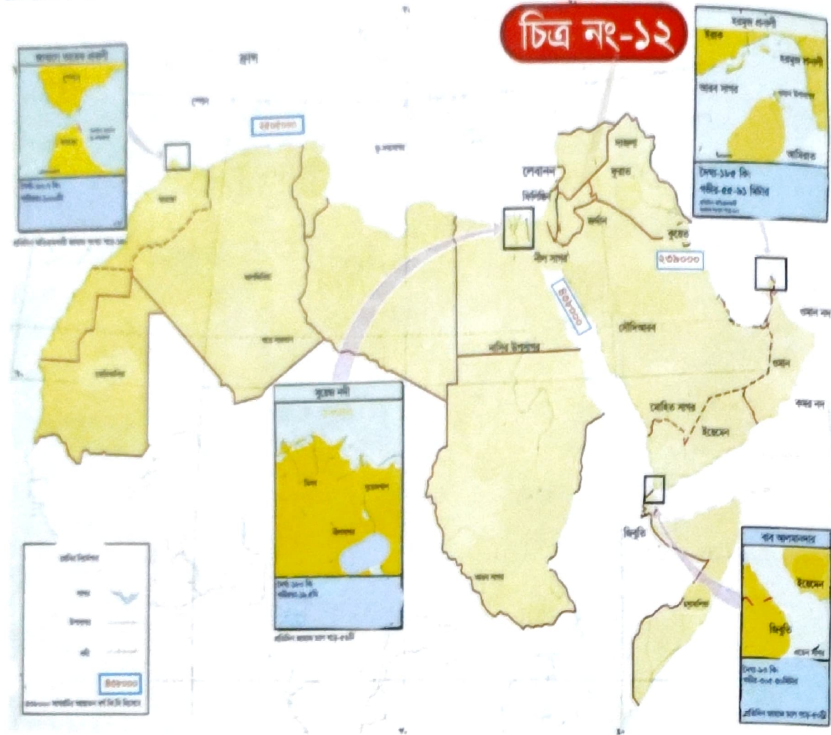
পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটি সমুদ্রপথ রয়েছে। যেগুলোকে ভূ-পৃষ্ঠের সকল জলপথসমূহের শাহরগ বা কণ্ঠনালি বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে এই চারওটি সমুদ্রপথই মুসলিম বিশ্বের সীমান্তে অবস্থিত। কিন্তু এটা মুসলমানদের চরম অযোগ্যতা যে, বর্তমানে এগুলো আমেরিকা, বৃটেন বা ফ্রান্স, মুসলমানদের এই তিন শত্রুর কারও না কারও নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। অথচ এই চারটি সমুদ্রপথই এতোটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোর যেকোন একটির উপর যদি কারও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়, তাহলে সে সীমাহীন অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে সক্ষম। কিন্তু নির্মম পরিহাস দেখুন, যদিও এগুলো মুসলিম দেশসমূহের জলসীমায়ই অবস্থিত তবে এ সবগুলোর উপর নিয়ন্ত্রন চলে পরিপূর্ণভাবে এমন সব কাফের দেশসমূহের যারা এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের চক্রান্তমূলক রানৈতিক বুলি আওড়িয়ে এখানে ঘাঁপটি মেরে বসে ঘাঁটি স্থাপন করে নিচ্ছে। আর এই চিত্রটি চিৎকার করে বলছে, কেও কি আছে যে, শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে?

সুইজখাল: পৃথিবীর একমাত্র জলপথের চারিদিকে কাফিরদের সামরিক ঘাঁটি।
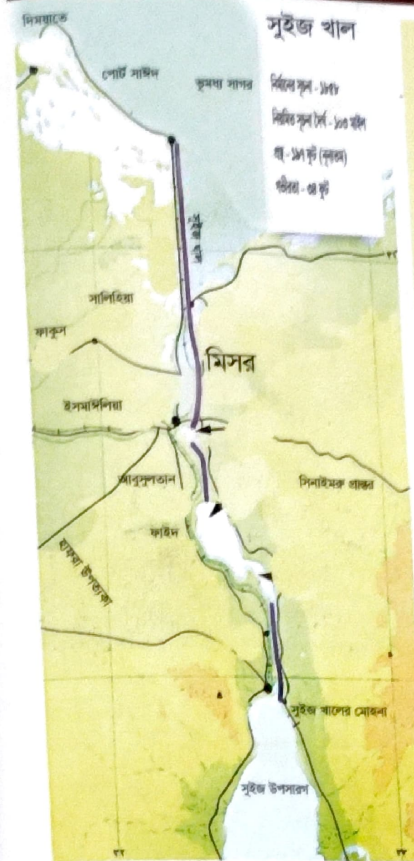
আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং পৃথিবীর একমাত্র জলপথ হলো সুইজখাল যা লোহিত সাগরকে ভূমধ্য সাগরের সাথে সংযুক্তকরণের একমাত্র পথ। বিশ্বের অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব এভাবে অনুমান করা যায় যে, ১৯৭৩ সালে মিশর এবং ইসরাইলের মধ্যে তার উপর দখলদারিত্বের জন্য নিয়মিত যুদ্ধ হয়েছে। যাকে ইসলাম এবং ইহুদিবাদের যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্স সকলে মিলে এখানে নিজেদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে রেখেছে এবং একটি মুসলিম দেশে অবস্থিত এই জলপথটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। সুপ্রিয় পাঠক! চিত্রটিতে একটি বিমানবাহী জাহাজকে সুইজখাল দিয়ে অতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে।

হেরা থেকে স্বজাতির কাছে এলেন,
একখানি দর্শনভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে এলেন।

আল্লাহ তা'আলার শেষনবী মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ পৃথিবী থেকে ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর ঘরে না কোন দিনার ছিল না দিরহাম। না অন্য কোন ধন-সম্পদ। তবে তাঁর পবিত্র হুজরায় তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র বিদ্যমান ছিল। যা উম্মাহকে তাদের উত্থান-পতনের রহস্য শিক্ষা দিচ্ছিল।

উপরে মসজিদে আকসার ছবি এবং নিচে ইহুদিদের সেই কাল্পনিক সুলাইমানি সিংহাসনের ছবি যা তারা এই স্থানে নির্মাণ করতে চায়। বর্তমান ইহুদি-খ্রিস্টান ও মুসলমানদের যেসকল ধর্মীয় গ্রন্থ কিংবা ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে গুলোর আলোকে এটা অকাট্য বাস্তব যে সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকেই এ স্থানটিতে উপসনালয় নির্মিত হয়ে আসছে। সুতরাং এটাই প্রমাণিত সত্য যে ইহুদিদের জন্মেরও হাজার বছর পূর্ব থেকেই এ স্থানটি ধর্মীয় পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ ছিল এবং আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালা-মের যুগেরও পূর্বে এখানে ধর্মীয় প্রসাদ নির্মিত হয়ে আসছে। তাহলে ইহুদিরা কীভাবে এ স্থানটি তাদের দাবি করতে পারে? তবে কি তারা বিশ্ব মানবেতিহাসের সবচেয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক অধ্যায়ের আস্তাকুঁড়ে পুনরায় নিক্ষেপ হতে চায়? নবীগণের জীবনে তো তারা শুধু নবীদেরকে কষ্টই দিতো। যার শাস্তিও তারা হাজার হাজার বছর যাবত ভোগ করছে। এখন আবার সেই নবীদের উত্তরাধিকার হওয়ার ইচ্ছে তাদের কিভাবে জাগ্রত হয়? তাদের নির্মিত কাল্পনিক প্রসাদের বাম পাশের কিবলার প্রাচির সংযুক্ত মসজিদের প্রাচির সরিয়ে ফেলেছে। ডান পাশে চাটানের উপর স্থাপিত কুব্বাতুস সাখরা নামক গম্বুজটিও নেই। কেননা এটা মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম একটি নিদর্শন। তবে তার নিচের সমতল ভূমি যেহেতু ইহুদিদের নিকট পবিত্র তাই সেখানে নব নির্মিত ভবন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তৃতীয় বৃত্তের মাঝে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচিরের ঐ অংশ দেখানো হয়েছে, যার বহিরাংশে একত্রিত হয়ে ইহুদিরা নিজেদের ঐতিহাসিক লাঞ্ছনাকর অপরাধের জন্য কাঁদতো এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো। হে মুসলিম উম্মাহ! তোমরা বেঁচে থাকতে মানবেতিহাসের সবচেয়ে ভীরু-কাপুরুষ ও দুঃশ্চরিত্র ইহুদিরা কাল্পনিক প্রাচির নির্মানের অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ফেলবে?

প্রকাশনা সংখ্যা-৩১

খায়বার বিজেতা জীবনোৎসর্গকারী মুসলমানরা, তোমাদের আত্মমর্যাদা আজ কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে? খায়বারের দুর্গকে পায়ের নিচে পদদলনকারী সাহাবায়ে কেরামের আত্মার ওপর এমন সময় কেন অতিবাহিত হবে, যখন সারা দুনিয়ার ইহুদিরা আনন্দ-উৎসব করে ঘোষণা দেবে—'আমরা আমাদের হাজার বছরের পুরোনো অপমানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম'? তোমাদের ঘুণেধরা অন্তরে কি এর কোনো অনুভূতি আছে? তোমরা কি সেদিনের জন্য নামাজ পড়ো এবং রোজা রাখো, যেদিন যে সকল অঞ্চল তোমাদের পূর্বসূরিরা তাদের পবিত্র জীবন উৎসর্গ করে বিজয় করে রেখেছে, সেখানে নোংরা ইহুদিদের কদম পৌঁছে যাবে আর তোমরা ঘরে বসে তামাশা দেখবে? ওঠো এবং গ্লোবাল জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করে কুফরের মোকাবিলায় প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্যথায় এই নামাজ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। এই ইবাদত উল্টো তোমাদের চেহারায় নিক্ষেপ করা হবে। যেই কা'বার দিকে ফিরে নামাজ পড়ছ, সেই কা'বাই যদি বিপদে আক্রান্ত থাকে তাহলে তোমাদের সেজদার আল্লাহর নিকট কী মূল্য থাকে? যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দুরুদ পাঠাও, কাফেররা সেই নবীর পবিত্র রওজা থেকে মাত্র কয়েক মাইলের দূরত্বে পৌঁছে গেছে; অথচ তোমরা নিজেদের বানানো সালাত ও সালামে ব্যস্ত রয়েছ! এটা কি ভালোবাসা ও আনুগত্য নাকি বোকামি ও কাপুরুষতা?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ ওসিয়ত ছিল—'তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।'

উপসাগরে অমুসলিম সৈন্যদের উপস্থিতির যে বিপদগুলো পবিত্র হারামাইনের ওপর ঘোরাফেরা করছে, তার কিছু উপলব্ধি মুসলমানদের হওয়া উচিত। এখন তাদের অলসতার চাদর ছুঁড়ে ফেলার এবং আত্মমর্যাদা ও বীরত্বে অন্তর জাগ্রত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এখন শুধুমাত্র দুআর দ্বারা কিছু হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের মতো অলস ও অকর্মণ্য লোকদের জন্য তাঁর নিয়ম পরিবর্তন করবেন না। তাঁর নিয়ম হলো, তিনি তাদেরকেই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করার এবং নিজেদের দুর্বলতাগুলো দূর করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। আর যারা ভীরুতা, দুর্বলতা ও অলসতা ত্যাগ না করে, তাদের জন্য তাঁর কাছে শুধু অভিশাপ ও শাস্তি; রহমত ও পুরস্কার নয়।